নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী'র শিক্ষা ও সমাজসেবা: বিশেষতঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় তাঁর অবদান প্রসঙ্গ

মোঃ সোহেল আল বেরুনী
এম. ফিল গবেষক
ফার্সী ও উর্দু বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

RB
370.92
ALN
M.P.L

তত্ত্বাবধায়ক
ড. জাফর আহমদ ভূঁইয়া
সাবেক চেয়ারম্যান
ও সহযোগী অধ্যাপক
ফার্সী ও উর্দু বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

402457

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী

Dhaka University Institutional Repository

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম

শিরোনাম

নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী'র শিক্ষা ও সমাজসেবা: বিশেষতঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় তাঁর অবদান প্রসঙ্গ

GIFT

মোঃ সোহেল আল বেরুনী
এম. ফিল গবেষক
ফার্সী ও উর্দু বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

402457
Dhaka University Library
402457

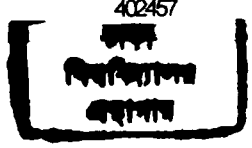

তত্ত্বাবধায়ক
ড. জাফর আহমদ ভূঁইয়া
সাবেক চেয়ারম্যান
ও সহযোগী অধ্যাপক
ফার্সী ও উর্দু বিভাগ

Dhaka University Institutional Repository

Bismillahir Rahmanir Rahim

CONTRIBUTION OF NABAB SYED NOWAB ALI CHOWDHURY IN THE FIELDS OF EDUCATION AND SOCIAL WELFARE: SPECIALLY FOCUSING ON HIS ROLE IN THE ESTABLISHMENT OF THE DHAKA UNIVERSITY

402457

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

MD. SOHEL AL BERUNI

Dhaka University Institutional Repository

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম

নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী'র শিক্ষা ও সমাজসেবা: বিশেষতঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় তাঁর অবদান প্রসঙ্গ ১৮৬৩-১৯২৯

402457

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

মোঃ সোহেল আল বেরুনী

Dhaka University Institutional Repository

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্সী ও উর্দু বিভাগের অধিনে এম.ফিল গবেষণার থিসিস

নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী'র শিক্ষা ও সমাজসেবা: বিশেষতঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় তাঁর অবদান প্রসঙ্গ ১৮৬৩-১৯২৯

মোঃ সোহেল আল বেরুনী
এম. ফিল গবেষক
ফার্সী ও উর্দু বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

তত্ত্বাবধায়ক

ড. জাফর আহমদ ভূঁইয়া
সাবেক চেয়ারম্যান
ও সহযোগী অধ্যাপক
ফার্সী ও উর্দু বিভাগ
ফার্সী ও উর্দু বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

তারিখঃ ২৫/১২/২০০৫

Dhaka University Institutional Repository

উৎসর্গ

পরম শ্রদ্ধেয় আব্বা

ও

আম্মাকে

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
১.	প্রত্যয়নপত্র ঃ	৭
২.	ঘোষণাপত্র ঃ	৮
৩.	কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ	৯
৪.	অবতরণিকা ঃ	১১
৫.	প্রথম অধ্যায় ঃ নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী'র সমকালীন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক-সাংস্কৃতিক অবস্থা।	১৪
৬.	দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী'র জীবন কথা।	২৫
৭.	তৃতীয় অধ্যায় ঃ নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী'র শিক্ষাসেবা এবং সমাজ সংস্কার।	৬৭
৮.	চতুর্থ অধ্যায় ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী'র ভূমিকা।	১১২
৯.	উপসংহার ঃ	১৬১
১০.	গ্রন্থপঞ্জি ঃ	১৬৪
১১.	এলবাম ঃ নবাবের স্মৃতি বিজড়িত কিছু ছবি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু ছবি এবং ঢাকার কিছু স্থাপত্য শৈলী	১১২

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়নপত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, ফার্সী ও উর্দু বিভাগের এম. ফিল গবেষক জনাব মোঃ সোহেল আল বেরুনী কর্তৃক এম. ফিল ডিগ্রীর জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দাখিলকৃত নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী'র শিক্ষা ও সমাজসেবা, বিশেষতঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় তাঁর অবদান শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে প্রণয়ন করা হয়েছে। এটি একটি মৌলিক গবেষণা কর্ম। আমার জানা মতে ইতোপূর্বে কোথাও কোন ভাষাতেই এ শিরোনামে এম. ফিল ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে গবেষণা কর্ম সম্পাদিত হয়নি। আমি এ গবেষণা সন্দর্ভটির চূড়ান্ত কপি আদ্যন্ত পাঠ করেছি এবং এম. ফিল ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে দাখিল করার জন্য অনুমোদন করছি।

29/12/08

(ড. জাফর আহমদ ভূঁইয়া)
সাবেক চেয়ারম্যান ও
সহযোগী অধ্যাপক
এবং তত্ত্বাবধায়ক
ফার্সী ও উর্দু বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্ন স্বাক্ষরকারী এই মর্মে ঘোষণা প্রদান করছি যে, **'নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী'র শিক্ষা ও সমাজসেবা, বিশেষতঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় তাঁর অবদান শীর্ষক'** আমার বর্তমান অভিসন্দর্ভটি পূর্ণ অথবা আংশিকভাবে কোথাও প্রকাশ করিনি। এটি আমার মৌলিক ও একক গবেষণা কর্ম।

২৫/১২/২০০৫

(মোঃ সোহেল আল বেরুনী)
এম. ফিল গবেষক
ফার্সী ও উর্দু বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

সকল প্রশংসা মহান সৃষ্টিকর্তার জন্য যিনি তাঁর সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে মানব জাতিকে সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছেন। সালাম তাঁর প্রতি যাঁকে সৃষ্টি না করলে আল্লাহ্ পাক এ সৃষ্টিজগৎ সৃষ্টি করতেন না। যাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে দ্বীন প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায় লিপ্ত ছিলেন সাহাবা, তাবেঈন, তাবে-তাবেঈন, ফুকাহা, মুজাদ্দেদীন, উলামা বা দা'ঈগণ। আলোচ্য অভিসন্দর্ভটি এমনই একজন ব্যক্তিত্বের, যিনি তৎকালীন বাঙালি মুসলিম জাতির কল্যাণে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মেধা, বুদ্ধিমত্তা ও ধন-সম্পদ দিয়ে জীবন উৎসর্গ করেছেন। তিনি হলেন খান বাহাদুর নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী।

পরম করুণাময় আল্লাহ তায়ালার বিশেষ অনুগ্রহে "নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী'র শিক্ষা ও সমাজসেবা, বিশেষতঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় তাঁর অবদান" শিরোনামে আমার লেখা এই অভিসন্দর্ভ উপস্থাপন করতে পেরে খুবই আনন্দবোধ করছি। এজন্য আমার এই গবেষণাকর্মের তত্ত্বধায়ক ও আমার পরম শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্সী ও উর্দু বিভাগের বর্তমান সহযোগী অধ্যাপক ও সাবেক চেয়ারম্যান ড. জাফর আহমদ ভূঁইয়াকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। কেননা আমার রচিত অভিসন্দর্ভের গবেষণা পদ্ধতি ও তথ্য সংযোজন প্রক্রিয়া প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর সুচিন্তিত মতামত ও মূল্যবান পরামর্শ অনুযায়ী সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছি। তাঁর এই নিরলস ও আন্তরিক সাহায্য ও সহযোগিতা গবেষণা কর্মটি মান সম্মত করে তুলেছে। আমি তাঁর ঋণ কোনদিন পরিশোধ করতে পারবো না।

আমার এই গবেষণা চালিয়ে যাবার জন্য যারা আমাকে সর্বদা উৎসাহ-উদ্দিপনা যুগিয়েছেন এবং সর্বোতভাবে সাহায্য সহযোগিতা করেছেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন- ফার্সী ও উর্দু বিভাগের প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, আরবী বিভাগের প্রফেসর ড. এবিএম সিদ্দিকুর রহমান নিজামী, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ মুজতবা হুসাইন ও সহযোগী অধ্যাপক ড. মুহাঃ শফিকুর রহমান, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মোঃ আতাউর রহমান বিশ্বাস প্রমুখ। তাঁদের ঋণ পরিশোধ আমার পক্ষে দুঃসাধ্য।

আমার এই গবেষণা কর্ম চালাতে গিয়ে যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান এবং গ্রন্থাগার থেকে উপাত্ত, উপকরণ সংগ্রহ করেছি তন্মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সেন্ট্রাল লাইব্রেরি, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন লাইব্রেরি, বাংলা একাডেমী লাইব্রেরি, এশিয়াটিক সোসাইটি লাইব্রেরি, শাহবাগ পাবলিক লাইব্রেরি, ধনবাড়ীতে অবস্থিত নবাব বাড়ীর মুতাওয়াল্লী, ড. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ স্যারের ব্যক্তিগত লাইব্রেরি অন্যতম। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

Dhaka University Institutional Repository

নবাবের নাতী আশিকা আকবর এবং নাতী জামাই জনাব আকবর আলী সাহেব নবাবের ব্যাপারে যে সকল উপাত্ত দিয়ে সহযোগিতা করেছেন সেগুলোর কারণে আমার অভিসন্দর্ভটি সমৃদ্ধ হয়েছে। তাঁর ঋণ কোনদিন ভুলবো না। তিনি তার চোখে দেখা নবাবের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। সেজন্য তাঁকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।

আরো অনেক সুধী ও পণ্ডিতবর্গের কাছ থেকে যে মূল্যবান পরামর্শ, সহানুভূতি ও অনুপ্রেরণা পেয়েছি তা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি। এ ক্ষেত্রে পরম শ্রদ্ধেয় পিতা আলহাজ ডাঃ মোঃ আমিন উদ্দিন, পরম শ্রদ্ধেয় আম্মা রওশন আরা বেগম, আমার জীবন সঙ্গী যার উৎসাহ ও অনুপ্রেরণায় এই গবেষণা কর্মটি সুসম্পন্ন করতে পেরেছি। এ ছাড়াও নানাবিধ প্রতিকূলতার মাঝে গবেষণা কর্মটি সম্পাদন করার সময় যে সব বন্ধু-বান্ধব ও প্রিয়জন তাঁদের মধ্যে যাদের নাম উল্লেখ না করলে আমার অন্যায় হবে তারা হলেন আমার প্রিয় বন্ধু রইস-উল-ইসলাম মুকুল, যাঁর ঋণ আমি এবং আমার পরিবার কোন দিনই পরিশোধ করতে পারবে না। এছাড়া কামিয়াব প্রকাশনের স্বত্ত্বাধিকারী জনাব মোঃ হেলাল উদ্দিন, অতীশ দীপঙ্কর ইউনিভার্সিটি'র পরিচালক জনাব আরিফুল বারী মজুমদার এবং ইউনিভার্সিটি'র লাইব্রেরিয়ান জনাব আশরাফ আলী বিভিন্নভাবে যে সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন সে জন্য তাদের সবাইকে জানাই আন্তরিক মোবারকবাদ।

সবশেষে আল বেরুনী কম্পিউটার এণ্ড প্রিন্টার্সের দুইজন অপারেটর মোঃ রিয়াজ উদ্দিন এবং মাসুম অভিসন্দর্ভটি কম্পোজ করে যে সহযোগিতা করেছে তাও স্মরণ করার মত। অনেক প্রতিকূলতার মাঝেও তাঁরা দুজন গবেষণা কর্মটি নির্ভুলভাবে কম্পোজ ও বাঁধাই করতে সর্বোতভাবে সহযোগিতা করেছে। এছাড়া মাওলানা মোতাহার হোসাইন অভিসন্দর্ভটির প্রুফ দেখার কাজে সে সহযোগিতা করেছেন তা ভুলবার নয়। তাদের সবার নিকট আমি কৃতজ্ঞ।

নিবেদক -

২৫/১২/২০০৫

(মোঃ সোহেল আল বেরুনী)
এম. ফিল. গবেষক
ফার্সি ও উর্দু বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
তারিখঃ ২৫/১২/২০০৫

Dhaka University Institutional Repository

অবতরণিকা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, বাংলা রাষ্ট্রভাষার ১ম প্রস্তাবক, অবিভক্ত বাংলার প্রথম মুসলিম মন্ত্রী, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, বিশিষ্ট লেখক ও আধুনিক শিক্ষা বিস্তার এবং সমাজ সংস্কারে বাংলার যে কয়জন মুসলিম পথিকৃত প্রাগ্রসর ভূমিকা রেখেছেন নবাব বাহাদুর সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী তাঁদের অন্যতম। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে আব্দুল লতীফ ও স্যার সৈয়দ আহমদ মুসলিম শিক্ষা বিস্তারে যে মশাল হাতে আবির্ভূত হন, বিংশ শতাব্দীর প্রথম চতুর্থাংশে নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী তা কৃতিত্বের সাথে বিকশিত ও প্রস্ফুটিত করেন। মুসলিম ভারত বিষেশতঃ মুসলিম বাঙলার প্রত্যেকটি শিক্ষা-সমিতি, শিক্ষা-কমিটি ও শিক্ষা আন্দোলনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থেকে তিনি শিক্ষা-সেবা করেন। যেমন, 'বংগীয় সাহিত্য বিষয়ক মুসলমান শিক্ষা সমিতি'র প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি, 'মুসলমান ভার্নাকিউলার সাহিত্য সোসাইটি'র প্রেসিডেন্ট, 'পূর্ববংগ ও আসামের সেন্ট্রাল টেক্সট বুক কমিটি'র একমাত্র মুসলমান সদস্য, নিখিল ভারত মুসলমান শিক্ষা সমিতি'র সদস্য, 'পূর্ববংগ ও আসাম 'প্রাদেশিক শিক্ষা সমিতি' ও 'বংগ প্রেসিডেন্সি মুসলমান স্ত্রী-শিক্ষা' কমিটির সেক্রেটারি, পূর্ববংগ ও আসাম প্রাদেশিক মাদ্রাসা সংস্কার কমিটি'র সদস্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি; 'বেংগল প্রেসিডেন্সি মোহামেডান এডুকেশন্যাল এডভাইজার কমিটি' ও শামসুল হুদা কমিটি'র অন্যতম সদস্য হিসেবে তিনি শিক্ষানীতি প্রণয়ন, মুসলিম শিক্ষা বিস্তারের উপায় উদ্ভাবন, পাঠ্যসূচী রচনা ও সংকলন ইত্যাদি বিষয়ে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। পূর্ববংগ ও আসাম প্রাদেশিক আইনসভা, বংগ প্রেসিডেন্সি আইনসভা, ভাইসরয়-কাউন্সিল ও বেঙ্গল এগজিকিউটিভ কাউন্সিলের সদস্য এবং বেঙ্গল গভর্নমেন্টের মন্ত্রীরূপে তিনি দেশের শিক্ষা-কর্মসূচি রচনায় ও বাস্তবায়নে যথাসাধ্য চেষ্টা করেন।

নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী দেশের সাধারণ শিক্ষার উন্নতির জন্য স্ত্রীশিক্ষার অগ্রগতিকে অপরিহার্য বলে মনে করতেন। ১৯০৮ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারী পূর্ববংগ ও আসাম প্রাদেশিক সরকার স্ত্রী-শিক্ষার উন্নতিকল্পে ন্যাথানের নেতৃত্বে 'ফীমেল এডুকেশন কমিটি' গঠন করেন। নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী ঐ কমিটির সদস্য ছিলেন। ঐ কমিটির অধীনে মুসলমান স্ত্রী-শিক্ষার জন্য একটি স্পেশাল সাব-কমিটিও গঠন করা হয়। সাব-কমিটির সেক্রেটারি ছিলেন সৈয়দ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী।

নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী অনুধাবন করলেন যে, প্রাইমারী ও ভার্নাকিউলার শিক্ষা হলো মাধ্যমিক শিক্ষা ও উচ্চ শিক্ষার সোপান; জনগণ মাতৃভাষার মাধ্যমে যে শিক্ষালাভ করে, তার উপরই নির্ভর করে জাতির উন্নতি ও সমৃদ্ধি। প্রাথমিক শিক্ষার মধ্য দিয়েই সভ্যতার সুপ্ত সম্ভাবনাগুলো জাতির বিভিন্ন শ্রেণীর নাগালে আসে। শুধু প্রাইমারী নয়, মাধ্যমিক শিক্ষার কথাও তিনি ভাবতেন। ১৯১১-১২

Dhaka University Institutional Repository

সালের বাজেট-বক্তৃতায় তিনি সরকারের নিকট আগ্রহী গরীব শিক্ষার্থীদের জন্য বৃত্তি বৃদ্ধির আবেদন করেন এবং হাইস্কুলের স্বল্পতা হেতু ছাত্ররা ভর্তি হতে পারছে না দেখে স্কুলের অভাব নিরসনের প্রতি কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

তাই বলে বাংলার মুসলমানদের উচ্চ শিক্ষার কথাও নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী ভুলেননি। মুসলমানদের উচ্চ শিক্ষালাভের পথে প্রশাসনিক বা প্রাতিষ্ঠানিক যে সকল প্রতিবন্ধকতা ছিল, সেদিকে তিনি প্রাদেশিক আইনসভা, কেন্দ্রীয় আইনসভা ও 'মুসলমান শিক্ষা সমিতি'র বিভিন্ন অধিবেশনে সরকার ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি লক্ষ্য করেন যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মুসলমান ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকগণ অবহেলিত হচ্ছে। সে সময় মুসলমান ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা ছিল খুব কম। এমনকি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মাত্র দু'জন মুসলিম প্রভাষক কর্মরত ছিলেন। কারণ মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব করার মত এমন কোন ব্যক্তি সেই সময় প্রশাসনে উপস্থিত ছিলনা। মুলতঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সূচনা এখান থেকেই। নিম্নে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অভ্যুদ্যয়ের কিছু পেক্ষাপট এবং নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী সাহেবের সক্রিয় ভূমিকা আলোচিত হলঃ

১৯১১ সালের ১৯ আগস্ট রোজ সোমবার কার্জন হলে গভর্নর ল্যান্সলট বিদায় সম্ভাষণ এবং চার্লস বেইলীর শুভাগমন উপলক্ষে এক সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়। সেখানে 'পূর্ববংগ ও আসাম প্রাদেশিক মুসলমান সমিতি' এবং 'পূর্ববংগ ও আসাম প্রাদেশিক মুসলিম লীগ'-এর পক্ষ থেকে তাঁদেরকে দুটি মানপত্র দেয়া হয়। 'মুসলমান সমিতি'র মানপত্র পাঠ করে নওয়াব সলিমুল্লাহ এবং 'মুসলিম লীগের' মানপত্র পড়ে শুনান নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী। এ দুটি মানপত্রে অবশ্য ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের দাবিও অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৯১০ সালের ৫ এপ্রিল কাউন্সিল-সদস্য বাবু অনংগ মোহন নাহা পূর্ববংগ ও আসাম-আইনসভায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের দাবি করেছিলেন, কিন্তু অনংগ মোহন নাহারের সে প্রস্তাব গৃহীত হয়নি। পূর্ববংগ ও আসাম প্রাদেশিক সরকারও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু ভারত সরকার কর্তৃক তা গৃহীত হয়নি। সে যা হোক, লর্ড হার্ডিঞ্জ কর্তৃক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি রূপায়নে প্রাণপণ চেষ্টা করেন। নওয়াব সলিমুল্লাহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দেখে যেতে পারেন নি। নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী তাঁর চেষ্টার ফল স্বচক্ষে দেখে গেলেন এবং মনের আনন্দও উপভোগ করলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পেছনে অবদান তো অনেকেরই রয়েছে, কিন্তু নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী'র মত এত বেশি অবদান আর কারুর আছে বলে মনে হয় না। সেই ১৯১১ সালের ৩১ জানুয়ারী অর্থাৎ যে দিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি ঘোষিত হয়, সে দিন থেকে ১৯২০ সালের ২৩ মার্চ অর্থাৎ যে দিন বড়লাটের আইনসভায় 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এ্যাক্ট' পাস হয়, সে দিন পর্যন্ত এর পেছনে নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী'র চেষ্টার বিরাম ছিল না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কমিটির সদস্যরূপে বিশ্ববিদ্যালয়ের নীল নক্শা অংকনে

Dhaka University Institutional Repository

তিনি গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি বেংগল প্রেসিডেন্সি আইনসভায়, অল-ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ-এর অধিবেশনে, বেংগল প্রেসিডেন্সি মুসলমান শিক্ষা সমিতির কর্মকাণ্ডে ইম্পিরিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য বেংগল গভর্নমেন্ট ও ইন্ডিয়া গভর্নমেন্টের উপর চাপ দিতে থাকেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি প্রণীত রূপরেখা বাস্তবায়িত করার জন্য তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করেন, বড়লাট ব্যবস্থাপক পরিষদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এ্যাকট পাসের জন্য গভর্নমেন্টের উপর চাপ সৃষ্টি করেন। গভর্নমেন্ট থেকে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার নিশ্চয়তা পাওয়ার পরেই তিনি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন এবং সর্বশেষে বিশ্ববিদ্যালয় এ্যাকট প্রণয়নের সময় মুসলিম স্বার্থ সংশ্লিষ্ট নীতিমালা নির্ধারণের আলোচনায় বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন।

উল্লেখ্য যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সবিশেষ উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও তা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিলে স্থানলাভ না করায় নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী সাহেব উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তিনি যুক্তি দিয়ে বলেন, অর্ডিন্যান্স বা রেগুলেশনের মাধ্যমে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ খোলার পথ উন্মুক্ত থাকলেও তা নিশ্চিত পন্থা নয়। তাই এই বিভাগের গুরুত্বের নিরিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিলে এর বিশেষ উল্লেখ থাকা আবশ্যক। তাঁর এ সংশোধনী প্রস্তাব গৃহীত হয়। ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী সাহেবের এক অভিনব সৃষ্টি। এর পূর্বে উপমহাদেশে কোথাও এর নজীর বিদ্যমান ছিল না। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এখনো এরূপ কোন বিভাগ নেই।

এভাবে একজন সচেতন সমাজ সংস্কারক হিসাবে মুসলিম শিক্ষা বিস্তার- তথা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অভ্যুদ্বয়ে নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াস অনস্বীকার্য। প্রাথমিক শিক্ষা থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ বিদ্যাপিঠ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা এবং প্রসারে তাঁর অবদান জাজ্বল্যমান। এছাড়া ইসলামি শিক্ষাকে আধুনিকায়ন এবং মুসলমান ছাত্র-ছাত্রীদের সুপ্ত মেধা বিকাশের উন্নয়নে নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী ছিলেন অগ্রণী। অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্য যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিংহভাগ ছাত্র-ছাত্রী তাঁর অম্লান অবদান সম্পর্কে অবহিত নয়। এমনকি নতুন অনেক শিক্ষকগণও অবগত কিনা সন্দেহ। এ রকম একজন দেশপ্রেমিক, মুসলিম রেঁনেসার পথিকৃত নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরীর মত প্রথিতযশা শিক্ষাবিদের উপর নানা কৌণিকে পর্যলোচনা এবং গবেষণা হওয়া খুবই জরুরী বলে আমি মনে করছি। কারণ নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরীর মত জ্ঞান পিপাসু মুসলিম ব্যক্তিত্ব এই বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন বলেই ঐ সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মত দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপিঠ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে যা পরবর্তীতে প্রাচ্যের অক্সফোর্ড নামে পরিচিতি লাভ করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী'র সমকালীন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক অবস্থা

বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে এবং মুক্তিসংগ্রামের ধারাবাহিক ঘটনাবলিতে ঢাকার একটি আলাদা ঐতিহ্য ও গুরুত্ব বরাবরই ছিল। ১৬০৫ সালে দিল্লির মোগল সাম্রাজ্যে সম্রাট হিসেবে আগমন করেন নুরউদ্দিন জাহাঙ্গীর। জাহাঙ্গীরের সম্রাট হওয়ার বদৌলতে রাজনৈতিক শহর হিসেবে ঢাকার জন্ম হয়। ১৬০৯ সালে সম্রাট জাহাঙ্গীরের বঙ্গে সুবাদার ইসলাম খান চিশতি বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে একটি নগরী স্থাপন করেন এবং এর পরিচয় চিহ্নিত করেন তাঁর সম্রাটের নামানুসারে জাহাঙ্গীরনগর। যদিও ১৪০০ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে প্রাচীন ডাবেকা রাজ্যের রাজধানী হিসেবে ঢাকা এই অঞ্চলের ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ শহর, তথাপি মোগলরাই এই শহরকে রাজনৈতিকভাবে প্রথম ইতিহাসখ্যাত করে তোলেন।

সময়ের দিক থেকে ১৬৫১ খ্রিস্টাব্দও ঢাকার জন্যে বিখ্যাত এই জন্যে যে, এ বছর ইংরেজরা প্রথম বাংলাদেশে আগমন করে এবং ঢাকা ও কাসিমবাজারে বাণিজ্যের কুঠি স্থাপন করে। ইংরেজদের এই বাণিজ্য কুঠি বাংলার ইতিহাসে খুব গুরুত্বপূর্ণ। এখান থেকেই ইতিহাসের চাকা ভিন্নখাতে ঘুরতে থাকে। ১৬৫৯ সালে দিল্লির সিংহাসনে সম্রাট আওরঙ্গজেব অধিষ্ঠিত হওয়ার পর ঢাকার ইতিহাসে অনেকটা ছেদ ঘটে। কারণ সম্রাটের নতুন দেওয়ান মুর্শিদকুলী খান (১৭০৩) বঙ্গের রাজস্ব বিভাগের অফিস ঢাকা থেকে মকসুদাবাদে স্থানান্তর করেন। রাজস্ব বিভাগই যদি না থাকে নগরের আর মূল্য কি থাকে? মকসুদাবাদই হয়ে গেল সব। পরে মকসুদাবাদের নামও পরিবর্তিত হয়ে মুর্শিদকুলী খানের নামানুসারে হয়ে যায় মুর্শিদাবাদ। ১৭১৭ সালে রাজধানীও চলে যায় ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে।

তবে তারপরও রাজনৈতিক কারণে ঢাকার গুরুত্ব সব সময় ছিল। ১৬২৪ খ্রিস্টাব্দে পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে শাহজাদা খুররম দখল করে নিয়েছিলেন ঢাকা। মোগল শাহজাদার কাছে ঢাকা এতটাই গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়েছিল। ১৬৯৩ সালে সম্রাট শাহজাহান তাঁর দ্বিতীয় পুত্র শাহসুজাকে ঢাকায় বাংলার সুবেদার করে পাঠান। আসামের গৌহাটির মোগল শাসনকর্তা মীর লুৎফুল্লা শিরাজী পার্শ্ববর্তী রাজার আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্যে পালিয়ে এসে জীবন রক্ষা করেন ঢাকায়। ১৬৫৮ সালে এই ঘটনা ঘটে।

Dhaka University Institutional Repository

১৭১৩ খ্রিস্টাব্দে শাহজাদা ফররুখ সিয়ার অথবা মীর জুমলা কিংবা মুজাফফর জঙ্গ কেউই সুবেদার নিযুক্ত হয়ে বাংলায় আসেননি, বলা চলে আসতে চান নি। তবে ১৬৫৯ সালে মীর জুমলা তাঁর সম্রাট আওরঙ্গজেবের নির্দেশে যখন যুদ্ধ করে চলছেন শাহ সুজার বিরুদ্ধে, তখন মীর জুমলা একবার ঢাকায় এসেছিলেন শাহ সুজাকে তাড়াতে। ১৬৬৩ সালে ঢাকা আবার আলোচ্য বিষয়ে পরিণত হয়েছিল মীর জুমলার মৃত্যুতেও। কোচবিহারের খিজিরপুরে তিনি মারা গেলেও মরদেহ সুরক্ষিত করে পারস্যে প্রেরণের জন্যে ঢাকায় আনতে হয়েছিল তাঁর দেহকে।

১৬৬৪ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা আবার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জমজমাট। এ সময় বাংলার সুবেদার হয়ে আসেন শায়েস্তা খান। এ আমলে ঢাকার সৌন্দর্য, নৌবাহিনী এবং অন্যান্য নৌ কার্যক্রম খুব জোরদার হয়ে উঠেছিল। ঢাকার কাছেই বানাদিয়ায় যুদ্ধ হয়েছিল আরাকানের মগ দস্যুদের সাথে শায়েস্তা খানের বাহিনীর। ১৬৭৬ খ্রিস্টাব্দে বাংলার সুবেদার নবাব শায়েস্তা খান পদত্যাগ করেছিলেন। নবাব খোদাই খান তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন খুব অল্প সময়ের জন্যে, কারণ ১৬৭৮ খ্রিস্টাব্দে স্বয়ং সম্রাট আওরঙ্গজেবের পুত্র শাহজাদা মোহাম্মদ আযম বাংলার সুবেদার হয়ে আসেন। ঢাকার লালবাগ দুর্গ নির্মাণের পরিকল্পনা হয় শাহজাদা আযমের আমলেই। কিন্তু সুবেদার আযম অচিরেই ঢাকা ত্যাগ করেন, ফলে আবার রাজধানী ঢাকায় ১৬৭৯ খ্রিস্টাব্দে সুবেদার হয়ে আসেন শায়েস্তা খান।

ঢাকার আর্থ-সামাজিক ইতিহাসে নানা কারণেই শায়েস্তা খান বিখ্যাত হয়ে আছেন। তাঁর আমলে এক টাকায় আট মন চাউল পাওয়া যেত। ১৭২৭ খ্রিস্টাব্দে চাউলের মূল্য বৃদ্ধি পেলে শায়েস্তা খানের শর্ত অনুযায়ী পুরোনো ঢাকার কিল্লার পশ্চিম দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। পরে চাউলের মূল্য কমে আসায় আবার দরজা খুলে দেওয়া হয়। ঢাকার লালবাগ দুর্গ নির্মাণ করেও খায়েস্তা খান ঢাকার ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছেন।

মোগল আমলের শেষ পর্বে ঢাকা আরো নানাভাবে রাজনৈতিক কারণে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। পার্শ্ববর্তী নানা রাজ্যে ঝামেলা হলেই রাজারা এসে ঢাকায় আশ্রয় নিতেন, অথবা পালিয়ে থাকতেন ঢাকায়। কখনো বা ঢাকার সহায়তায় আবার রাজ্য পনুরুদ্ধার করে গৃহে ফিরে যেতেন। আসামের রাজা জয়ধ্বজের সঙ্গে ১৬৬২ খ্রিস্টাব্দে মীর জুমলার যুদ্ধে শক্তি বাড়াতে নৌ সেনাপতি আবুল হুসাইনকে পাঠানো হয়েছিল ঢাকা থেকে। ত্রিপুরা রাজ্যে চাচা-ভাতিজার সিংহাসন দখলের লড়াইয়ে ভাতিজা পরাজিত হয়ে ১৭৩২ সালে ঢাকায় এসে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং মোগল শক্তির সাহয্যে চাচাকে পরাজিত করেন বটে, কিন্তু ততোক্ষণে রাজ্য মোগল দরবারভুক্ত হয়ে পড়েছিল।

বাংলার স্বাধীন নবাবদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র প্রথম শুরু হয়েছিল ঢাকা থেকেই। ঢাকার সহকারী শাসনকর্তা রাজা রাজবল্লভ নানা কারণেই বিরাগভাজন হয়েছিলেন নবাব সিরাজ-উদ্দৌলার। নবাবের বিরুদ্ধে

Dhaka University Institutional Repository

ষড়যন্ত্র করতে রাজবল্লভ ঢাকা থেকেই কলকাতায় গিয়েছিলেন ১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দে, উদ্দেশ্য সিরাজের বিরুদ্ধে বণিকদের সহয়তা নিতে অথবা সহয়তা দিতে।

১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে নবাব সিরাজ-উদ্দৌলার পরাজয়ের পরে নবাব পরিবারের বেঁচে যাওয়া রমণী ও স্ত্রীদের নিয়ে আসা হয় ঢাকায় এবং পরে ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে তাদের সকলকে ঢাকার বুড়িগঙ্গা নদীতে ফেলে হত্যা করা হয়।

অন্যদিকে ১৭৫৭ সালে মীর জাফর আলী খান, নবাব সিরাজ-উদ্দৌলার স্থানে বাংলার নবাব হিসেবে ইংরেজদের দ্বারা অধিষ্ঠিত হয়েই তাঁর পুত্র মীরনকে ঢাকা নগরীর তদারকীতে পাঠিয়েছিলেন। মীরন অবশ্য পরে যুদ্ধ করতে পাটনা চলে যান এবং সেখানে বজ্রপাতে নিহত হন। সিরাজ-উদ্দৌলার পতনের পর মীরজাফর মীরনকে পাঠানোর মাধ্যমে কেন ঢাকাকে এত গুরুত্ব দিয়েছিলেন তা এখনো রহস্যাবৃত।

ঢাকায় স্বাধীনতা সংগ্রামের সূচনা

১৮৫৭ সালে ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনের অংশ হিসেবে ভারতের সিপাহীরা যে সশস্ত্র বিদ্রোহ শুরু করে, তাতে বাংলাদেশের সংগ্রামী মানুষও জড়িয়ে পড়েছিল। ব্রিটিশ আমলের বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে এই ঘটনা ছিল অসাধারণ। যদিও ১৮৫৭ সালে সিপাহীদের এই বিদ্রোহের পূর্বেই ঢাকায় ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছিল। সিরাজ-উদ্দৌলা ট্র্যাজেডির মাত্র পাঁচ বছর পর ১৭৬৩ খ্রিস্টাব্দে। বিদ্রোহী সন্ন্যাসীরা ঢাকা ফ্যাকটরি পর্যন্ত দখল করে নিয়েছিল। তবে সেই ১৮৫৭ সালেই ব্রিটিশের বিরুদ্ধে ঢাকার মানুষের যুদ্ধ সবাইকে অবাক করে দিয়েছিল। ১৮৫৭ সালের ঢাকার ব্রিটিশ ম্যাজিস্ট্রেট বাকল্যান্ড তাঁর রচিত গ্রন্থে ১৮৫৭ সালের ভারতের সিপাহী বিদ্রোহের সময়কালীন বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি বর্ণনা করেছিলেন। এতে ঢাকা সম্পর্কে তাদের বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি এবং উত্তেজনা লক্ষ্য করার মতো। উপমহাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে ঢাকার জনগণের এই আলাদা বৈশিষ্ট্যের কারণে ১৮৫৭ সালের সিপাহীদের বিদ্রোহের ১১৪ বছর পরে ১৯৭১ সালে একটি নতুন স্বাধীন দেশ এখানকার জনগণ লাভ করে।

১৮৫৭ সালের মে মাসে পশ্চিমবঙ্গের ব্যারাকপুরে সিপাহীরা বিদ্রোহ করার পর চট্টগ্রামের সিপাহীরাও ১৮ নভেম্বর, নোয়াখালী, কুমিল্লা, বরিশাল জেলার ইংরেজ কর্মচারী ও স্থানীয় জমিদাররা ঐক্যবদ্ধভাবে এ বিদ্রোহ দমন করতে যোগ দেয়। কিন্তু ফরিদপুর ও বাকেরগঞ্জ অঞ্চলের জনগণ ফরায়েজী আন্দোলনকারীদের সাথে মিলে সিপাহীদের সমর্থনে বিক্ষোভ মিছিল ও জনসভা করতে থাকে। এই

Dhaka University Institutional Repository

সময় এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন ফরিদপুরের বিখ্যাত ফরায়েজী নেতা দুদু মিঞা।

চট্টগ্রাম বিদ্রোহের ৪দিন পর অর্থাৎ ২২ নভেম্বর (১৮৫৭) ঢাকা দুর্গেও বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। এখানে সিপাহীদের নিরস্ত্র করতে গেলে তারা দুর্গের কামান দখল করে নেয়। ঢাকায় সশস্ত্র যুদ্ধের পর এখানে ৪১ জন স্বাধীনতাকামী বিদ্রোহী সিপাহী শাহাদত বরণ করেন।

ইতিহাসের বঙ্গ ভঙ্গ এবং ঢাকা

ব্রিটিশ আমলে 'বঙ্গভঙ্গ' কে কেন্দ্র করে বঙ্গদেশে মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল। বঙ্গদেশকে পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ (ঢাকা ও কলকাতাকে কেন্দ্র করে)–এই দুই ভাগে বিভক্ত করায় কলকাতা বেশ সরগরম হয়ে ওঠে ১৯০৫ সালে। অন্যদিকে মুসলিম প্রধান অঞ্চল ঢাকা থেকে যায় সমভাবেই নীরব। কারণ পূর্ববঙ্গের জনগণের কাছে ঢাকাই ছিল তাদের কেন্দ্রস্থল। মুসলমান প্রধান পূর্ববঙ্গ অপেক্ষাকৃত বেশি সুযোগ-সুবিধা লাভের আশায় বঙ্গভঙ্গে প্রকৃতপক্ষে মৌনভাবে সমর্থনই জানায়। পার্বত্য ত্রিপুরা ও আসামকে ঢাকার সাথে যুক্ত করে নতুন প্রদেশ গঠন করায় পূর্ব বাংলার সামনে নতুন এক সম্ভাবনা জেগে ওঠে।

তবে ইংরেজরা হঠাৎ করেই বাংলা প্রদেশকে ভাগ করার চিন্তা করে নি। ১৮৭৪ সালে বাংলা প্রদেশ থেকে আসামকে বিচ্ছিন্ন করে একটি চিফ কমিশনারশিপের মর্যাদায় উন্নীত করা হয়েছিল। পরে সিলেটকেও যুক্ত করা হয়েছিল আসামের সঙ্গে। ১৮৯২ সালের জুন মাসে লর্ড ল্যান্স ডাউন ঘোষণা করেছিলেন যে, বাংলা প্রদেশের আওতা থেকেই লুসাই এবং চিনা ক্ষুদ্র জাতির কিছু এলাকা আসামের আওতায় আনা হবে। পরে চট্টগ্রামকেও যুক্ত করা হয়েছিল এর সঙ্গে।

১৮৯০ সালের ১০ জুলাই লর্ড কার্জন এলাকা পুনর্গঠন পরিকল্পনা অনুমোদন করেন। একই বছরের নভেম্বর মাসে রিজলি এ পরিপ্রেক্ষিতে এই খসড়া পেশ করেন (ঐক্যবদ্ধ বাংলা ইংরেজদের পক্ষে একটি বিপজ্জনক শক্তি। বিভক্ত হলে বাংলাদেশ আর আমাদের তেমন বিপদে ফেলতে পারবে না) এবং এ নিয়ে বিতর্কও শুরু হয়ে যায়। এই প্রেক্ষাপটেই ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর ইংরেজ সরকার বাংলাদেশকে দু'ভাগে ভাগ করে দেয়। ওই একই দিন কলকাতায় অনুষ্ঠিত এক বিরাট প্রতিবাদ শোভাযাত্রা পরিচালনা ও বঙ্গভঙ্গ না মানার প্রতিজ্ঞাপত্র পাঠ করেছিলেন কবি রবীন্দ্রনাথ। ছাত্র-জনতা ক্রমেই বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে অত্যন্ত সক্রিয় হয়ে ওঠে। আন্দোলনকারীরা রাখি-পূর্ণিমার দিনে রাস্তায় নেমে সকলের হাতে ঐক্যের প্রতীক 'হলদে সুতোর রাখি' বেঁধে দেয়। আন্দোলনের চাপে সরকার শেষ পর্যন্ত বাঙলা ভাগের সিদ্ধান্ত ১৯১১ সালে বাতিল করতে বাধ্য হয়।

Dhaka University Institutional Repository

ফলে ঢাকাকে রাজধানী করে এই অঞ্চলের যে নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলে যাওয়ার কথা ছিল তা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হল। তবে সিদ্ধান্ত বাতিলের সম্ভাব্য পালটা প্রতিক্রিয়া রোধ করার উদ্দেশ্যে ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এরই ভিত্তিতে ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।

তবে ঢাকার নবাব কিংবা পূর্ব বাংলার বিত্তশালী মুসলমান সমাজ প্রথম থেকেই বাংলা ভাগের পক্ষে ও বিপক্ষে খুব দ্বিধাদ্বন্দ্বে ছিলেন। সেই সময়কার এমনকি আনুষ্ঠানিকভাবে বঙ্গ-ভঙ্গ হওয়ার পূর্ব থেকেই ঢাকার পত্রপত্রিকা দ্বিধাবিভক্ত ছিল দ্বিখণ্ডিত বাংলাকে মেনে নেওয়া না-নেওয়ার প্রশ্নে। তখনকার প্রধান পত্রিকা 'ঢাকা প্রকাশ' এ ব্যাপারে প্রায় প্রতি সংখ্যাতেই সংবাদ কিংবা নিবন্ধ বা সম্পাদকীয় ছাপতে থাকে। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তাদের নিম্নলিখিত ভাষ্যটি ছিল খুবই প্রণিধানযোগ্য:

প্রাচীনকাল থেকেই 'বঙ্গদেশে' অবিচ্ছিন্ন এবং মুসলমান সম্রাটরাও কখনো এর সীমানা সংকোচন করেন নি। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার এখন এই প্রদেশকে দ্বিখণ্ডিত করতে চান কারণ তারা 'ডিভাইড এন্ড রুল' নীতির সমর্থক।

বাঙালিদের কাছে পত্রিকাটি তখন এই বলে আবেদন জানিয়েছিল:

"তাই বঙ্গবাসী, এই বিষম বিপ্লবকর প্রস্তাব কার্যে পরিণত হইলে, বাঙালি জাতির কী সর্বনাশ সংঘটিত হইবে একবার তাহা নিবিষ্ট চিত্তে চিন্তা করিয়া দেখিয়াছ কি? অতএব স্বদেশের জন্যে স্বদেশীদের জন্যে, যে কোনো বঙ্গ সন্তানের শ্রদ্ধা আছে তাহাদের প্রত্যেকের কর্তব্য; এই প্রলয়কর প্রস্তাবের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া জাতীয় অসন্তোষ চিহ্ন ভারত গভর্নমেন্টের নিকট স্থাপন করেন।"

ঢাকায় বঙ্গভঙ্গ বিষয়ে প্রথম প্রতিবাদ সভাটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল ধানকোরার জমিদার বাড়িতে। সভায় উপস্থিত ছিলেন প্রধানত জমিদার, তালুকদার ও উকিলরা এবং প্রতিবাদ, বিক্ষোভ জানাবার ও সংগঠিত করার জন্য এ সভা একটি কমিটিও গঠন করেছিল। সভাশেষে কমিটির পক্ষ থেকে চিফ সেক্রেটারির কাছে 'দৃঢ় কিন্তু শ্রদ্ধাবনত প্রতিবাদ' করা হয়েছিল। এ সভার পক্ষ থেকে ভারত সরকারের কাছে একটি টেলিগ্রাম পাঠিয়ে শ্রদ্ধাপূর্ণ চিত্তে সরকারের প্রস্তাব কার্যকর না করার আবেদন জানানো হয়েছিল। (মুনতাসির মামুন: উনিশ শতকে পূর্ব বঙ্গের সমাজ, পৃষ্ঠা ২০৪-থেকে সংগৃহীত)

শুধু তাই নয়, এই প্রসঙ্গে 'ঢাকা প্রকাশ' মন্তব্য করেছিল:

"সমগ্র ভারতে রাজধানী হিসেবেও যদি ঢাকাকে উন্নীত করে বাংলা থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়, তা হলেও পূর্ববঙ্গবাসী তা মেনে নেবে না। কারণ আবহমান কাল থেকে তারা বাঙ্গালী। বাঙ্গালী আখ্যা তাদের

Dhaka University Institutional Repository

'পৈত্রিক সম্পত্তি'। পিতৃ প্রদত্ত অধিকার জ্ঞানান্তেও পরিত্যাগ করিতে আমরা প্রস্তুত নহি।"

বাংলা বিভাগ প্রস্তাবের বিরোধিতা করার জন্যে এরপর 'জনসাধারণ সভা' ২০ পৌষ ১৩১০ (১৯০৩) তারিখে বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে বাকল্যান্ড বাঁধের ওপর এক সভার আয়োজন করে। সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন একজন জমিদার–মৌলভী খলিলুর রহমান আবু জাইগম সাবির।

১৯০৪ সালের ২৫ জানুয়ারি ঢাকার প্রভাবশালী নাগরিক বলিয়াদীর জমিদার কাজেম উদ্দিন আহমদ সিদ্দিকীর বাসায় 'মুহম্মদীয়ান ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন এসোসিয়েশনের'ও এক সভা আহ্বান করা হয়। সভায় বাংলা ভাগের প্রস্তাবের বিরোধিতা করা হয়েছিল। তাদের একটি প্রধান যুক্তি ছিল, মহসীন ফান্ডের উপকারিতা হইতে বঞ্চিত হইলে মুসলমান সম্প্রদায়ের অনিষ্ট হবে। হাজী মোহাম্মদ মহসীনের নামে এই সময় মুসলমান ছাত্রদের জন্যে একটি বৃত্তি প্রথা প্রচলিত ছিল। হাজী মোহাম্মদ মহসীন পশ্চিম বাংলায় জন্মগ্রহণ করায় আশঙ্কা করা হয়েছিল হাজী মহসীন বৃত্তি সম্ভবত তা হলে আর পশ্চিম বাংলার বাইরে দেওয়া হবে না। ফলে পূর্ব বাংলার মুসলমান ছাত্ররা এই বৃত্তি থেকে বঞ্চিত হতে পারে এমন ধারণা হয়েছিল। ঢাকার বাইরের যারা জমিদার, তারাও এগিয়ে এসেছিলেন বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে। ২৬ জানুয়ারি ঢাকার নর্থব্রুক হলে একটি সভায় মফস্বলবাসী জমিদাররা বাংলা ভাগ করার প্রস্তাবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেছিলেন। এই সভায় নয়টি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য পাঁচটি প্রস্তাব ছিল:

এক. এই বিভাজন বাংলা সাহিত্যের মান নীচু করবে এবং পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার মধ্যে যে সামাজিক ঐক্য বিদ্রমান, তা ছিন্ন করবে।

দুই. এই অঞ্চলের জনগণ বঞ্চিত হবে লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সুবিধা থেকে এবং আঞ্চলিক বাজেট আলোচনায় লোকাল কাউন্সিলের একজন সদস্য নির্বাচনের সুযোগ হারাবে।

তিন. বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থার জটিল আইনসমূহ নতুন প্রদেশের নতুন কর্মচারীদের হাতে পড়ে আরো জটিল হয়ে উঠবে।

চার. উপযুক্ত বিদ্যায়তনের অভাবে এ অঞ্চলের উচ্চমানের অবনতি ঘটবে। এবং

পাঁচ. বাংলা বিভাগ প্রস্তাবের ফলে কলকাতার থাকছে হাইকোর্ট, অন্যদিকে প্রশাসনিক ব্যবস্থার কেন্দ্র থাকবে অন্য অঞ্চলে, ফলে বিভিন্ন অঞ্চলে জমিদারদের কর্মচারী নিয়োগ করার ব্যাপারে অসুবিধা হবে।

এরপর ২৭ জানুয়ারি ঢাকার গ্রাজুয়েটরাও নর্থব্রুক হলে বাংলা ভাগের বিরোধিতা করে চারটি প্রস্তাব

Dhaka University Institutional Repository

গ্রহণ করেছিলেন, যার মধ্যে একটি প্রস্তাব ছিল আগের দেওয়া প্রস্তাবগুলো থেকে একটু ভিন্নতর। ঐ প্রস্তাবের মাধ্যমে গ্রাজুয়েটরা আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেছিলেন যে, বাংলা ভাগের ফলে পূর্বাঞ্চলের অধিবাসীদের চাকরি পাবার বেলায় প্রতিকূলতার সৃষ্টি হতে পারে।

ঢাকার উর্দুভাষী সর্দাররাও বাংলাকে ভাগ করার বিরোধিতা করেছিলেন। উর্দূভাষীরা এ ব্যাপারে ভিন্ন কারণ দর্শিয়েছিলেন। তারা মনে করতেন, আসামে বিশুদ্ধ মুসলমানের একান্তই অভাব। এই ঢাকা ময়মনসিংহ যদি আসামের সঙ্গে যুক্ত হয়, তবে পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের ঐ অঞ্চলের অধিবাসীদের সঙ্গে বাধ্য হয়ে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে হবে, যার ফলে ত্রুটিপূর্ণ সংমিশ্রণের সৃষ্টি হবে মুসলমান সমাজে।

১৯০৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে জগন্নাথ কলেজে অনুষ্ঠিত হয়েছিল ঢাকার মুসলমানদের এক সভা। সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন ভারতের মোগল সম্রাটবর্গের পুরোহিত বংশোদ্ভূত শতোর্ধ্ব বয়স্ক বিশিষ্ট ব্যক্তি শ্রীযুক্ত সৈয়দ গোলাম মুস্তফা আল হোসেনি। সভায় ঠিক করা হয়েছিল, আসন্ন বাংলা ভাগ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে সবাই মসজিদে প্রার্থনা করবেন।

১৯০৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সরকারি পক্ষের যুক্তি উপস্থাপনের জন্যে লর্ড কার্জন পূর্ববঙ্গ সফর করেন। কার্জন সব সময় বলে আসছিলেন যে, প্রশাসনিক কারণে এই বিভাগ প্রয়োজন। তিনি বলতেন যে, দরিদ্র রায়ত, দোকানদার প্রভৃতি শ্রেণীর লোকজন প্রস্তাবটির পক্ষে আছে। শুধু শিক্ষিত শ্রেণী তাদেরকে সরকারের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করছে।

বঙ্গভঙ্গ প্রশ্নে বাঙালি মুসলমান ও হিন্দু বুদ্ধিজীবীরাও দ্বিমত পোষণ করতেন। যেমন ইসমাইল হোসেন সিরাজী ছিলেন বঙ্গভঙ্গের বিপক্ষে। আবার গিরিশচন্দ্র সেন ও মুনশী মেহেরুল্লাহ ছিলেন বঙ্গভঙ্গের পক্ষে। তবে মনে হয়, মুসলমানদের অনেকে যে বঙ্গবঙ্গ সমর্থন করেন নি তার প্রধান কারণ তাদের রাজনৈতিক বিশ্বাস ও আঞ্চলিক মতভেদ।

পূর্ববঙ্গের দুই প্রধান সম্প্রদায় হিন্দু ও মুসলমানরা যখন দু'রকম কথা বলছিল, তখন ঢাকায় মুসলমান সমিতির একটি অধিবেশন হয়েছিল, যাতে সভাপতিত্ব করেছিলেন 'বান্ধব' অধিবেশনে ইসমাইল হোসেন সিরাজী (১৮৮০-১৯৩১)। তিনি তাঁর বক্তৃতায় বলেছিলেন:

ভারতের হিন্দু মুসলমান এক বৃন্তে দুটি ফুল বা একই দেহের অঙ্গান্তর মাত্র। এক দেহের উভয় অঙ্গের মধ্যে সম্প্রীতি সংস্থাপিত হইবে না, বিদ্বেষ প্রণোদিত না হইলে কেমন করিয়া একথা বিশ্বাস করা যাইতে পারে। ভারতের জীবনীশক্তি এবং বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সুখসম্পদ এই জাতির একপ্রাণতার উপরই নির্ভর করে। (সাপ্তাহিক ঢাকা প্রকাশ, ২৮ আগস্ট ১৯০৪)।

Dhaka University Institutional Repository

গিরিশচন্দ্র সেন (ভাই গিরিশচন্দ্র) বঙ্গভঙ্গকে খুব ভালোভাবে এবং যুক্তি দিয়ে তুলে ধরে লিখেছিলেন: বঙ্গভঙ্গ তিনি সমর্থন করেন কারণ এর ফলে পশ্চাৎপদ পূর্ববঙ্গের উন্নতি হবে। তিনি বিশ্বাস করতেন বাংলা ভাগ অর্থনৈতিক দিক থেকে পূর্ববঙ্গের জন্যে কল্যাণকর। গিরিশচন্দ্র আরো লিখেছিলেন:

আমার জন্মস্থান ঢাকা জিলায়, সে স্থানে আমার বাসগৃহ, আমি ঢাকা নিবাসী। ঢাকা রাজধানী হইল, ঢাকা অঞ্চলের অনেক বিষয়ে উন্নতি হইতে চলিল, ইহাতে আমার দুঃখ না হইয়া বরং আনন্দ হওয়াই স্বাভাবিক। (গিরিশচন্দ্র সেন: আত্মজীবনী, কলকাতা, ১৯০৬)।

তবে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পক্ষে-বিপক্ষে যত ঘটনাই থাকুক, দুটোই বাংলা, বাঙালি ও ঢাকার জন্যে ইতিবাচক হয়ে দেখা দেয়। বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে 'বঙ্গভঙ্গ' ঘটনাবলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যারা বাংলাদেশটি ভাগ করা সমর্থন করেন নি তারা ভেবেছিলেন সকল বাঙালি এক সাথে থাকবো। এতে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনারই বিকাশ ঘটে।

আবার যাঁরা বাংলা ভাগকে সমর্থন করলেন তাঁরা ভেবেছিলেন, এর ফলে পূর্ববাংলার পিছিয়ে পড়া বাঙালিরা এবার এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ পাবে। বাংলা ভাগ হলে ঢাকা আবার রাজধানী হবে, রাজধানী হলে ঢাকাকে কেন্দ্র করে নতুন শক্তি গড়ে উঠবে– এই ছিল তাদের চিন্তা। এতে ভুল ছিল না। প্রকৃতপক্ষে এই দুটো ধারাই সংমিশ্রিত হয়ে পড়ে ঢাকা কেন্দ্রীক বাঙালি জনগোষ্ঠীর স্বতন্ত্র ও স্বাধীন আবাসভূমির চেতনার ভিত্তি গড়ে ওঠে। বঙ্গভঙ্গ ঘটনার ফলশ্রুতিতেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ই পূর্ব বাংলার শিক্ষিত মুসলমান মধ্যবিত্ত শক্তিকে প্রাণ সঞ্চার করে। এখান থেকেই ১৯৪৭ সালের পর পূর্ববাংলার জনগণ আলাদা সত্তায় সমগ্র বিশ্বে আত্মপ্রকাশ করে।

'বঙ্গভঙ্গ' ঘটনাবলি পক্ষের কিংবা বিপক্ষের দুটোই এভাবে বাংলার সাহিত্য, সংস্কৃত এবং রাজনীতির সূত্রকার হিসেবে ঢাকার সৃজনশীল বিকাশকে ত্বরান্বিত করে। মনে করা অসঙ্গত হবে না, ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ হয়েছিল বলেই ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছিল, ঢাকা যার ভ্রূণ কেন্দ্র হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিল।

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকায় মুসলিম লীগ গঠন

১৯০৬ সালে ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের একটি বড় ঘটনা ছিল ঢাকায় এই সময় ভারতের মুসলিম লীগের জন্ম। ভূস্বামী, জমিদার, নবাব ও বড় বড় মারোয়াড়ি ব্যবসায়ী মিলে এই নতুন রাজনৈতিক দলের জন্ম দেন। পরবর্তীকালে এই নিখিল ভারত মুসলিম লীগ অবিভক্ত ভারতে মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণ ও পাকিস্তান আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। রাজনৈতিক ইতিহাসের গবেষকরা মনে করতেন, এই দল গঠনে কংগ্রেসের জন্মের মতোই ব্রিটিশ-মদদ ছিল। ব্রিটিশরা মুসলিম লীগের মাধ্যমে কংগ্রেসের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে চেয়েছিল। তারা ভেবেছিল একইভাবে বাংলা-ভারতের জনগণকে হিন্দু-মুসলমানে ভাগ করে রাখা যাবে। তারা নিজেরাই হানাহানি করে মরবে, ব্রিটিশের বিরোধিতায় ছেদ পড়বে–অনেকটা এমন আকাঙ্ক্ষা থেকেই ব্রিটিশরা নেপথ্য থেকে মুসলিম লীগ গঠনে মদদ দিয়েছিল।

তবে যে চিন্তা-ভাবনা থেকেই মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হোক না কেন, পূর্ব বাংলার প্রধান প্রধান মুসলমানরা প্রায় সকলেই মুসলিম লীগে যোগদান করেছিলেন। ১৯৪৭ সালের পর আবার এসব নেতারাই– মাওলানা ভাসানী, শেখ মুজিবুর রহমান, আবুল হাশিম প্রমুখগণ ঢাকায় এসে বাঙালি মুসলমানদের জন্যে স্বতন্ত্র ভূখণ্ডের আন্দোলনের সূত্রপাত করেন।

ব্রিটিশ আমলে ঢাকা কেন্দ্রিক মুক্তিসংগ্রাম

বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসের সূচনা-প্রক্রিয়ার সঙ্গে ঢাকার রাজনৈতিক ঐতিহ্যগত কোনো যোগসূত্র নেই। বাংলার মুক্তিসংগ্রামের ধারাবাহিকতা ঢাকায় শুরু হয়েছিল নানারকম বিচ্ছিন্ন ঘটনা দিয়ে। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে কলকাতায় যখন আধুনিক বাঙালির ইতিহাসের যাত্রা শুরু হয়, ঢাকায় তখনো তা মূল ভিত্তির অঙ্কুরোগমই ঘটে নি। এই সময় প্রাশ্চাত্য প্রভাবিত শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে নতুন এবং আধুনিক ছাত্রসমাজের উদ্ভব হয় কলকাতায়। ঢাকায় তখনো আধুনিক বা পাশ্চাত্য শিক্ষার সংমিশ্রণে কোনো সক্রিয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে নি। ফলে ঢাকায় তখনো আধুনিক পাশ্চাত্য রাজনৈতিক পরিমণ্ডল গড়ে উঠবার সুযোগ না পেলেও, কলকাতায় তা শুরু হয়ে গিয়েছিল।

ঢাকার প্রথম কলেজ, 'ঢাকা কলেজ' প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৪১ সালে এবং আরেকটি প্রধান কলেজ জগন্নাথ কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় আরো পরে ১৮৮৪ সালে। অথচ ১৮৮৭ সালে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হিন্দু কলেজ

Dhaka University Institutional Repository

তৎকালীন সমগ্র বাংলার রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, পঁচিশ বছর পরে প্রতিষ্ঠিত ঢাকার কলেজটিতে তার বিশেষ কোনো ছোঁয়াও লেগেছিল বলে মনে হয় না। কিন্তু হিন্দু কলেজকে কেন্দ্র করে কলকাতার ছাত্রসমাজ গড়ে তুলেছিল বিদ্রোহী 'ইয়ং বেঙ্গল' গ্রুপ। এর প্রভাবিত ছাত্র ও যুবকের সংখ্যা যত নগণ্যই হোক, তার প্রভাবে সমগ্র কলকাতা, এমনকি সমগ্র বাংলাদেশের রক্ষণশীল সমাজেরই টনক নড়ে গিয়েছিল।

পাশাপাশি ঢাকার বাঙালি সমাজ ছিল অপেক্ষাকৃত কম নিরুত্তাপ এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে নিরুদ্বিগ্ন। এখানকার সমাজ সেই অর্থে তেমন কোনো রাজনৈতিক আন্দোলনে, এমনকি সামাজিক আন্দোলনেও তখন পর্যন্ত তেমন করে জড়িয়ে পড়েনি। এর পেছনে কি ছিল সামাজিক বা রাজনৈতিক কারণ, তার বিশদ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে না গিয়েও বলা চলে ঢাকার সমাজ উনিশ শতকের শেষ ভাগেও ছিল সমগ্র ভারত কেন, সমগ্র বাংলার সমসাময়িক ঘটনাবলি থেকেও বিচ্ছিন্ন। ১৮৩০ সালেই কলকাতার ছাত্রসমাজ অকটরলনি মনুমেন্ট থেকে ইংরেজদের জয়পতাকা নামিয়ে ফরাসি বিপ্লব স্মরণে সাম্য-মৈত্রীর পতাকা উড়িয়ে দেওয়ার মতো দুঃসাহসিক ঘটনা ঘটিয়ে ফেলেছিল। এই সময় 'একাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন' নামে ছাত্ররা একটি ছাত্র সংগঠন গড়ে তুলেছিল, এমনকি 'পার্থেনন' নামে শুধু ছাত্রদের জন্যে একটি পত্রিকাও সেই সময়টাতে বের করে ফেলেছিল তারা।

তবে এত কিছুর পরেও তৎকালীন বৃহত্তর বাংলায় সংঘটিত ব্রিটিশ-বিরোধী বিভিন্ন কৃষক আন্দোলন ও বিদ্রোহ কলকাতা বা ঢাকার কোনো এলাকার আধুনিক সমাজের সাহায্য-সহায়তা ও সমর্থনের কোনে সংবাদ পাওয়া যায় না। ১৭৫৭ সালে পলাশীতে ইংরেজদের কাছে বাংলার নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার পরাজয়ের মাত্র সাত বছরের মধ্যে সমগ্র বাংলায় শুরু হয়েছিল নানারকম বিদ্রোহ ও বিক্ষোভ। স্বন্দ্বীপ বিদ্রোহ (১৭৬৪), রংপুর বিদ্রোহ (১৭৮৩), বাকেরগঞ্জ বিদ্রোহ (১৭৯২), ফকির সন্ন্যাসী বিদ্রোহ (১৭৬৩), সিলেট বিদ্রোহ (১৭৮২), কুমিল্লার ফিরিঙ্গি খেদাও বিদ্রোহ (১৮৯৭), সমশের গাজীর ক্ষমতা দখল (১৭৬৭), ওয়াহাবী আন্দোলন (১৮৩১), তিতুমীরের বাঁশের কেল্লার সংগ্রাম (১৭২৭), নীল বিদ্রোহ(১৮৫৯) ইত্যাদি এই সময়কার প্রধান প্রধান রাজনৈতিক ঘটনা।

এমনকি ১৮৫৭ সালের ভারত তথা বাংলার প্রথম স্বাধীনতা আন্দোলন যা সিপাহী বিদ্রোহের মাধ্যমে সমগ্র দেশে সর্বগ্রাসী রূপ নিয়েছিল, তাতেও বাংলার আধুনিক শিক্ষিত সমাজের বিশেষ কোনো ভূমিকা দেখা যায় না, সে ঢাকা কিংবা কলকাতার কোনো জায়গাতেই নয়। ঢাকায় বিট্রিশ বিরুদ্ধে সিপাহীদের পক্ষে যারা যুদ্ধে নেমেছিল তারা কেরামত আলীর মতো সাধারণ মানুষ। ঢাকা শহর সিপাহীদের দমনে ঢাকার তৎকালীন 'এলিট' খাজারা (পরবর্তীকালে নবাব) ব্রিটিশদের প্রকাশ্যেই সাহায্য করেছিল। যদিও বাকল্যান্ডের ভাষায় ঃ "সব থেকে বিপদজ্জনক ছিল ঢাকা শহর, সেখানকার প্রচুর মুসলমান জনসাধারণ সরকারের প্রতি মোটেই সন্তুষ্ট ছিল না।"

Dhaka University Institutional Repository

তথাপিও মুসলমান নবাবরা ব্রিটিশ-সমর্থনে নির্লজ্জ ভূমিকা রাখে। এই সময়ও এখানে ঢাকার সাধারণ শিক্ষিত জনগণের কোনো ভূমিকার খবর পাওয়া যায় না। এর ঠিক পঞ্চাশ বছর পরে ১৯০৫ সালে যখন বঙ্গভঙ্গ নিয়ে সমগ্র বাংলা উত্তাল, তখনো দেখি, খোদ ঢাকার জগন্নাথ কলেজে প্রতিবাদসভা-আলোচনা সভা হচ্ছে, কিন্তু কলেজের ছাত্ররা সেখানে নিশ্চুপ। যদিও সভায় অংশ নিচ্ছেন ঢাকার হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত সম্মানিত নাগরিক এবং শিক্ষকবৃন্দ। কোনো বড় ধরনের ভূমিকায় সাধারণ জনগণ সেখানেও নেই, বঙ্গভঙ্গের পক্ষে বা বিপক্ষে কোনোটাতেই, নেই ঢাকার সাধারণ নাগরিক সমাজ, যদিও 'এলিট'রা আছেন। অথচ এর ৫০ বছর পূর্বে ১৮৫৭ সালে ঢাকার সাধারণ মানুষ যুদ্ধ করেছে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে, এলিটরা ছিল সেখানে নিশ্চুপ।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

নবাব সৈয়দ নবাব আলী চৌধুরীর জীবন কথা

জন্ম ও বংশ পরিচয়

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, লেখক ও বাঙ্গালী মুসলিম নবজাগরণের অন্যতম পথিকৃৎ নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম, রাষ্ট্রভাষা বাংলার প্রথম প্রস্তাবক, অবিভক্ত বাংলার প্রথম মুসলিম মন্ত্রী। তিনি বাংলাদেশের বর্তমান টাঙ্গাইল জেলার অন্তর্গত ধনবাড়ি গ্রামের প্রসিদ্ধ সৈয়দ পরিবারের সন্তান। রাজশাহী জেলার নাটোরে তাঁর নানার বাড়িতে তিনি ১৮৬৩ সনের ২৯ ডিসেম্বর[১] জন্মগ্রহণ করেন। ছোটবেলায়ই পিতা ও মাতা মৃত্যুবরণ করলে তাঁর বাল্য ও কৈশোর সেখানেই অতিবাহিত হয়। নানাবাড়ি থেকেই তিনি রাজশাহী শহরের কলেজিয়েট স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন।[২] তাঁর গৃহশিক্ষক ছিলেন কুষ্টিয়া জেলার নীলকান্ত রায়। তাঁর নিকট নওয়াব সাহেব মাতৃভাষা-বাংলা শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং তাঁর আরবীর শিক্ষক ছিলেন মাওলানা সাদ উদ্দিন। তাঁর জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে গৃহশিক্ষকদের যথেষ্ট প্রভাব পড়ে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অনুশীলনে তাঁর যে ঐকান্তিক আগ্রহ ও অনুরাগ তা অনেকটা এই শিক্ষারই সুদূরপ্রসারী ফল।[১] তিনি পরবর্তী সময়ে কলকাতার প্রসিদ্ধ সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুল ও কলেজে পড়ালেখা করেন এবং সেখান থেকে এফ. এ পাশ করেন। পিতার মৃত্যুর কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা লাভের সুযোগ তিনি পাননি ঠিকই তবে কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলের সুযোগ্য শিক্ষকগণের শিক্ষা তাঁর নৈতিক চরিত্র ও ভবিষ্যৎ জীবন গঠনে সহায়তা করে। দেশ ও জাতির কল্যাণ সাধনে তিনি সেই শিক্ষাই কাজে লাগান।[৩]

নওয়াব বাহাদুর বাল্য ও কৈশোর অতিবাহিত হওয়ার পরে যৌবনে পদার্পন করেই স্বনামধন্য নওয়াব আবদুস সুবহান চৌধুরীর জ্যেষ্ঠা কন্যা আলফাতুন্নেসার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। বিয়ের সময় তাঁর স্ত্রী ছিলেন অপ্রাপ্ত বয়স্কা।[৪] নওয়াব আলী চৌধুরী প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর ধনবাড়ির বিশাল পৈতৃক সম্পত্তির ভার গ্রহণ করেন। নাটোরে অবস্থানকালে সে সময়ের গৃহশিক্ষক নীলকান্ত রায়ের উপর ছিল তাঁর ধনবাড়ি এস্টেটের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব। নবাব সাহেব খুব শোচনীয় অবস্থায় ধনবাড়ি এস্টেটের দায়িত্ব বুঝে নেন এবং নিজ যোগ্যতাবলে তিনি এস্টেটের যথেষ্ট উন্নতি সাধন করেন।[৫]

Dhaka University Institutional Repository

ধনবাড়ি এস্টেট ও পূর্বপুরুষদের ইতিহাস

নওয়াব বাহাদুর সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরীর প্রপিতামহ সৈয়দ খোদা বখ্শ প্রায় আড়াই শ' বছর পূর্বে টাংগাইল জেলার ধনবাড়ি গ্রামে বসবাস শুরু করেন। তিনি ইমাম-ই-আযম আবু হানীফা ও শাহ্ আবদুল কাদির জীলানী (র)-এর বংশধর ছিলেন বলে ওয়াক্ফ এস্টেটের ইতিহাস থেকে জানা যায়। পরিবারের আদিপুরুষ হযরত শাহ্ আতীকুল্লাহ্ বাগদাদ থেকে ভারতে (দিল্লী) আগমন করলে দিল্লীর তৎকালীন সম্রাট তাঁর মুরীদ হন। তাঁর উত্তরসুরি দিল্লীর সম্রাট শাহ্ সুলতানের নিকট থেকে জায়গির লাভ করে পাবনা জেলার নাকালিয়া গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। স্থানটি যমুনা নদীর গ্রাসে পরিণত হলে তাঁর বংশধরগণ মানিকগঞ্জের বর্তমান হরিরামপুর উপজেলার হাসমেলানে বসতি স্থানান্তর করেন। শাহ্ খোদা বখ্শ টাঙ্গাইল জেলার বানিয়ারার অন্তর্গত মুকীমপুরের সৈয়দ বংশে বিয়ে করেন। সে সময়ে হাসমেলানের সৈয়দ পরিবারে নিজ বংশ ছাড়া অন্য বংশে বিয়ে-শাদী করার নিয়ম প্রচলিত ছিল না। সৈয়দ শাহ্ খোদা বখশ্ অন্য বংশে বিয়ে করার অপরাধে পরিবার থেকে বিতাড়িত হয়ে তাঁর শ্বশুরবাড়ি বানিয়ারায় চলে যান।[৬]

ইতিহাস থেকে জানা যায়- ধনবাড়ি গ্রামের অধিপতি ধনপদ (মতান্তরে ধনঞ্জয়) সওদাগরের নামানুসারে গ্রামটির 'ধনবাড়ি' নামকরণ হয়। সুদখোর ও অত্যাচারী ধনপদ লগ্নীর ব্যবসা করে গ্রামের শত শত লোককে ভিটেছাড়া করে। সম্রাট আকবরের নিকট পার্শ্ববর্তী সন্তোষের অধিবাসী সৈয়দ খাঁর আবেদনক্রমে মনওয়ার খাঁ ও ইসপিন্দিয়ার খাঁ-এই দুই ভাইয়ের অধিনায়কত্বে অত্যাচারী ধনপদের বিরুদ্ধে দু'শ পদাতিক সৈন্য পাঠিয়ে ধনপদকে বিতাড়িত করলে ধনবাড়ি ইসপিন্দিয়ার খাঁর হস্তগত হয়। বাংলার মাটির জাদুর স্পর্শে মোহিত হয়ে সেনাধ্যক্ষ ভ্রাতৃদ্বয় সম্রাট আকবরের নিকট ধনবাড়িতে বসতি স্থাপনের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করলে সম্রাট তাঁদের আবেদন মঞ্জুর করেন।[৭] ধনবাড়ি এস্টেটের ওয়াক্ফনামায় থেকে জানা যায়, ভ্রাতৃদ্বয়ের অন্যতম উত্তরসুরি আকবর আলী খাঁ চৌধুরী ১৭৯৩ সালে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃক ধনবাড়ির দশসালা বন্দোবস্ত পান। শাহ্ সৈয়দ খোদা বখশের কন্যা সাইয়েদা তালিবুন্নেসা খাতুন চৌধুরানীকে আকবর আলী খাঁ চৌধুরীর ওয়ারিস রাজা আলী খাঁ চৌধুরী বিয়ে করেন। নিঃসন্তান রাজা আলী খাঁ চৌধুরী পরলোকগমন করলে তাঁর স্ত্রী সাইয়েদা তালিবুন্নেসা খাতুন চৌধুরানী সম্পত্তির অধিকারী হন। তিনিও নিঃসন্তান হওয়ায় তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর পিতা শাহ্ সৈয়দ খোদা বখ্শ ধনবাড়ির সকল সম্পত্তির মালিক হন এবং তাঁর শওরালয় বানিয়ারা থেকে ধনবাড়িতে স্থায়ীভাবে চলে আসেন। শাহ্ সৈয়দ খোদা বখ্শ ধনবাড়িতে নওয়াব আলীর চৌধুরীর প্রথম পূর্বপুরুষ।[৮]

নওয়াব আলী চৌধুরীর পূর্বপুরুষগণ পীর-আউলিয়া বংশীয় ছিলেন। তাই তাঁদের বংশের কেহই

Dhaka University Institutional Repository

বিষয় সম্পত্তিতে আসক্ত ছিলেন না। তাঁদের ভরণ-পোষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ মুরীদরাই করতেন। বৈষয়িক বুদ্ধির অভাবে শাহ্ সৈয়দ খোদা বখশ্-এর নিকট থেকে বিশাল আয়তনের ধনবাড়ি এস্টেটের অধিকাংশই হাতছাড়া হয়ে যায়। তাঁর মৃত্যুর পর পুত্র সৈয়দ মুহম্মদ শাহ্ চৌধুরী ধনবাড়ি এস্টেটের দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। তিনি তৎকালীন ঢাকা জেলার মানিকগঞ্জের রাজখাড়া গ্রামের গোলাম ইয়াহিয়া সিদ্দীকীর জ্যেষ্ঠা কন্যা করীমুন্নেসা বিবিকে বিয়ে করেন। মুহম্মদ শাহ্ উঁচুস্তরের সাধক ছিলেন। পার্থিব কর্মকাণ্ডে তিনি মোটেও আগ্রহী ছিলেন না। তিনি ঢাকাস্থ আযীমপুর দায়রা শরীফের বিশিষ্ট পীর হযরত শাহ্ লকীতুল্লাহর (১৭৯০-১৮৩৬) প্রধান শিষ্য ছিলেন। নিজ পীরের প্রতি অনুরক্ত হয়ে ধনবাড়ির সমস্ত সম্পত্তি তাঁকে দান করেন। পীর সাহেব ছিলেন সংসার-বিরাগী। বিষয়-সম্পত্তির প্রতি তাঁরও কোন লোভ ছিল না। তিনি সৈয়দ মুহম্মদ শাহকে দান করা সম্পত্তি পুনঃগ্রহণ করতে অনুরোধ করলে মুহম্মদ শাহ্ রাজী না হওয়ায় পীর সাহেব সেই সম্পত্তি তাঁর শিষ্যের স্ত্রী সাইয়েদা করীমুন্নেসা চৌধুরানীকে হেবা করে দেন। পীর সাহেবকে ধনবাড়ির এস্টেট দান করার পর সৈয়দ মুহম্মদ শাহ্ ওর কোন অর্থই নিজে গ্রহণ করতেন না। ধনবাড়িতে তাঁর অন্য কিছু খামার-জমি ছিল। ঐ সম্পত্তির আয় দিয়েই তিনি অতি সাধারণভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করতেন। তাঁর স্ত্রী সাইয়েদা করীমুন্নেসা খাতুন চৌধুরানী ধনবাড়ি এস্টেট পরিচালনা করতেন। সৈয়দ মুহম্মদ শাহের একমাত্র সন্তান সৈয়দ জনাব আলী চৌধুরীই ছিলেন নওয়াব আলী চৌধুরীর পিতা। জনাব আলী চৌধুরীও সাধক প্রকৃতির হওয়ায় পিতা ও মাতার ন্যায় শিক্ষা ও ভদ্রতায় মানুষের প্রিয় ব্যাক্তি হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন।

নাটোর নিবাসী চৌধুরী মুহম্মদ আলী খাঁর কন্যা সাইয়েদা রাবেয়া খাতুনকে জনাব আলী চৌধুরী বিয়ে করেন। সৈয়দ জনাব আলীর বিবাহের কাবিন বাবদ তাঁর মা করীমুন্নেসা চৌধুরানী পুত্রের পক্ষ থেকে এই পুত্রবধু রাবেয়া খাতুনকে ধনবাড়ি এস্টেটের ১/৪ অংশ দান করেন। তাঁর গর্ভে নওয়াব আলী চৌধুরী ও সায়েরা খাতুনের জন্ম হয়। জনাব আলী চৌধুরী একমাত্র পুত্র নওয়াব আলী চৌধুরী ও কন্যা-সায়েরা খাতুনকে ছোট অবস্থায় মা ও স্ত্রীর জীবদ্দশায় রেখে মারা যান। মায়ের মৃত্যুর পর ওয়ারিস সূত্রে ঐ ১/৪ অংশের অধিকারী হন তাঁর পুত্র নওয়াব আলী চৌধুরী ও কন্যা সায়েরা খাতুন। পিতা ও মাতার মৃত্যুর পর নওয়াব আলী চৌধুরী ও তাঁর বোন-সায়েরা খাতুন দাদী সাইয়েদা করীমুন্নেসা চৌধুরানীর নিকট লালিত-পালিত হন। এঁরা দুই ভাই-বোন ইতিপূর্বেই দাদী করীমুন্নেসা থেকে ওয়ারিস সূত্রে ধনবাড়ি এস্টেটের ৩/৪ অংশের মালিক হয়েছিলেন। এমনিভাবে ধনবাড়ি এস্টেটের যোল আনাই নওয়াব আলী চৌধুরী ও সায়েরা খাতুনের অধিকারে আসে।[৯] সে মোতাবেক ধনবাড়ি এস্টটের ২/৩ অংশের অধিকারী হন নওয়াব আলী চৌধুরী এবং সায়েরা খাতুন মালিক হন বাকি ১/৩ অংশের।[১০]

পিতা, মাতা ও দাদীর মৃত্যুর পর তাঁদের মামা মৌলভী মুহম্মদ রশীদ খাঁ চৌধুরী খান বাহাদুর

Dhaka University Institutional Repository

বালক নওয়াব আলী চৌধুরী ও বোন সায়েরা খাতুনের অভিভাবক নিযুক্ত হন। মামাত ভাইয়ের সাথে সায়েরা খাতুনের বিয়ে হয়। রশীদ খাঁ চৌধুরী তাঁর পুত্রবধু সায়েরা খাতুনের নিকট থেকে ঐ ১/৩ অংশের 'ইস্তমুরারী ইজারা' নেন। নওয়াব আলী চৌধুরীর নাবালকীর সময় তাঁর সম্পত্তির আয়-ব্যয়ের দায়-দায়িত্ব ছিল তাঁর মামা রশীদ খাঁ চৌধুরীর উপর। ঐ সময় নওয়াব আলী চৌধুরী সাবালক হলে ঐ আয়ের বিনিময়ে তাঁর মামা রশীদ খাঁ চৌধুরী সায়েরা খাতুন থেকে যে সম্পত্তির 'ইস্তমুরারী মকররী মৌরসী ইজারা' নিয়েছিলেন, সেই স্বত্ব তাঁর (নওয়াব আলী চৌধুরী) নিকট বিক্রয় করেন। তদবধি নওয়াব আলী চৌধুরী ধনবাড়ি এস্টেটের ২/৩ অংশের মালিকানা স্বত্বেও ১/৩ অংশ 'ইস্তমুরারী মকররী মৌরসী ইজারা স্বত্বে ভোগ দখল করতে থাকেন। প্রকৃত প্রস্তাবে ধনবাড়ি এস্টেট ফকীরের দানসূত্রে প্রাপ্ত, যা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে–ধনবাড়ির এই এস্টেট প্রাচীন জমিদারের এস্টেট হলেও শাহ্ সৈয়দ খোদা বখশের যুগ থেকে তা বহুদিন পর্যন্ত 'ফকীরের ঘর' বলে পরিচিত ছিল। নওয়াব আলী চৌধুরীর সময় পর্যন্ত ধনবাড়ি অধিপতিগণ জমিদাররূপে ততটা সম্মানিত না হয়ে পীররূপেই সমধিক শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। দান-খয়রাত ও সৎকার্যের জন্য এ পরিবারের বিশেষ খ্যাতি ছিল।

নওয়াব আলী চৌধুরী'র বৈবাহিক ও পারিবারিক ইতিহাস

নওয়াব আলী চৌধুরী তিন বিয়ে করেন। যৌবনের শুরুতেই তিনি বগুড়া জেলার কুন্দগ্রামের জমিদার স্বনামধন্য নওয়াব আবদুস সুবহান চৌধুরীর জ্যেষ্ঠ কন্যা আলফাতুন্নেসাকে নাবালিকা অবস্থায় বিয়ে করেন। প্রথম স্ত্রীর গর্ভে তাঁর পুত্র সৈয়দ ফয়যুল বারী মুহম্মদ আলতাফ আলী চৌধুরী ও কন্যা সাইয়েদা যাহরা লতীফুন্নেসার জন্ম হয়। এই স্ত্রীর প্রথম সন্তান তথা নওয়াব আলী চৌধুরীর জ্যেষ্ঠ পুত্র নওয়াবযাদা আলতাফ আলী চৌধুরী বগুড়ার বিশিষ্ট জমিদার ছিলেন। তাঁর প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুর পর তিনি কিশোরগঞ্জের নিকটস্থ জংগলবাড়ীর (হায়বতনগর) বিখ্যাত বার ভূঞার অন্যতম ব্যক্তিত্ব ঈসা খাঁ মসনদে আলীর বংশধর সাঈদা আখতার খাতুন চৌধুরানীকে বিয়ে করেন। এই স্ত্রীর গর্ভে কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করে নি। এই স্ত্রী নওয়াব আলী চৌধুরীর মৃত্যুর পরেও জীবিত ছিলেন। বিয়ের পর থেকেই এই স্ত্রীর স্বাস্থ্য ততটা ভাল ছিল না। তাই নওয়াব আলী চৌধুরী তৃতীয় বিয়ে করেন। এবার বিয়ে করেন নওয়াব আবদুস সুবহান চৌধুরীর অন্য সংসারের কন্যা সকীনা খাতুন চৌধুরানীকে। এই গর্ভে পুত্র সৈয়দ আবুল কাসেম মুহম্মদ হাসান আলী চৌধুরী ও কন্যা সাইয়েদা উম্মে ফাতেমা হুমায়রা খাতুন জন্মগ্রহণ করে। নওয়াব আলী চৌধুরী ও তাঁর শ্বশুর নওয়াব আবদুস সুবহান চৌধুরীর জীবদ্দশাতেই মৃত্যুবরণ করেন তাঁর তৃতীয় স্ত্রী সকীনা খাতুন চৌধুরানী।[১০]

নওয়াব আলী চৌধুরীর প্রথমা স্ত্রী সাইয়েদা আলফাতুন্নেসা চৌধুরানীর মা সাইয়েদা তহূরুন্নেসা চৌধুরানী ও বাবা সৈয়দ আবদুস সুবহান চৌধুরী যথেষ্ঠ সম্পদশালী ও বড় জমিদার ছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

নওয়াব আলী চৌধুরীর প্রথমা স্ত্রীর খালা সাইয়েদা যুবায়দাতুন্নেসাও বগুড়া জেরার বিহার এস্টেটের অধিকারী ছিলেন। সাইয়েদা আলফাতুন্নেসা চৌধুরানী ছাড়া তহূরুন্নেসা চৌধুরানী ও তাঁর বোন যুবায়দাতুন্নেসা চৌধুরানীরও কোন সন্তান ছিল না। তাই তাঁরা উভয়েই নিজ নিজ এস্টেটের কতকাংশ নওয়াব আলী চৌধুরীর স্ত্রী সাইয়েদা আলফাতুন্নেসা চৌধুরানীকে হেবাসূত্রে ও অবশিষ্টাংশ ওয়াক্‌ফসূত্রে দান করেন। আলফাতুন্নেসার মৃত্যুর পর নওয়াব আলী চৌধুরীর প্রথম সংসারের একমাত্র পুত্র আলতাফ আলী চৌধুরী ও একমাত্র কন্যা উম্মে যাহরা লতীফুন্নেসা বগুড়ায় জমিদারীর মালিক হন। সেই সূত্রেই আলতাফ আলী চৌধুরী পিতৃভূমি ধনবাড়িতে না থেকে বগুড়ায় নানা বাড়ীতে স্থায়ীভাবে অবস্থান করেন। আলতাফ আলী চৌধুরী বগুড়ায় কেবল তাঁর মার দিক থেকেই নয়, নানা ও নানীর দিক থেকেও ওয়ারিসী 'হক' প্রাপ্ত হন এবং পরবর্তী সময় নানার ওয়াক্‌ফ এস্টেটের মুতাওয়াল্লী নিযুক্ত হন। তাঁর ছয় পুত্র–মুহম্মদ আলী চৌধুরী, আহমদ আলী চৌধুরী, মুহম্মদ হামেদ আলী চৌধুরী, মাহমুদ আলী চৌধুরী, আমীর আলী চৌধুরী ও ওমর আলী চৌধুরীর মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র মুহাম্মদ আলী চৌধুরীই সবচেয়ে বেশী খ্যাতি অর্জন করেন। নওয়াব আলী চৌধুরীর এ পৌত্র 'বগুড়ার মুহম্মদ আলী' বলেই পরিচিত। ইনিই আলতাফ আলী চৌধুরীর মৃত্যুর পর তাঁর বগুড়ার জমিদারীর মুতাওয়াল্লী নিযুক্ত হন।

ধর্মীয় প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে জীবনের শেষ মুহূর্তে নওয়াব আলী চৌধুরী তাঁর ধনবাড়ি এস্টেট আল্লাহর নামে ওয়াক্‌ফ করেন। তাঁর ইনতিকালের (১৭-৪-১৯২৯) পূর্বে ১৯২৯ সনের ৩ এপ্রিল ওয়াক্‌ফনামার মুসাবিদা করেন এবং ৮ এপ্রিল রেজিস্ট্রির জন্য তা রেজিস্টারের কাছে পেশ করেন। ওয়াক্‌ফনামার ভূমিকায় তিনি বলেনঃ "মানুষের জন্মের পর বাল্য, তৎপর যৌবন, তৎপর বার্ধক্য এবং সর্বশেষে মৃত্যু- এটাই প্রকৃতির নিয়ম। আমিও ক্রমে বাল্য ও যৌবন অতিক্রম করে বার্ধক্যে উপস্থিত হয়েছি। আল্লাহ তা'আলা আমাকে যে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব করে সৃজন করেছেন, শ্রেষ্ঠ নবী ও রসূল (সঃ)-এর উম্মত করেছেন, উপযুক্ত গুরু বা পীরের শিষ্য করেছেন, আমার সর্বপ্রকার আশা ও আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করেছেন এবং আশার অতিরিক্তও দান করেছেন, তার বিনিময়ে আমি কি করেছি, সেটা স্মরণ করলে হৃদয় বিদীর্ণ, মন দুঃখ-পীড়িত, চক্ষু অশ্রু-ভারাক্রান্ত হয়। কিন্তু চিন্তা ও দুঃখ করে লাভ নেই। আল্লাহ তা'আলা অশেষ করুণার আধার। আমার বিশ্বাস আছে যে, যথার্থ অনুতপ্ত হতে পারলে তাঁর অপার করুণা-বলে আমার সকল পাপ ক্ষয় হবে; আমি তাঁর অনুগ্রহ লাভে বঞ্চিত হবো না। তাঁর দরবারে উপস্থিত হওয়ার পূর্বে তাঁরই দান-আমার স্বোপার্জিত ও পৈতৃক পার্থিব বিষয়-সম্পত্তির একটা সুবন্দোবস্ত করে যাওয়াই আমার শেষ জীবনের প্রধান কর্তব্য। আমার জীবন-মরণের কর্তা সেই সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহে আমার পার্থিব কর্তব্যের শেষ মীমাংসা করতেই আমি অদ্য প্রবৃত্ত হয়েছি।"[১১]

ধনবাড়ি এস্টেট ওয়াক্‌ফ করার সময় নওয়াব আলী চৌধুরী'র দুই পুত্র, দুই কন্যা ও এক স্ত্রী জীবিত

Dhaka University Institutional Repository

ছিলেন। নওয়াবযাদা আলতাফ আলী চৌধুরী ছিলেন তাঁর প্রথম ঘরের প্রথম সন্তান ও জ্যেষ্ঠ পুত্র। নওয়াব আলী চৌধুরী তাঁর মরহুমা স্ত্রীর দিক থেকে ওয়ারিস-সূত্রে বগুড়া এস্টেটের দাবিদার ছিলেন। কিন্তু তাঁর শ্বশুর নওয়াব আবদুস সুবহান তাঁর ওয়ারিসী সূত্রে প্রাপ্ত আটিয়ার (দেলদুয়ার) নূন্যধিক ১২ হাজার টাকা মুনাফার পৈতৃক সম্পত্তি এবং তাঁর স্বঅর্জিত কলকাতার ১২ হাজার টাকার সম্পত্তি আলতাফ আলী চৌধুরীর অনুকূলে হেবা করে দিলে তিনি বগুড়া এস্টেটের দাবি ত্যাগ করেন। ফলে পরবর্তী সময় আলতাফ আলী চৌধুরী বিনাদ্বন্দ্বে বগুড়ার ষোল আনা এস্টটের মুতাওয়াল্লী নিযুক্ত হন।

বগুড়া ওয়াক্ফ এস্টেটের বাইরে কুন্দগ্রাম ও বিহারস্থিত সম্পত্তির যে হিস্যা নওয়াব আলী চৌধুরী ওয়ারিস সূত্রে পাওনাদার ছিলেন, তাও তিনি ১৯০২ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারী আলতাফ আলী চৌধুরীর নামে হেবা করে দেন। অন্য দিকে ধনবাড়ি এস্টেটের দেনা-পাওনা নিয়ে আলতাফ আলী চৌধুরীর একটি আপস রফা হয়। তদনুসারে আলতাফ আলী চৌধুরী নওয়াব আলী চৌধুরীর অবর্তমানে ধনবাড়ি এস্টেটের তিন আনা দুই গণ্ডা এক ক্রান্তি দুই দন্তি হিস্যা পাওনাদার হন। আলতাফ আলী চৌধুরীর বগুড়ায় স্থায়ীভাবে থাকার সিদ্ধান্ত হলে ধনবাড়ি এস্টেটে তাঁর প্রাপ্য অংশ বাদ রেখে ঐ এস্টেটের বাকী সবটুকু অর্থাৎ বার আনা সতর গণ্ডা তিন কড়া এক ক্রান্তি এক দন্তি অংশ নওয়াব আলী চৌধুরী তাঁর নিজের স্ত্রী সাঈদা আখতার খাতুন, দ্বিতীয় পুত্র হাসান আলী চৌধুরী, দুই কন্যা উম্মে যাহরা লতীফুন্নেসা ও উম্মে ফাতেমা হুমায়রার ভরণ-পোষণ, ধর্মকর্ম ও দান-খয়রাতের উদ্দেশ্যে সর্বস্বত্ব ত্যাগ করে আল্লাহর নামে ওয়াক্ফ এস্টেট নামে অভিহিত করেন। তিনি নিজেকে এই ওয়াক্ফ এস্টেটের প্রথম মুতাওয়াল্লী, দ্বিতীয় পুত্র হাসান আলী চৌধুরীকে দ্বিতীয় মুতাওয়াল্লী, দ্বিতীয় মুতাওয়াল্লীর জ্যেষ্ঠ পুত্রকে তৃতীয় মুতাওয়াল্লী-এমনিভাবে পর পর মুতাওয়াল্লীদের জ্যেষ্ঠ পুত্রগণকে মুতাওয়াল্লী করার কথা ওয়াক্ফনামায় উল্লেখ করেন। তাতে একথাও উল্লেখ করা হয় যে, কোন মুতাওয়াল্লীর পুত্র না থাকলে নিকটবর্তী পুরুষ বংশধরের মধ্যে যিনি বয়োজ্যেষ্ঠ হবেন, তিনিই মুতাওয়াল্লী হবেন। নওয়াব আলী চৌধুরীর পর দ্বিতীয় মুতাওয়াল্লী হন তাঁর দ্বিতীয় পুত্র হাসান আলী চৌধুরী। তাঁর কোন পুত্র-সন্তান ছিল না। একমাত্র কন্যা সাইয়েদা আশিকা আকবর। হাসান আলী চৌধুরীর পুত্র-সন্তান না থাকায় তৃতীয় মুতাওয়াল্লী হন তাঁর ভ্রাতৃস্পুত্র-বগুড়ার মুহম্মদ আলী চৌধুরীর দ্বিতীয় ভাই সৈয়দ আহমদ আলী চৌধুরী। তিনি বর্তমানে লণ্ডনে অবস্থান করছেন বলে মুতাওয়াল্লীর প্রতিনিধরূপে ধনবাড়ি এস্টেট পরিচালনা করছেন তাঁর পুত্র সৈয়দ আসফ আলী চৌধুরী।[১২]

Dhaka University Institutional Repository

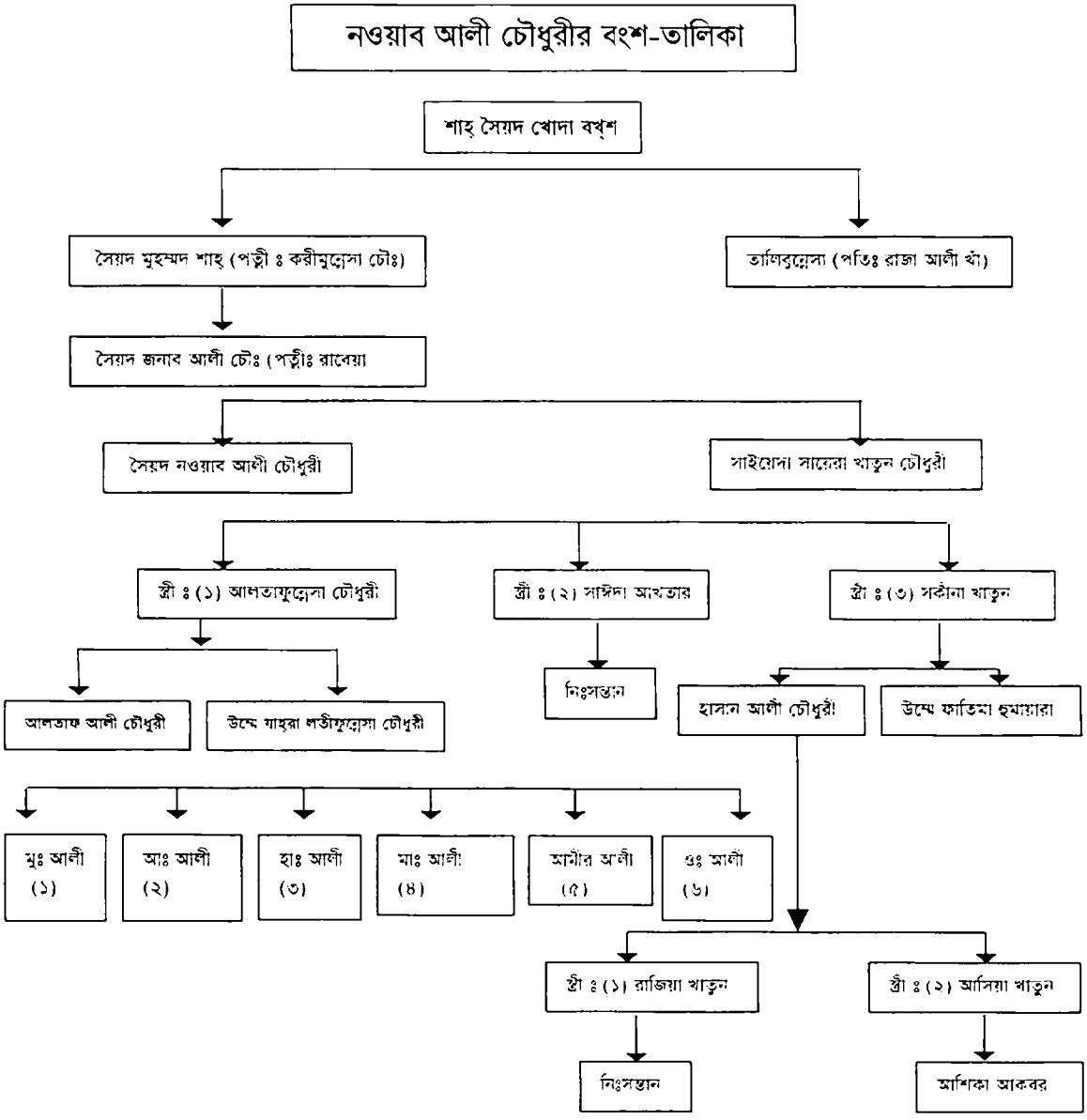

Dhaka University Institutional Repository

অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

নওয়াব আবদুস সুবহান চৌধুরী (মৃত্যু ১৯১৪)

নবাব নওয়াব আলী চৌধুরীর প্রথম স্ত্রী সাইয়েদা আলতাফুন্নেসা চৌধুরীর পিতা নওয়াব আবদুস সুবহান চৌধুরী একজন প্রভাবশালী জমিদার ছিলেন। বগুড়া ও বিহারে তাঁর জমিদারী ছিল। তিনি জমিদারী এস্টেটের ওয়াকফনামায় স্ত্রী তহূরুন্নেসাকে প্রথম মুতাওয়াল্লী, নিজেকে দ্বিতীয় মুতাওয়াল্লী, তাঁর মেয়ে আলতাফুন্নেসা চৌধুরীকে তৃতীয় মুতাওয়াল্লী ও দৌহিত্র আলতাফ আলী চৌধুরীকে চতুর্থ মুতাওয়াল্লী নিযুক্ত করেন। তিনি বগুড়া ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট বেঞ্চের অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। মুসলিম রেনেসাঁ আন্দোলনে তিনি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। ১৯১০ সালের মার্চ মাসে বগুড়ার 'পুর্ববঙ্গ ও আসাম প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতি'র তৃতীয় অধিবেশনে তিনি অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি ছিলেন। কনফারেন্সে তিনি উর্দুতে মুসলমানদের শিক্ষানীতি সম্পর্কে ভাষণ দেন। মুসলিম সভা-সমিতির সাথে জড়িত থেকে তিনি বাংলার মুসলিম জাগরণে কার্যকর ভূমিকা পালন করেন। তিনি 'সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশন' বগুড়া শাখার সভাপতি ছিলেন। বগুড়া মাদরাসা ও তাঁর স্ত্রীর নামানুসারেই বগুড়া তহূরুন্নেসা মহিলা হাসপাতালটি স্থাপন করেন। বাংলার লেফটেন্যান্ট গভর্নর উডবারন (১৮৯৯-১৯০২)-এর বগুড়া পরিশর্নের স্মৃতি রক্ষার্থে তিনি বগুড়া শহরে 'উডবারন আলতাফুন্নেসা পার্ক' নির্মাণে ৫,০০০.০০ টাকা দান করেন। তাঁর মেয়ে আলফালতুন্নেসার নামানুসারে তিনি পার্কটির নামকরন করেন। লেফটেন্যান্ট গভর্নর স্যার জন উডবারনের নামানুসারে ১৮৫৪ সালে প্রতিষ্ঠিত বগুড়ার উডবারন লাইব্রেরীটির জন্য একটি মনোরম অট্টালিকা নির্মাণ করে দেন। নওয়াব সাহেবের জনহিতকর কাজের স্বিকৃতিস্বরূপ বৃটিশ গভর্নমেন্ট ১৮৯৩ সালে তাঁকে 'নওয়াব' খেতাবে ভূষিত করেন।[১৩]

আলতাফ আলী চৌধুরী (১৮৮৭-১৯৯৪)

আলতাফ আলী চৌধুরী ছিলেন নবাব নওয়াব আলী চৌধুরীর প্রথম পুত্র। তিনি কলিকাতা মাদরাসায় শিক্ষাগ্রহণ করেন। কর্মজীবনের প্রথম দু-তিন বছর সহকারী সেটলমেন্ট অফিসার ছিলেন। ১৯০৮ সালে নোয়াখালী জেলার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত হন। বরিশালে চাকুরী অবস্থায় তাঁর স্বনামধন্য পুত্র মুহম্মদ আলী (বগুড়া) ১৯-১০-১৯০৯ তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯১৪ থেকে ১৯২৩ পর্যন্ত বগুড়া মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান এবং ১৯২৬ থেকে ১৯৩২ ও ১৯৪২ থেকে ১৯৪৩ সাল

Dhaka University Institutional Repository

পর্যন্ত বগুড়া জেলা-বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন। সি. আর. দাস গঠিত স্বরাজ্য দলের টিকেটে ময়মনসিংহ পূর্ব (মুসলমান) থেকে (১৯২৪ হতে ১৯২৬ পর্যন্ত ও ১৯২৭ সাল থেকে ১৯৩৫ পর্যন্ত) বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৩৫ সালের শাসন সংস্কারের পর তিনি কাউন্সিল অব ষ্টেট-এর সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৩৭ সালে তিনি কৃষক প্রজাপার্টিতে যোগদান করেন। ১৯৪১ সাল থেকে মৃত্যু পর্যন্ত (১৯৪৪) তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় সরকার মনোনীত সদস্য ছিলেন। ১৯৪৪ সালের ৭ই আগস্ট তিনি কলকাতায় ইন্তেকাল করেন এবং বগুড়ায় দাফন করা হয়।

তিনি ছিলেন অভিজ্ঞ পার্লামেন্টারিয়ান, দানশীল অসাম্প্রদায়িক উদার দৃষ্টিসম্পন্ন, উৎসাহী খেলোয়ার ও সমাজের নামযাদা ব্যক্তি। তিনি সম্ভ্রান্ত জমিদার বংশের একজন ধনশালী ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বে গরীব ও কৃষক শ্রেণীর প্রতি তাঁর মমত্ববোধ ছিল।[১৪]

সৈয়দ আবুল কাসেম মুহম্মদ হাসান আলী চৌধুরী (মৃত্যু ১৯৮১)

সৈয়দ আবুল কাসেম মুহম্মদ হাসান আলী চৌধুরী ছিলেন নওয়াব আলী চৌধুরী'র দ্বিতীয় পুত্র। তাঁর সম্পর্কে নওয়াব আলী চৌধুরী ধনবাড়ি ওয়াকফনামায় বলেন- "আমার দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান আবুল কাসেম মোহাম্মদ হাসান আলী চৌধুরী বুদ্ধিমান ও নামাজী। ইসলামে তাহার বিশেষ শ্রদ্ধা-ভক্তি আছে। সে সুশিক্ষা পাইয়াছে ও পাইতেছে। সে ঢাকার রিফরম্ড মাদরাসা হইতে গৌরবের সাথে স্পেশাল মেট্রিকুলেশন পরীক্ষা পাস করিয়া পরীক্ষার্থীদের মধ্যে প্রথম স্থান লাভ করেন। এই ক্ষণে আলীগড় কলেজে অধ্যয়ন করিতেছে। আমার অবর্তমানে বা আমি মুতাওয়াল্লী-পদ ত্যাগ করিলে এই দ্বিতীয় পুত্র শ্রীমান সৈয়দ আবুল কাসেম মোহাম্মদ হাসান আলী চৌধুরী আমার মুতাওয়াল্লী অর্থাৎ দ্বিতীয় মুতাওয়াল্লী হইবে।"

হাসান আলী চৌধুরী প্রথম জীবনেই 'নিখিল বঙ্গ কৃষক-প্রজা সমিতি'র সঙ্গে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন। আবুল মুনসুর আহম্মদ তাঁর সম্পর্কে বলেন- 'সৈয়দ হাসান আলীর সহিত আলাপ করিয়া একটু ঘনিষ্ট হইয়া বুঝিলাম, জমিদারের ঘরেও জমিদারি-প্রথার বিরোধী প্রজা-হিতৈষী ভাল মানুষ হওয়া সম্ভব। কোন নির্বাচনে হারেন নি আজো, আগে অল্পদিন কৃষক-প্রজা টিকেটে বিপুল ভোটাধিক্যে লোকাল বোর্ড ও ডিষ্ট্রিকট বোর্ডে নির্বাচিত হইয়াছেন এবং মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস-চেয়ারম্যান হইয়াছেন।' (আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর, পৃঃ ৮৯ ২৩১) তিনি ময়মনসিংহের অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট এবং ঢাকা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টের ট্রাষ্টী ছিলেন। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে তিনি উত্তর টাঙ্গাইল (মুসলমান) থেকে কৃষক-প্রজা পার্টির টিকেটে বঙ্গীয় ব্যবস্থপক সভার সদস্য নির্বাচিত হন এবং ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত ঐ পদে বহাল ছিলেন। ১৯৬২ সালে তিনি পূর্ববঙ্গ প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৬২-১৯৬৩ সাল পর্যন্ত তিনি শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী ছিলেন। বাংলাদেশের শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের সময়ে তিনি জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৮১ সনের ৩০ মে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।[১৫]

Dhaka University Institutional Repository

মুহম্মদ আলী চৌধুরী (১৯০৯-১৯৬৩)

মুহম্মদ আলী চৌধুরী ছিলেন নবাব বাহাদুর সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী'র দৌহিত্র। ১৯-১০-১৯০৯ তারিখে তাঁর পিতা আলতাফ আলী চৌধুরী বরিশালে ম্যাজিস্ট্রেট পদে কর্মরত থাকাকালে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি অবিভক্ত বঙ্গদেশ ও পাকিস্তানের বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ছিলেন; মুহম্মদ আলী কলিকাতার ইসলমীয়া ও প্রেসিডেন্সি কলেজে শিক্ষালাভ করেন। তিনি বগুড়া জিলাবোর্ডের চেয়ারম্যান, বঙ্গীয় জিলাবোর্ডে সমিতির সেক্রেটারী, মিউনিসিপ্যাল এ্যসোসিয়েশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট; কৃষিবোর্ড, রেশম কমিটি ও জিলা শিল্প তদন্ত কমিটির সদস্য এবং কেন্দ্রিয় সমবায় ব্যাঙ্কের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। ভারতীয় ফুটবল সমিতির কার্যনির্বাহী পরিষদ ও বঙ্গীয় হকি সমিতির সদস্য ছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কোর্টের সদস্য ছিলেন। বগুড়া জিলা মুসলীম লীগের চেয়ারম্যান (১৯৩৭-১৯৪৮), বঙ্গীয় আইন পরিষদের সদস্য (১৯৩৭ হইতে), অবিভক্ত বঙ্গের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাযিমুদ্দিনের পার্লামেন্টারি সেক্রেটারি (১৯৪৪-৪৫), বগুড়া জিলা বোর্ডের প্রেসিডেন্ট (১৯৪৫), অবিভক্ত বঙ্গের প্রধানমমন্ত্রী হুসাইন শহীদ সুহরাওয়ার্দীর অধীনে স্বাস্থ্য ও অর্থমন্ত্রী (১৯৪৬-৪৭)। পাকিস্তান গণপরিষদের সদস্য (১৯৪৭-৪৯); পুনর্নির্বাচিত (১৯৫৩)। বার্মায় পাকিস্তানের পথম রাষ্ট্রদূত (১৯৪৮), কানাডায় পাকিস্তানের হাই কমিশনার (১৯৪৯-৫২), যুক্তরাষ্ট্রে দুইবার পাক রাষ্ট্রদূত (১৯৫২-৫৩; ১৯৫৫-৫৯)। গভর্নর জেনারেল গুলাম মুহম্মদ ১৯৫৩ খ্রীঃ (এপ্রিল) কাজা নাযিমুদ্দীনকে পাকিস্তান সরকারের প্রধান মন্ত্রীর পদ হইতে বরখাস্ত করিয়া মুহম্মদ আলীকে প্রধানমন্ত্রীর পদ অর্পণ করেন (১৯৫৩-৫৫)। মুহম্মদ আলী ১৯৫৪-এর পুনর্গঠিত মন্ত্রিসভায় প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন। মুহম্মদ আলী খাজা নাযিমুদ্দীনের স্থলে মুসলিম লীগের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন (১৯৫৩)। পরবর্তী নির্বাচনে (১৯৫৪) পূর্ব বাংলায় যুক্তফন্ট মুসলিম লীগ দলকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে। তৎসত্ত্বেও কয়েক মাস পরেই মুহম্মদ আলী কেন্দ্রীয় সরকার শেরে বাংলা একে ফজলুল হকের নেতৃত্বাধীন পূর্ব বাংলার যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীত্বকে বরখাস্ত করেন। এক বৎসর পর মুহম্মদ আলীর মন্ত্রীত্বের অবসান হয় এবং তিনি দ্বিতীয়বার যুক্তরাষ্ট্রে পাক রাষ্ট্রদূত হন; পরে তিনি জাপানে পাক রাষ্ট্রদূত (১৯৫৯) হন। প্রেসিডেন্ট ফীল্ড মার্শাল আইউব খানের নতূন শাসনতন্ত্র (১৯৬২) অনুযায়ী মুহম্মদ আলী পাকিস্তান জাতীয় আইন সভার সদস্য ও পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হন (১৯৬২-৬৩)।[১৬]

Dhaka University Institutional Repository

নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী'র কর্মজীবন

নবাব নওয়াব আলী চৌধুরীর মোটামুটি কর্মজীবন খুব সংক্ষিপ্ত ভাষায় এইভাবে বলা যেতে পারেঃ ১৮৯৫ থেকে ১৯০৪ সাল পর্যন্ত তাঁর কর্মতৎপরতা ছিল প্রধানত সাহিত্য ও সংস্কৃতিকেন্দ্রিক। জীবনের এ অধ্যায়ে তিনি ময়মনসিংহের অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট, মিউনিসিপ্যাল কমিশনার ও জেলাবোর্ড-সদস্য ছিলেন। প্রত্যক্ষ রাজনীতির সাথে তিনি জড়িত হন ১৯০৫ সালে বঙ্গ-বিভাগ লগ্নে। তিনি পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন ১৯০৬ থেকে ১৯১১ সাল পর্যন্ত, বঙ্গ-প্রেসিডেন্সী ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন ১৯১২ থেকে ১৯১৬ সাল পর্যন্ত; ভারতীয় আইনসভার সদস্য ছিলেন ১৯১৬ থেকে ১৯২০ সাল পর্যন্ত, ১৯২১ সালে তিনি বঙ্গীয় আইনসভার সদস্য নির্বাচিত হন এবং ১ম রিফরম্ড্ কাউন্সিলে ১৯২১ থেকে ১৯২৩ সাল পর্যন্ত মন্ত্রীপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯২৩ সালের ডিসেম্বরে তিনি পুনরায় ২য় রিফরম্ড্ কাউন্সিলের সদস্য নির্বাচিত হন এবং ১৯২৫ সালের মার্চে মন্ত্রী নিযুক্ত হয়ে অল্প কিছুদিন ঐ পদে বহাল ছিলেন। সে বছরই (১৯২৫) তিনি বেঙ্গল একজিকিউটিভ্ কাউন্সিলের সদস্য মনোনীত হন এবং মৃত্যু পর্যন্ত সে পদে বহাল ছিলেন। এছাড়া তাঁর কর্মজীবনের অন্যান্য দিকগুলো নিম্নে আলোচনা করা হল।

নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী'র সাহিত্য, সাংবাদিকতা ও দেশসেবার বিবরণ

নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময় কাটান কলকাতায় শ্বশুরের বাসভবনে সস্ত্রীক বসবাস করতে থাকেন। পরবর্তী সময় তিনি জ্যৈষ্ঠ পুত্র আলতাফ আলী চৌধুরীর সাথে ৪নং ওল্ড বালিগঞ্জ রোডে (কলকাতা) থাকতেন। তিনি ফাতিহা-ই-দুয়ায দাহম উপলক্ষে যথারীতি মিলাদ শরীফ ও ওয়ায-মাহফিলের জন্য মাঝে মাঝে ধনবাড়ি আসতেন। তিনি ঐতিহ্যবাহী কলকাতা শহরে তৎকালীন বাংলার বিশিষ্ট রাজনীতিবীদ, চিন্তাবিদ ও কবি-সাহিত্যিকদের নিয়ে আসর জমাতেন। বাংলার মুসলমানরা তখনো রাজনীতি, সাহিত্য ও সংস্কৃতি-ক্ষেত্রে পিছিয়ে ছিল। হিন্দুরা যখন ইংরেজি শিক্ষায় সুশিক্ষিত হয়ে দেশের সর্বত্র নিজ সম্প্রদায়কে নতুন চিন্তাধারায় দীক্ষিত করছিলেন, ইংরেজী সাহিত্য ও পাশ্চাত্য ভাবধারা মন্থন করে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে নব জীবন সঞ্চার করে চলেছিলেন, তখন বাংলার মুসলমানরা বিলুপ্ত মহিমা ও গরিমার দম্ভে ছিলেন আত্মতৃপ্ত ও নিষ্ক্রিয়। উনিশ শতকের নব্বই-দশকে মুসলিম সমাজের দুর্দিনে যে ক'জন মুসলমান চিন্তাবিদ, সাংবাদিক ও বাংলা সাহিত্যিক ইসলামী চিন্তা-চেতনায় অনুপ্রাণিত হয়ে নব জাগরণ আনয়নে দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে বশিরহাট মহকুমার (২৪ পরগনা) অন্তর্গত মোহাম্মদপুরের শেখ

Dhaka University Institutional Repository

আবদুর রহিম (১৮৫৯-১৯৩১), কুমিল্লার অন্তর্গত রূপসার মুনশী রেয়াজুদ্দীন অন্যতম। ময়মনসিংহ জেলার করটিয়ার জমিদার হাফেয মাহমুদ আলী খান ও বর্ধমানের কুসুম গ্রামের জমিদার মুনশী মুহম্মদ ইব্রাহীমের অর্থানুকূল্যে শেখ আবদুর রহিম ও মুনশী রেয়াজুদ্দীন আহমদ ১৮৮৯ সালে সাপ্তাহিক 'সুধাকর' প্রকাশ করেন। সাপ্তাহিক 'সুধাকর' ও মাসিক 'মিহির' (১৮৯২) পত্রিকা দু'টিই শেখ আবদুর রহিমদের সম্পাদনায় আত্মপ্রকাশ করে। তাঁরা নওয়াব আলী চৌধুরীর ন্যায় একজন সমাজ-দরদী ও সাহিত্যানুরাগী জমিদারের সাথে পরিচিত হয়ে নিজেদের কর্মজীবনের পথ প্রশস্ত করেন। পক্ষান্তরে নওয়াব আলী চৌধুরীও এঁদের সংস্পর্শে এসে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অনুশীলন করে মুসলিম সমাজে নব জীবন সৃষ্টির সুযোগ লাভ করেন।[১৭]

শেখ আবদুর রহিমের 'সুধাকর' পত্রিকা কর্তৃপক্ষের সাথে দ্বিমত ঘটায় তিনি সম্পাদনার দায়িত্ব ছেড়ে দেন। 'মিহির' (১৮৯২-১৮৯৩) এবং 'সুধাকর' (১৮৮৯-১৮৯০) পত্রিকা দু'টিকে একত্র করে শেখ আবদুর রহিমের সম্পাদনায় ১৮৯৫ সালে সাপ্তাহিক 'মিহির ও সুধাকর' নামে পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি ১৯১০ সাল পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। এ পত্রিকার মালিক ছিলেন নওয়াব আলী চৌধুরী। তিনি জাতিসেবার উদ্দেশ্যে পত্রিকাটির জন্য একটি প্রেস কিনে দেন এবং তা কলকাতাস্থ নিজ বাসভবনের পার্শ্বে প্রথমা স্ত্রী আলফাতুন্নেসার নামানুসারে স্থাপন করেন। 'মিহির ও সুধাকর'-এর মাসিক প্রকাশনায় অর্থাভাব ঘটলে, তিনি তা পূরণ করতেন। ১৯১০ সালের ১৬ অক্টোবর ঢাকায় যে 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রাদেশিক মুসলমান কনফারেন্স' অনুষ্ঠিত হয়, তাতে 'মিহির ও সুধাকর' পত্রিকাটিকে কলকাতা থেকে অপসারণ করে পূর্ববাংলায় স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত হয়। নওয়াব আলী চৌধুরীর পৃষ্ঠপোষকতার ফলেই পত্রিকাটি ১৯১০ সাল পর্যন্ত মুসলিম জাগরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

সৈয়দ আমীর আলীর সভাপতিত্বে ১৮৯৯ সালের ২৭-৩০শে ডিসেম্বর কলকাতায় 'নিখিল ভারত মুসলমান শিক্ষা সমিতি'র ত্রয়োদশ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। লেফটেন্যান্ট গভর্নর স্যার জন উডবারনও অধিবেশনের এক বৈঠকে অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন। অধিবেশনের দ্বিতীয় দিন নওয়াব আলী চৌধুরী ভারতে মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্যাবলী পূরণের জন্য আলীগড় কলেজের উন্নতীকল্পে সহায়তা করার জন্য ভারতের ধনশালী ও জনসাধারণের নিকট যথাযথ আবেদনের প্রস্তাব সম্বলিত দীর্ঘ ভাষণে স্যার সৈয়দের শিক্ষা-আন্দোলনের তাৎপর্য এবং আলীগড় কলেজে প্রবর্তিত ধর্মীয় শিক্ষা-আন্দোলনের তাৎপর্য এবং আলীগড় কলেজে প্রবর্তিত ধর্মীয় শিক্ষা ও লোকায়ত শিক্ষার সমন্বয়ে প্রণীত শিক্ষা ব্যবস্থার উপযোগিতা বিশ্লেষণ করেন। তিনি কনফারেন্সে উপস্থিত বাংলাদেশী প্রতিনিধিদের প্রতি পরিকল্পিত আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের চাঁদা সংগ্রহের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। অধিবেশনের শেষ দিন নওয়াব আলী চৌধুরী 'বঙ্গে ভার্নাকুলার শিক্ষা' শীর্ষক প্রবন্ধের মাধ্যমে নিম্নের প্রস্তাবটি পেশ করেন।[১৮]

Dhaka University Institutional Repository

"That having regard to the special needs of the Musalmans of Bengal, this conference is of opinion that the character of training imparted to the mass through the medium of Primary Schools and Patshalas and through many of the textbooks introduced, admits of considerable improvement and reformation and begs to support the scheme of Primary Education initiated by Mr. Pedler, the Director of Public Instruction, Bengal.'[১৯] নওয়াব সাহেব তাঁর উর্দু প্রবন্ধটি ইংরেজীতে Translet করে তা 'Vernacular Education in Bengal' নাম দেন। প্রবন্ধটিতে তিনি প্রাইমারী স্কুলে পাঠ্যভূক্ত হিন্দু লেখকদের রচিত পুস্তকে মুসলিম ঐতিহ্য বিরোধী ও ইসলাম পরিপন্থী দিকগুলো তুলে ধরে এর প্রতিকারের উদ্দেশ্যে মুসলিম শিক্ষার্থীদের জন্য মুসলিম লেখক কর্তৃক ইসলামী ভাবধারা সম্মত স্বতন্ত্র পাঠ্যসূচী ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করার দাবি জানান। এতে তিনি মূল পুস্তকের বিষয়বস্তুর সমর্থনে হিন্দুরচিত বিভিন্ন পাঠ্য পুস্তক থেকে মুসলিম ঐতিহ্যবিরোধী ও ইসলামী শিক্ষার পরিপন্থী বিষয়াদির উদ্ধৃতিসমূহ পেশ করেন এবং মতামত প্রকাশের জন্য পুস্তিকাটি নওয়াব সাহেব কর্তৃক সাময়িক পত্র-পত্রিকার সম্পাদকদের কাছে পাঠানো হয়।[২০]

১৮৯৯ সালে 'নিখিল ভারত মুসলমান শিক্ষা সমিতি'র অধিবেশনের পর জন উডবারনের সভাপতিত্বে কলকাতায় 'স্যার সৈয়দ আহমদ মেমরিয়্যাল ফান্ড কমিটি' এবং বঙ্গদেশের জন্যে ঐ মেমরিয়্যাল ফান্ড কমিটির স্থায়ী একটি শাখা-কমিটি গঠিত হয়। কমিটিতে টিপু সুলতানের পৌত্র মুহম্মদ বখতিয়ার শাহকে প্রেসিডেন্ট ও নওয়াব আলী চৌধুরীকে সেক্রেটারি নিযুক্ত করা হয়।[২১]

বাংলার গভর্নর লেফটেন্যান্ট উডবারন আলীগড় কলেজের অধ্যক্ষ মিঃ মরিসনের সহযোগে ১৮৯৯ সনে মুসলমান সাহিত্যসেবীদের জন্য 'বঙ্গীয় সাহিত্য বিষয়িনী মুসলমান সমিতি' (Mohammedan Society for Vernacular Literature) নামক সমিতি গঠন করেন। নওয়াব আলী চৌধুরী ও শেখ আবদুর রহিম যথাক্রমে এ সমিতির সভাপতি ও সম্পাদক নিযুক্ত হন। প্রতিষ্ঠানটি বঙ্গীয় মুসলমান সমাজের সামনে তাদের সাহিত্য সম্পর্কিত অভাব-অভিযোগ ও ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের সাহিত্যে উদ্ব্যক্ত মুসলিম বিদ্বেষজনিত বিষয়াদি ফলাও করে বর্ণনা করে এবং ইসলামী ভাবধারাসমৃদ্ধ পাঠ্য পুস্তক সৃষ্টির আন্দোলন চালায়। নওয়াব বাহাদুর বিশেষ যোগ্যতার সাথে সমিতির কার্যাবলী পরিচালনা করেন। ফলে 'বিষাদ সিন্ধু'র স্বনামধন্য গ্রন্থকার মীর মোশাররফ হোসেন (১৮৪৭-১৯১২), 'ভাংগা প্রাণ'-এর রচয়িতা দাদ আলী, 'মিহির ও সুধাকর'-এর সম্পাদক মুনশী আবদুর রহিম প্রমুখ সাহিত্যানুশীলন ও পাঠ্য পুস্তক প্রণয়নে উদ্যোগী হন। নওয়াব সাহেবের আর্থিক সহায়তা লাভ করে এঁরা উদ্যম সহকারে মুসলিম গৌরব-গাথা অবলম্বনে সাহিত্য সৃষ্টির কর্মসূচী গ্রহণ করেন। নওয়াব বাহাদুরের চেষ্টায় ঐ সমিতি' সেন্ট্রাল টেকস্ট বুক কমিটি'র উপর

Dhaka University Institutional Repository

প্রভাব বিস্তার করলে মুসলমানদের মধ্যে মুনশী আবদুর রহমানকে গভর্নমেন্ট কর্তৃক সর্বপ্রথম ঐ কমিটির সদস্য মনোনীত করা হয়।[২৩]

'বংগীয় সাহিত্য বিষয়িনী মুসলমান সমিতি'র অতীত কার্যাবলীর পর্যালোচনা করার জন্য ১৯০৪ সালে নওয়াব সৈয়দ আমীর হোসেনের সভাপতিত্বে কলকাতায় এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় নওয়াব আলী চৌধুরী 'বঙ্গীয় মুসলিম সমাজের অতীত ও ভবিষ্যৎ' শীর্ষক রচনা প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ বাংলা প্রবন্ধের জন্য একটি স্বর্ণপদক প্রদানের ঘোষণা দেন। সভায় তিনি তাঁর বাংলা ভাষণে বঙ্গীয় মুসলমান সমাজের বিভিন্ন স্বার্থ তুলে ধরেন এবং জনসাধারণের শিক্ষার জন্য বাংলায় ধর্মীয় পুস্তক-পুস্তিকা প্রণয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

বঙ্গীয় মুসলমান শিক্ষা সমিতি

সৈয়দ আমীর আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ১৯০৩ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারী 'ক্যালকাটা মোহামেডান ইউনিয়ন'-এর বার্ষিক অধিবেশনে নিখিলি ভারত মুসলমান শিক্ষা সমিতি'র শাখা 'বঙ্গীয় মুসলমান শিক্ষা সমিতি' গঠন করা হয়। ১৯০৩ সালের ২ ও ৩ এপ্রিল নওয়াব সৈয়দ শামসুল হুদার সভাপতিত্বে বোয়ালিয়া রাজশাহীতে 'বঙ্গীয় মুসলমান শিক্ষা সমিতি'র প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। অধিবেশনে গঠিত সমিতির কার্যনির্বাহী কমিটিতে মির্যা শুজাআত আলী বেগ, মৌলবী ওয়াহেদ হুসাইন ও নওয়াব আলী চৌধুরী যথাক্রমে সভাপতি, সেক্রেটারী ও বিশেষ সদস্য নির্বাচিত হন।[২৪]

বঙ্গ-বিভাগ আন্দোলনে নেতৃত্ব

লর্ড কার্জনের বঙ্গ-বিভাগ পরিকল্পনা ১৯০৩ সালের ১০ জুলাই ভাইসরয়-কাউন্সিল কর্তৃক গৃহীত হলে প্রাদেশিক গভর্নমেন্ট ও ভারত-সচিবের নিকট উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ভারত-সচিব রিজলী কর্তৃক প্রস্তুতকৃত পরিকল্পনাটির খসড়াটি পরীক্ষা করার পর কার্জন ১৯০৩ সালের ৩ ডিসেম্বরে ভারত সরকার ও বাংলা সরকারের নিকট প্রেরণ করেন। ১৯০৪ সালের এপ্রিল ও ১৯০৫ সালের জানুয়ারীর মধ্যে ঐ পরিকল্পনাটিকে আবার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে কিছুটা রদবদল করা হয়। তৎকালীন গভর্নর অ্যাম্পট হিল ভারত সচিব রিজলীর পরামর্শ গ্রহণ করেন এবং তাঁর সময়েই বঙ্গ-বিভাগের স্কীম চূড়ান্ত রূপ লাভ করে। ১৯০৪ সালের ডিসেম্বরে লর্ড কার্জন ইংল্যাণ্ড থেকে এসে রিজলীর প্রস্তাব গ্রহণ করেন এবং ১৯০৫ সালের ৯ জুন ইণ্ডিয়া অফিস চূড়ান্ত ভাবে বঙ্গ-বিভাগ অনুমোদন করে এবং ১৯০৫ সালের ২০ জুলাই বঙ্গ-বিভাগ স্কীম জনসমক্ষে প্রকাশিত হয়।[২৫] ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর বঙ্গ বিভাগ কার্যকর হয়।

Dhaka University Institutional Repository

বঙ্গ বিভাগ কার্যকর হওয়ার দিনই বঙ্গ-বিভাগকে স্থায়ী ও দৃঢ় করার উদ্দেশ্যে মুসলিম নেতৃবৃন্দ ঢাকার নর্থব্রুক হলে নওয়াব সলীমুল্লাহর সভাপতিত্বে 'পূর্ব বঙ্গ ও আসাম প্রাদেশিক মুসলমান সমিতি' গঠন করেন। নওয়াব আলী চৌধুরী ছিলেন এ সমিতির অন্যমত সহ-সভাপতি। শায়েস্তাবাদের মীর মুআয্যম হুসাইন ও ঢাকার নওয়াব মুহম্মদ ইউসুফ ছিলেন যথাক্রমে এর সভাপতি ও সম্পাদক। এ সমিতির তরফ থেকেই নওয়াব আলী চৌধুরীকে পূর্ব বঙ্গ ও আসাম প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত করা হয়। তিনি ১৯০৬ থেকে ১৯১১ সাল পর্যন্ত ঐ ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন।[২৬]

বঙ্গ-বিভাগ-পরিকল্পনা প্রকাশিত হয়ার পর থেকেই উপমহাদেশের রাজনীতিতে আলোড়ন সৃষ্টি হয় এবং তা বাস্তবায়িত হওয়ার পর ঐ প্রতিক্রিয়া তীব্র আন্দোলনে রূপ লাভ করে। বাংলার হিন্দু জনসাধারণ বঙ্গ-বিভাগের বিরোধিতা করলেও মুসলমান জনসাধারণ তা সমর্থন করে। মুসলমান সম্প্রদায়ের দিক থেকে বঙ্গ-বিভাগ সমর্থনের আন্দোলনের সর্বোপরি নেতৃত্ব দেন ঢাকার নওয়াব সলীমুল্লাহ। এ নেতৃত্বে সলীমুল্লাহর পরেই ছির নওয়াব আলী চৌধুরীর স্থান। তিনি অকুতোভয়ে মুসলমানদের স্বার্থে বঙ্গ-বিভাগের স্বপক্ষে আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। সলীমুল্লাহ এ আন্দোলনের অগ্রভাগে থাকলেও সভা-সমিতিতে নওয়াব আলী চৌধুরীর আওয়াজ ছিল বলিষ্ঠ তাঁর যুক্তি ছিল দৃঢ়।

পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতিতে নওয়াব আলীর ভূমিকা

শিক্ষা-দীক্ষায় মুসলমানদের অনগ্রসরতা দূর করার উদ্দেশ্যে গঠিত পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতি'র সমিতির প্রথম অধিবেশন নবাব স্যার সলীমুল্লাহর সভাপতিত্বে ১৯০৬ সালের ১৪-১৫ এপ্রিল ঢাকার শাহবাগে অনুষ্ঠিত হয়। অধিবেশনে কমিটির স্থায়ী সভাপতি ও সেক্রেটারী নির্বাচিত হন যথাক্রমে নওয়াব স্যার সলীমুল্লাহ্ ও নওয়াব আলী চৌধুরী। প্রথম অধিবেশনে নওয়াব আলী চৌধুরী সেক্রেটারীরূপে ইংরেজী ভাষণে তিনি সমাগত মেহমান ডেলিগেটদের সভায় যোগদানের জন্য ধন্যবাদ দেন; গরীব কৃষক শ্রেণীর শিক্ষার্জনের ব্যয় হ্রাসের ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য বক্তব্য রাখেন ও অবৈতনিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের বিষয়টি তুলে ধরেন। তিনি 'পূর্ব ও আসাম প্রাদেশিক শিক্ষা সমিতি' গঠনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেন। অধিবেশনে গৃহীত মোট ২০টি প্রস্তাবের মধ্যে নওয়াব আলী চৌধুরীর ছিল একটি। প্রস্তাবটি ছিলঃ 'কৃষি-এলাকার প্রাইমারী স্কুলে এমন এক শিক্ষা পদ্ধতি প্রবর্তনের জন্য গভর্নমেন্টের কাছে প্রস্তাব করা উচিত, যা কৃষক শ্রেণীর সন্তান-সন্ততির বংশগত পেশার জন্য উপযোগী।' অধিবেশনে নওয়াব শামসুল হুদার প্রস্তাবে মাদরাসা শিক্ষা সংস্কারের উদ্দেশ্যে একটি কমিটি এবং কাজী মুমতাজুদ্দীন আহমদের প্রস্তাবে ইংরেজিকে বাধ্যতামূলক করে মিডল মাদরাসা স্থাপন ও মিএগ্রজীদের উদ্দেশ্যে বিশেষ প্রশিক্ষণ কোর্স প্রবর্তনের জন্য অপর একটি কমিটি গঠিত হয়। নওয়াব আলী চৌধুরী উভয় কমিটির সদস্য

Dhaka University Institutional Repository

নির্বাচিত হন। এ ছাড়া উক্ত অধিবেশনে রেভিনিউ বোর্ডের জুনিয়র সেক্রেটারী আবদুল মজীদ বার এ্যাট ল'-এর প্রস্তাবে ঢাকায় 'মোহামেডান হল' স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই হলের জন্য আনুমানিক ব্যয় নির্ধারণ করা হয়- ৩,৪৯,৩০০ টাকা। তন্মধ্যে নওয়াব সলীমুল্লাহ্ ১,৮৬,০০০ টাকা এবং নওয়াব আলী চৌধুরী ৩৫,০০০ টাকা দানের প্রতিশ্রুতি দেন। বঙ্গভঙ্গ রদের পূর্বে ১৯১১ সাল পর্যন্ত 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতি'র মোট ৪টি অধিবশন অনুষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ বার্ষিক অধিবেশনে অনুষ্ঠিত হয় যথাক্রমে ১৯০৮ (১৮ ও ১৯ এপ্রিল), ১৯১০ (২৬ ও ২৭ মার্চ) ও ১৯১১ (১৫ ও ১৬ এপ্রিল) সালে ময়মনসিংহ, বগুড়া ও রংপুরে। ঐ অধিবেশনসমূহে যথাক্রমে ২২, ২৬ ও ১৫ টি প্রস্তাব গৃহীত হয়। নওয়াব সলীমুল্লাহ যদিও এই সমিতির প্রেসিডেন্ট ছিলেন, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে নওয়াব আলী চৌধুরীই ছিলেন এর প্রাণ।[২৮]

সিমলা ডেপুটেশন

১৮৯২ সালে 'ইন্ডিয়ান কাউন্সিল এ্যাকট' পাস করার পূর্বে লর্ড রিপন ১৮৮৩ সালে 'লোক্যাল সেল্ফ গভর্নমেন্ট এ্যাক্ট' প্রণয়ন করে স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাসমূহে নির্বাচনভিত্তিক প্রতিনিধিত্বের সূত্রপাত করেন। ১৯০৬ সালের জুলাই মাসে ভারত-সচিব মর্লি পার্লামেন্টের বাজেট-বক্তৃতায় ভারতীয় নির্বাচন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ সংক্রান্ত নীতিমালা রচনার জন্য বড়লাট একটি কমিটি গঠন করেন। যুক্ত নির্বাচনের মাধ্যমে কাউন্সিল-সদস্য নিয়োগের কথা শুনে মুসলিম নেতৃবৃন্দ শংকিত হয়ে ৩৫ সদস্যবিশিষ্ট এই প্রতিনিধিদল সুলতান মুহম্মদ শাহ্ আগা খানের নের্তৃত্বে ১৯০৬ সালের ১ অক্টোবর দাবি-দাওয়া সম্বলিত একটি স্মারকলিপি নিয়ে সিমলায় বড়লাটের সঙ্গে দেখা করার কর্মসূচী গ্রহণ করেন। সভায় নওয়াব সলীমুল্লাহ ও নওয়াব আলী চৌধুরী স্মারকলিপিতে বঙ্গবিভাগের স্থায়িত্ব সম্পর্কে নিশ্চয়তাদানের প্রশ্নটি অন্তর্ভুক্ত করার জন্য জোর দাবী জানান। নওয়াব আলী চৌধুরীই পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের তরফ থেকে ঐ ডেপুটেশনে প্রতির্নিধিত্ব করেন। বড়লাটের সাথে প্রতিনিধি দলের সাক্ষাৎকারের পূর্বমুহূর্তেও নওয়াব আলী চৌধুরী বঙ্গ-বিভাগের স্থায়িত্বের প্রশ্নটি উত্থাপন করে বলেছিলেন, "এ বিষয়ে ডেলিগেটদের মধ্যে মতৈক্য রয়েছে কিনা, সে সম্পর্কে দলপতি আগা খানের নিশ্চিত হওয়া উচিত, তা না হলে যেন প্রশ্নটি উত্থাপন হলে বড়লাট মিন্টো বা গভর্নমেন্টের অন্য কোন সদস্যকে সে বিষয়ে সঠিকভাবে অবহিত করতে পারেন।"[২৯]

Dhaka University Institutional Repository

ভারতীয় মুসলমান শিক্ষা সমিতির ঢাকা অধিবেশন ও মুসলীম লীগ গঠন

নবাব সলীমুল্লাহ সর্বভারতীয় কংগ্রেস-পরিচালিত বঙ্গবিরোধী আন্দোলনের মোকাবেলা করার উদ্দেশ্যে ১৯০৬ সালের নভেম্বরে 'মুসলিম অল-ইন্ডিয়া কনফেডারেন্সি' নামক একটি সর্বভারতীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠনের গঠনের স্কীম প্রচার করেন। ১৯০৬ সালের ২৭-২৯ ডিসেম্বর ঢাকার শাহবাগে তাঁর অনুরোধে বিচারপতি শরফুদ্দীনের সভাপতিত্বে 'সর্বভারতীয় মুসলমান শিক্ষা সমিতি'র বিশতম অধিবেশন শেষে ৩০ ডিসেম্বর একই স্থানে নবাব ওকারুল মুলকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় মুসলিম নেতৃবৃন্দের এক রাজনৈতিক সভায় নওয়াব সলীমুল্লাহর 'মুসলিম অল-ইণ্ডিয়া কনফেডারেন্সি'র উপর ভিত্তি করে 'অল-ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ' গঠিত হয়। 'সর্বভারতীয় মুসলমান শিক্ষা সমিতি'র ঢাকা-অধিবেশনের এই আয়োজনে এবং অধিবেশন শেষে 'সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ'-এর সুদূরপ্রসারী ভিত্তি স্থাপনের পেছনে বঙ্গীয় নেতাদের মধ্যে সলীমুল্লাহর পর নওয়াব আলী চৌধুরীর ভূমিকাই ছিল বেশি ক্রিয়াশীল। তিনি ছিলেন একাধারে 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতি'র সেক্রেটারী এবং ঢাকায় অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় শিক্ষা সমিতির অভ্যর্থনা কমিটির সেক্রেটারী। এ অধিবেশনের আয়োজনে তিনি যথাসাধ্য সলীমুল্লাহকে সহায়তা করেন। তাঁর এ আন্তরিক প্রচেষ্টার প্রশংসা করে কেন্দ্রীয় শিক্ষা সমিতির সেন্ট্রাল স্ট্যান্ডিং কমিটি'র জয়েন্ট সেক্রেটারী ব্যারিস্টার আফতাব আহমদ এ অধিবেশনের রিপোর্টে বলেনঃ 'অনারেবল খান বাহাদুর সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরীর এই সকল আন্তরিক প্রচেষ্টা খুব শীগগিরই ফলবান হবে। এই বিশ্বাস ও আশা নিয়ে সকলেই এ মর্মে দোয়া করছেন যে, ঢাকার নওয়াব বাহাদুর ও চৌধুরী সাহেবের মত দরদী জমিদার আমাদের সমাজে দীর্ঘজীবী ও নিরাপদ হউন।[৩০]

১৯০৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর যে 'নিখিল ভারত মুসলিম লীগ' প্রতিষ্ঠা লাভ করে, তার গঠনতন্ত্র রচনার জন্য ঢাকা-অধিবেশনেই একটি প্রভিশন্যাল কমিটি গঠিত হয়। পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ থেকে সেই কমিটির সদস্য ছিলেন ঢাকার নওয়াব সলীমুল্লাহ, ময়মনসিংহের সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী ও বরিশালের মৌলভী হেমায়েত উদ্দীন।[৩১] ১৯০৭ সালের ২৯-৩০ ডিসেম্বর করাচীতে 'অল-ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ'-এর প্রথম বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। তাতে পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ থেকে মাত্র একজন প্রতিনিধি-নওয়াব আলী চৌধুরী প্রতিনিধিত্ব করেন।[৩২]

ফিমেল এডুকেশন কমিটি

স্ত্রীশিক্ষার উন্নতিকল্পে পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ সরকার কর্তৃক রবার্ট ন্যাথানের নেতৃত্বে ১৯০৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে 'ফিমেল এডুকেশন কমিটি' গঠন করা হয়। ১৯০৮ সালের ১৮ ও ১৯

Dhaka University Institutional Repository

এপ্রিল ময়মনসিংহে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতির দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনের প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে এ কমিটি গঠিত হয়। কমিটিতে নওয়াব সলীমুল্লাহ ও নওয়াব আলী চৌধুরীসহ কতিপয় খ্যাতনামা ও বিদ্যোৎসাহী ইংরেজ, হিন্দু ও মুসলমান সদস্য নিযুক্ত হন। কমিটির প্রস্তাবসমূহ প্রাদেশিক সরকারের মাধ্যমে ভারত গভর্নমেন্টের নিকট পেশ করা হলে গভর্নমেন্ট প্রস্তাবগুলো গ্রহণ করে। কমিটির অধীনে ঐ বছরই 'সাব-কমিটি ফর মোহামেডান ফিমেল এডুকেশন' গঠিত হয়। এই সাব কমিটির প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারী ছিলেন যথাক্রমে নওয়াব খাজা সলীমুল্লাহ ও খান বাহাদুর নওয়াব আলী চৌধুরী। কমিটি ১৯১১ সাল পর্যন্ত কার্যকর থাকে। এ কমিটির চেষ্টায় স্ত্রীশিক্ষার প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। ১৯০৮-১২ সালের কুইনকুইনাল রিপোর্টে জনশিক্ষা পরিচালক তা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করেন। মুসলমান সমাজে কিভাবে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার লাভ করতে পারে এবং এর পাঠ্যপুস্তকই বা কিরূপ হওয়া উচিত–এ সব বিষয় বিবেচনার জন্য উক্ত মুসলমান সাব-কমিটি নিযুক্ত করা হয়। সাব-কমিটির সমষ্টিগত রিপোর্ট ছাড়াও নওয়াব আলী চৌধুরী স্বতন্ত্রভাবে 'ফীমেল এডুকেশন কমিটি'র বিবেচনার জন্য কতগুলো মন্তব্য উপস্থাপন করেন। এই সাব-কমিটি শহরস্থ বালিকা বিদ্যালয়গুলোর সুবন্দোবস্ত, মধ্য বাংলা, মধ্য ইংরেজী স্কুল প্রভৃতির শিক্ষয়িত্রীর সংখ্যা ও তাদের বেতনের হার নির্ধারণ ইত্যাদি বিষয়ের নিরিখে মন্তব্য স্থির করেন।[৩৩]

অল-ইন্ডিয়া মুসলিম লীগে

১৯০৮ সালের ১৮-১৯ মার্চ আলীগড়ে অনুষ্ঠিত 'অল-ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ'-এর সভায় গঠিত 'সেন্ট্রাল কমিটি'-তে পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ থেকে নওয়াব সলীমুল্লাহ্, খান বাহাদুর নওয়াব আলী চৌধুরী, মৌলভী আবদুল মজীদ ও সৈয়দ মুহম্মদ হুসাইন নির্বাচিত হন। ১৯১০ সালের ৩০ জানুয়ারী 'মুসলিম লীগ'-এর দিল্লী-অধিবেশনে (তৃতীয়) লীগের গঠনতন্ত্র সংস্কার করা হয়। ঐ অধিবেশনে পূর্ববঙ্গ থেকে নওয়াব সলীমুল্লাহ্ ও নওয়াব আলী চৌধুরীকে পরবর্তী দুই বছরের (১৯১০-১১) জন্য ভাইস-প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করা হয়। ১৯১১-১২, ১৯১২-১৩ ও ১৯১৩-১৪ সালের 'মুসলিম লীগ'-এর কার্যনির্বাহী কমিটির তালিকায়ও অন্যতম ভাইস-প্রেসিডেন্ট হিসেবে বঙ্গদেশ থেকে কেবল নবাব সলীমুল্লাহ্ ও নওয়াব আলী চৌধুরী নির্বাচিত হন।[৩৪]

প্রাদেশিক মুসলিম লীগে

১৯০৮ সালে ঢাকায় 'নিখিল ভারত মুসলিম লীগ'-এর অধীনে অস্থায়ীভাবে 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রাদেশিক মুসলিম লীগ' গঠিত হয়। নওয়াব আলী চৌধুরী যদিও গোড়ার দিকে প্রাদেশিক লীগ-এর কার্যনির্বাহী কমিটিতে ছিলেন না; তথাপি কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে তিনি নবগঠিত প্রদেশের স্থানে স্থানে

Dhaka University Institutional Repository

'কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগ'-এর শাখাসমূহ প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁরা ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজশাহী বিভাগের বিভিন্ন স্থান ভ্রমণ করে জনসভায় বক্তৃতা করেন এবং 'মুসলিম লীগ' পুনর্গঠিত হয় এবং নওয়াব সলীমুল্লাহ্ ও নওয়াব আলী চৌধুরীকে যথাক্রমে এর প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারী নিযুক্ত করা হয়।[১] এ সময় থেকেই নওয়াব আলী চৌধুরী 'প্রাদেশিক মুসলিম লীগ'-এর কার্যনির্বাহী কমিটির সাথে সরাসরি জড়িত হন। বঙ্গ-বিভাগ রদের পর পূর্ববঙ্গসহ বঙ্গ প্রেসিডেন্সী গঠিত হয়। ১৯১২ সালের ২ মার্চ সলীমুল্লাহর সভাপতিত্বে কলকাতায় অনুষ্ঠিত সভায় মুসলিম লীগকে একীভূত করা হয়। 'বঙ্গ প্রেসিডেন্সী মুসলিম লীগ'-এর সভাপতি নিযুক্ত হন নবাব সলীমুল্লাহ্ এবং যুগ্ম-সম্পাদক নির্বাচিত হন নওয়াব আলী চৌধুরী ও যাহ্হাদের রহীম যাহিদ সহরাওয়ার্দী।[৩৫]

নওয়াব সলীমুল্লাহর মৃত্যুর (জানুয়ারি, ১৯১৫) পর 'বেঙ্গল প্রেসিডেন্সী মুসলিম লীগ'-এর প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারী নির্বাচিত হন নওয়াব আলী চৌধুরী ও এ.কে. ফজলুল হক। নওয়াব আলী চৌধুরী, সৈয়দ আমীর আলী প্রতিষ্ঠিত (মে ১৯০৮) 'লন্ডন মুসলিম লীগ'এর এক্সট্রা-অর্ডিনারী ভাইস-প্রেসিডেন্ট ছিলেন। ১৯১০-১৩ সালের 'লন্ডন লীগ'-এর তালিকায় সভাপতিরূপে রাইট অনারেবল সৈয়দ আমীর আলীর নাম এবং এক্সট্রা অর্ডিনারী ভাইস প্রেসিডেন্টরূপে ঢাকার নওয়াব বাহাদুর খাজা সলীমুল্লাহ্, মাহমুদাবাদের অনারেবল রাজা মুহম্মদ আলী মুহম্মদ খান বাহাদুর ও ধনবাড়ির অনারেবল নওয়াব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরীর নাম উল্লেখ করা হয়। নওয়াব আলী চৌধুরী 'কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগ' এর গঠনে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন।

অল-ইণ্ডিয়া মুসলিম লীগ-এর বিভিন্ন অধিবেশনে ভূমিকা

মুসলিম লীগের অন্যতম কর্ণধার নওয়াব আলী চৌধুরী প্রধানত বঙ্গবিভাগের স্থায়িত্বের লক্ষ্যেই সর্বভারতীয় রাজনৈতিক দল গঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। কংগ্রেসী নেতা রাসবিহারী ঘোষ যখন বঙ্গবিভাগের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠেন এবং মাদ্রাজ কংগ্রেসের অধিবেশনে বঙ্গবিভাগের বিরুদ্ধে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়, তখন নওয়াব আলী চৌধুরী নিশ্চুপ থাকেননি। ১৯০৮ সালের ৩০-৩১ ডিসেম্বর অমৃতসরে অনুষ্ঠিত 'মুসলিম লীগ'-এর দ্বিতীয় অধিবেশনে তিনি বঙ্গবিভাগের স্বপক্ষে জোরালো ভাষায় একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং এ ব্যাপারে জনগণ ও গভর্নমেন্টকে মুসলিম জাতির মনোভাব সম্পর্কে অবহিত করার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখা করেন। তাঁর প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। প্রস্তাবটি উত্থাপন করার সময় প্রদত্ত ভাষণে ব্যাঙ্গাত্মক ভাষায় কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের বঙ্গবিভাগ-বিরোধী যুক্তিসমূহ খণ্ডন করার প্রয়াস পান। তিনি গভর্নমেন্টকে এ মর্মে হুঁশিয়ার করে দেন যে, বঙ্গবিভাগ যদি ভ্রমাত্মক হয়ে থাকে, তবে তা রহিত করা বা তাতে রদ-বদল করা হবে চরম ভ্রমাত্মক পদক্ষেপ। তাঁর ভাষায় বলতে গেলেঃ If the partition was a blunder, a greater and graver blunder would be to withdraw or modify it. কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ বঙ্গবিভাগ রদের যুক্তি হিসেবে জাতীয় ঐক্য ও জাতীয় সংহতি বিনাশের দোহাই

Dhaka University Institutional Repository

দিতেন। চৌধুরী সাহেব বিভিন্ন যুক্তি দিয়ে তা খণ্ডন করেন এবং পরিশেষে ঐ অধিবেশনে বলেনঃ The cry of nationalism is a false and unfounded cry; for what is really in danger is not nationalism, but the spirit of exclusive and privilege of monopoly.[৩৬] তিনি সিমলায় প্রদত্ত মিন্টোর আশ্বাস বাণী বাস্তবায়িত করা এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক গুরুত্বের নিরিখে স্বতন্ত্র নির্বাচনের ভিত্তিতে ব্যবস্থাপক পরিষদ, পৌরসভা, জেলাবোর্ড ও লোক্যাল বোর্ডসমূহে মুসলমান প্রতিনিধি প্রেরণের ব্যবস্থার জন্য দাবি জানান।[৩৭]

১৯১০ সালের ২৯-৩০ জানুয়ারী দিল্লীতে অনুষ্ঠিত 'মুসলিম লীগ'-এর তৃতীয় অধিবেশনে স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাসমূহে (Self Governing Bodies) পৃথক নির্বাচনের মাধ্যমে প্রতিনিধি নিয়োগের নীতি বাস্তবায়িত করার মৌলভী রফীউদ্দীনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। নওয়াব আলী চৌধুরী ঐ প্রস্তাব সমর্থন করে যে ভাষণ দেন, তাতে তিনি সিমলা ডেপুটেশনে প্রদত্ত বড়লাট মিন্টোর অঙ্গীকার অনুসারে জেলাবোর্ড, পৌরসভা ও লোক্যাল বোর্ডসমূহে পৃথক নির্বাচনের ভিত্তিতে প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য জোরালো দাবি পুনর্ব্যক্ত করে বলেনঃ ভারতের হিন্দুরা শিক্ষা দীক্ষায় যথেষ্ট অগ্রসর হচ্ছে; হিন্দুদের তুলনায় তারা শিক্ষায় পঞ্চাদপদ হলেও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাসমূহে প্রতিনিধিত্ব করার মত যোগ্যতা তাদের নিশ্চয়ই রয়েছে।[৩৮]

দিল্লীর দরবারে সম্রাট পঞ্চম জর্জ কর্তৃক ১৯১১ সালের ১২ ডিসেম্বর বঙ্গভঙ্গ-রদ হলে পূর্ববঙ্গের অধিবাসীরা দুঃখিত ও বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। তাদের এ অসন্তোষ লাঘব করার জন্য বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ ১৯১২ সালের ৩১ জানুয়ারী ঢাকায় ১৯ সদস্য বিশিষ্ট একদল মুসলিম প্রতিনিধিকে সাক্ষাৎ প্রদান করেন। প্রতিনিধিদলে নওয়াব আলী চৌধুরীও ছিলেন। ১৯১২ সালের ৩ ফেব্রুয়ারীর 'কমরেড' পত্রিকায় বলা হয়, প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব করেন নওয়াব সলীমুল্লাহ্। ১৯৩৪ সালের 'মুসলিম এডুকেশন এডভাইজরি কমিটি'র রিপোর্টে (পৃঃ ৭৭) বলা হয় প্রতিনিধি দল গঠন করেন নওয়াব সলীমুল্লাহ্ এবং দলের মুখপাত্র ছিলেন নওয়াব আলী চৌধুরী। চৌধুরী সাহেব দাবি করতেন যে, তিনিই প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন।[৩৯]

১৯১২ সালের ৩ ও ৪ মার্চ কলকাতায় নওয়াব সলীমুল্লাহ্ বাহাদুরের সভাপতিত্বে মুসলিম লীগের ৫ম অধিবেশনে নওয়াব আলী চৌধুরীর তিনটি প্রস্তাব গৃহীত হয়ঃ (১) উচ্চ শিক্ষায় পূর্ববাংলা ও আসামের অধিবাসীদের আপেক্ষিক পশ্চাদপদতার নিরিখে 'অল-ইণ্ডিয়া মুসলিম লীগ' ঢাকায় একটি শিক্ষাদায়ক ও আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাবকে আন্তরিকভাবে স্বাগত জানায় এবং ঢাকা, রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বিভাগের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রশাসনিক কর্তৃত্ব; পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ ও পাঠ্যসূচী প্রণয়নের দায়িত্ব এই বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে ন্যস্ত করার উপর গুরুত্ব আরোপ করছে। (২) পূর্ববাংলায় একজন বিশেষ শিক্ষা-অফিসার নিয়োগের যে প্রস্তাব রয়েছে, 'মুসলিম লীগ' তা আন্ত

Dhaka University Institutional Repository

রিকভাবে সমর্থন করছে এবং সেই অফিসারকে কলকাতাস্থ জনশিক্ষা পরিচালকের প্রভাব থেকে মুক্ত রেখে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে কাজ করার অধিকার দেওয়া এবং তাঁর হাতে যথোপযুক্ত তহবিল ন্যস্ত করার উপর গুরুত্ব আরোপ করছে। (৩) সাম্প্রতিক বছরসমূহে পূর্ববাংলা ও আসামের মুসলমানরা শিক্ষাক্ষেত্রে যে উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধন করেছে, সেই অগ্রগতির সুযোগ-সুবিধা আরো সক্রিয়ভাবে অব্যাহত রাখা।[৪০]

নওয়াব আলী চৌধুরী প্রস্তাবগুলো উত্থাপন কালে যে ভাষণ দেন, তাতে তিনি প্রস্তাবিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে আনীত কংগ্রেসী নেতাদের ভিত্তিহীন যুক্তিগুলো খণ্ডন করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে বঙ্গদেশ অভ্যন্তরীণভাবে বিভক্ত (Internal partition) হবে বা বাংলা ভাষা দ্বিখণ্ডিত হবে বলে হিন্দু নেতাগণ যে সব অজুহাত প্রদর্শন করতেন, সেগুলো তিনি যুক্তিযুক্তভাবে নাকচ করে দেন। এরপর তিনি পূর্ববাংলার সন্তোষজনক শিক্ষা পরিস্থিতির ব্যাখ্যা দিয়ে ঢাকায় একটি পরীক্ষা পরিষদ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা প্রমাণের প্রয়াস পান। তিনি বলেনঃ If the proposed new university at Dacca is not equipped with every opportunity to undertake entire charge of the High Schools and Colleges of East Bengal, it is my decided opinion that the new university will not produce that effect for which it is being intended.

১৯১৩ সালের ডিসেম্বরে আগ্রায় অনুষ্ঠিত 'মুসলিম লীগ'-এর সপ্তম অধিবেশনে ভারতের উপাসনালয় ও পবিত্র স্থানসমূহ সংরক্ষণের জন্য আইনানুগ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার বিষয়ে নওয়াব আলী চৌধুরীর একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।[৪১]

১৯১৬ সালের ৩০-৩১ ডিসেম্বর লখনৌতে অনুষ্ঠিত 'মুসলিম লীগ'-এর নবম অধিবেশনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশু প্রতিষ্ঠার জন্য 'মুসলিম লীগ' গভর্নমেন্টের কাছে জোর দাবি উত্থাপন করতে গিয়ে নওয়াব আলী চৌধুরী বলেনঃ লর্ড হার্ডিঞ্জ মুসলমানদের বঙ্গভঙ্গ জনিত দুঃখ লাঘব করার উদ্দেশ্যে এবং শিক্ষা-দীক্ষায় পূর্ববঙ্গের বিশেষ উন্নতি সাধনের লক্ষ্যে ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব করেছিলেন (১৯১২)। পাঁচ বছর কেটে গেল; যুদ্ধ ও আর্থিক সংকটের মধ্যেও পাটনায় হাইকোর্ট ও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা সম্ভব হলো! সদ্য প্রবর্তিত নিউস্কীম মাদরাসার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেনঃ এই শিক্ষা ব্যবস্থার ফলে পার্থিব ও ধর্মীয়–উভয় শিক্ষার সমন্বয় সাধিত হয়েছে; এ স্কীমের অধীনে ১৯১৯ সালে প্রথম পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যথাসময় প্রতিষ্ঠিত না হলে এ স্কীমের শিক্ষার্থীদের উচ্চতর শিক্ষালাভের আর কোন পথ থাকবে না। কারণ একমাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েই 'ইসলামিক স্টাডিজ' নামক বিশেষ একটি কলা অনুষদ খোলার কথা।[৪২]

Dhaka University Institutional Repository

লখনৌ-চুক্তি ও মুসলিম লীগ ত্যাগ

কায়েদ-ই-আযম মুহম্মদ আলী জিন্নাহ ও এ.কে. ফজলুল হকের নেতৃত্বে কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে সমঝোতা হওয়ার পর ১৯১৬ সালের ডিসেম্বরে ইতিহাস খ্যাত 'লখনৌ চুক্তি' সম্পাদিত হয়। এ চুক্তি উপমহাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ঘটনা। ১৯১৫ থেকে ১৯২১-এই সাত বছর একই সময় ও একই স্থানে লীগ ও কংগ্রেসের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। লখনৌ চুক্তিতে কংগ্রেস মুসলিম লীগকে মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধিত্বমূলক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান বলে স্বীকার করে নেয়। কংগ্রেস মুসলিম লীগের স্বতন্ত্র নির্বাচনের দাবিও মেনে নেয়। ঐ চুক্তিতে সিদ্ধান্ত হয় যে, কেন্দ্রীয় কাউন্সিলে নির্বাচিত সদস্যদের মধ্যে মুসলমান সদস্য-সংখ্যা হবে এক-তৃতীয়াংশ এবং পাঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ, বাংলা, বিহার, মধ্যপ্রবেশ, মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রদেশে মুসলমান সদস্যসংখ্যা হবে যথাক্রমে ৫০, ৩০, ৪০, ২৫, ১৫, ও ৩৩। বাংলার আইন-সভায় মুসলমান প্রতিনিধির সংখ্যা অমুসলিম আসনের তুলনায় কম হবে এবং তারা কার্যত মন্ত্রীত্ব ও প্রশাসন-ক্ষেত্রে সংখ্যালঘুতে পরিণত হবে এটা মুসলমানদের স্বার্থের অতন্দ্র প্রহরী নওয়াব আলী চৌধুরীর নিকট অসহনীয় ছিল। মুসলিম লীগ সম্পাদিত লখনৌ চুক্তির প্রতিবাদে ১৯১৭ সালে তিনি 'বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি মুসলিম লীগ'-এর সভাপতির পদ থেকে ইস্তফা দেন। ১৯১৮ সালের আগস্টে 'সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশন'-এর সভাপতি নির্বাচিত হয়ে বাংলার মুসলিম স্বার্থের জন্য আন্দোলন আরম্ভ করেন।[৪৩]

পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রাদেশিক আইন সভায়

১৯০৬-১২ সাল পর্যন্ত নওয়াব আলী চৌধুরী পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রাদেশিক আইন সভার সদস্য হিসেবে পূর্ণ আন্তরিকতা সহকারে নিজেদের গড়া নতুন প্রদেশের স্বার্থ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতেন এবং ব্যবস্থাপক সভার বিভিন্ন আলোচনায় সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। অন্যান্য সভা-সমিতির ন্যায় ব্যবস্থাপক কাউন্সিলেও তাঁর বক্তব্যের প্রধান সুর ছিল মুসলমানদের শিক্ষাদীক্ষার উন্নতি সাধন, স্ত্রী-শিক্ষার প্রসার, ছাত্রবৃত্তির পরিমাণ বৃদ্ধি, ছাত্র-ভর্তি ও ছাত্রদের আবাসিক সমস্যার সমাধান, অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন, গ্রামীণ প্রাইমারী স্কুলের জন্য কৃষক-সন্তানদের উপযোগী পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, মাদরাসা শিক্ষার সংস্কার, কৃষির উৎকর্ষ সাধন, কো-অপারেটিভ সোসাইটি ও কো-অপারেটিভ ব্যাংক স্থাপন, কৃষিঋণ সরবরাহ, পশুপালন, জনস্বাস্থ্য রক্ষার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ, পানীয় জলের জন্য নলকূপ স্থাপন, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, প্রাদেশিক রাজধানী ঢাকায় অট্টালিকা নির্মাণ পূর্বক তার হৃত গৌরব উদ্ধার, শহরের পরিচ্ছন্নতা, নিজ সম্প্রদায়ের আইনসভা, পৌরসভা, জেলাবোর্ড ও লোক্যাল বোর্ডসমূহে মুসলমানদের প্রতিনিধি প্রেরণ ইত্যাদি।

Dhaka University Institutional Repository

নওয়াব আলী চৌধুরী ১৯০৮ সালের মে মাসের বাজেট-বক্তৃতার সময় শিক্ষাখাতে পূর্বের চাইতে অধিক অর্থ বরাদ্দ করার জন্য গভর্নমেন্টের প্রশংসা করেন: স্ত্রীশিক্ষার প্রতি গভর্নমেন্টের সুদৃষ্টি লক্ষ্য করে তিনি আনন্দ প্রকাশ করেন। তিনি আশা ব্যক্ত করেন যে, স্ত্রীশিক্ষার মত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে সরকার অবশ্যই যথাসাধ্য জনমত সৃষ্টি করবেন এবং এ বিষয়ে দেশবাসীর সহযোগিতা লাভ করবেন। তবে এ জনমত সৃষ্টির সময় সমাজে প্রচলিত রীতিনীতির প্রতিও সরকারকে অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে। তিনি ভাবতেন, স্ত্রীশিক্ষার মধ্যে ভারতীয়দের উন্নতির সম্ভাবনা নিহিত রয়েছে। কৃষকদের অবাধ কৃষিঋণ দেয়া হচ্ছে দেখেও তিনি আনন্দ অনুভব করেন। তিনি কর্তৃপক্ষের কাছে এই আবেদন করেন যে, প্রকৃত দরিদ্র কৃষকদেরকেই যেন ঐ ঋণ দেয়া হয়।[৪৪]

১৯০৯-১০ সালের বাজেট বক্তৃতায় তিনি বলেন, সরকারের কর্তব্য হলো জনস্বাস্থ্য রক্ষা করা ও জনশিক্ষার প্রতি লক্ষ্য রাখা। কারণ শারীরিক সুখে বেঁচে থাকার জন্য প্রথমটি আবশ্যক এবং মানসিক সুস্থতার জন্য দ্বিতীয়টি প্রয়োজন। এই ভাষণে তিনি ফ্রী-প্রাইমারী শিক্ষা প্রবর্তন এবং গ্রামীণ প্রাইমারী স্কুলে কৃষি কার্যের বাস্তব শিক্ষাদানের জন্য কৃষিভিত্তিক পাঠ্যসূচী প্রণয়ন, স্কুলের সঙ্গে কৃষি-খামার স্থাপন এবং কৃষক-সন্তানদেরকে তাদের পিতৃপেশায় ধরে রাখার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। ১৯০৯ সালের জানুয়ারীতে মাদরাসা সংস্কার কমিটির যে বৈঠক হয় এবং তাতে যেসব সুপারিশ করা হয়, তা বাস্তবায়িত করার জন্য তিনি ঐ ভাষণে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। আসাম উপত্যকা অঞ্চলে যেসব কৃষক বসতি স্থাপন করে অনাবাদী জমিকে চাষাবাদযোগ্য করার চেষ্টা করছিল, তাদের আর্থিক সাহায্য প্রদানের জন্য তিনি সরকারের প্রতি আবেদন করেন। কংগ্রেসী স্বদেশী আন্দোলন-বেশে পূর্ববঙ্গে যে বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা সৃষ্টি করে চলেছিলেন, তা নিরসনে পূর্ণশক্তি নিয়োজিত করে জনসাধারণের জান-মাল ও মান-ইজ্জত রক্ষা করার জন্য তিনি সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

১৯০৯ সালে ভারত সরকার তাঁর শাসনতান্ত্রিক আইনে (Constitutional Act) ধর্মভিত্তিক পৃথক নির্বাচন মেনে নেন এবং তদনুসারে ১৯১০ সালের প্রথম দিকে ব্যবস্থাপক কাউন্সিলের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশে নতুন সংস্কারবিধি অনুসারে সম্প্রসারিত কাউন্সিলের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় ১৯১০ সালের ৫ এপ্রিল। ঐ বছরের বাজেট (১৯১০-১১) অধিবেশনে ভাষণ দিতে গিয়ে নওয়াব আলী চৌধুরী প্রাদেশিক রাজধানী ঢাকা শহরের সার্বিক উন্নয়নের জন্য 'ঢাকা উন্নয়ন কমিটি' নামক একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠার দাবি করেন। পূর্ব বছরের বাজেট-বক্তৃতায় ন্যায় এবারও তিনি ম্যালেরিয়া ও মহামারি নিবারণ করে জনস্বাস্থ্যের উন্নতি বিধানের প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। পূর্ববর্তী বছর তিরি কর্তৃপক্ষকে অবৈতনিক প্রাথমিক সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। পূর্ববর্তী বছর তিনি কর্তৃপক্ষকে অবৈতনিক প্রাইমারী শিক্ষা প্রবর্তনের দাবি উত্থাপন করেন এবং বাজেটে অর্থের ব্যবস্থা রাখার জন্যেও সরকারকে অনুরোধ করেন।[৪৫]

Dhaka University Institutional Repository

১৯১১ সালের ৫ এপ্রিল পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের সর্বশেষ বাজেট-অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। অধিবেশনে নওয়াব আলী চৌধুরী বাজেট সম্পর্কিত ভাষণ দিতে গিয়ে শিক্ষার্থীদের ভর্তি সমস্যার উপর আলোকপাত করেন এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীর আসনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন। পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের সংখ্যানুপাতে মুহসিন ফান্ড থেকে অধিকতর অর্থ বরাদ্দ করে শিক্ষার প্রয়োজন মেটাবার জন্য তিনি সরকারকে অনুরোধ করেন। মাদরাসা-সংস্কার কমিটি প্রণীত শিক্ষা ব্যবস্থার যৌক্তিকতা প্রদর্শন করে তিনি বলেন, এ স্কীমে অতিরিক্ত সময় নষ্ট না করে যাতে প্রাচ্য শিক্ষা ও ইংরেজী শিক্ষা একসঙ্গে লাভ করা যায়, সেই ব্যবস্থা করা হয়েছে: এই শিক্ষা-পদ্ধতিতে ধর্মশিক্ষা ও ইংরেজী শিক্ষার সমন্বয় সাধন করা হয়েছে। তাই এই উন্নত ও আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতি যথাশীঘ্র বাস্তবায়িত করা উচিত। স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাসমূহ। যথাঃ জেলাবোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটি ও রুর‍্যাল বোর্ডসমূহে মুসলিম প্রতিনিধিত্বের বিষয় উল্লেখ করে নওয়াব আলী চৌধুরী ভাষণে বলেন, পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশে মোট জনসংখ্যার ২/৩ ভাগ হলো মুসলমান; তারা সরকাকে কর দিয়ে থাকে; এ সব সংস্থায় তাদের প্রতিনিধিত্ব করার অধিকার নিশ্চয়ই রয়েছে। অমুসলিম মহলের প্রভাবে এ সব সংস্থায় মুসলমানরা যুক্ত নির্বাচনের মাধ্যমে এ যাবত তাদের ন্যায্য প্রতিনিধিত্ব লাভে সক্ষম হয়নি। তাই সম্প্রদায়ভিত্তিক পৃথক নির্বাচনের প্রয়োজন। এতে হিন্দু-মুসলিম সৌহার্দ্যে কোন ঘাটতি ঘটবে না। কেউ যদি ঐরূপ কিছু মনে করে, তবে তা হবে ভুল। লোকপ্রশাসন ক্ষেত্রে মুসলমানদের চাকরি-বাকরি সম্পর্কে তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ ডিগ্রী থাকলেই, যে কোন কেরানী যোগ্য বলে বিবেচিত হতে পারে না। মুসলমানরা দারিদ্রবশত উচ্চ শিক্ষা অর্জন করতে পারছে না। সুতরাং সরকার যদি উচ্চ গ্রেডের কতগুলো পদ উপযুক্ত মুসলমান প্রার্থীদের জন্য নির্দিষ্ট করে না রাখেন, তবে তারা কখনো অগ্রগতি সাধনে সক্ষম হবে না। তিনি বলেন, যেসব মহকুমায় কোন ব্যাংক নেই, সেখানে সোসাইটির এজেন্সির মাধ্যমে মডেল ব্যাংক খোলা হলে জনসাধারণ এ প্রতিষ্ঠানের উপকারিতা বুঝতে সক্ষম হবে এবং এ বিষয়ে তারা বাস্তব শিক্ষাও লাভ করতে পারবে।[৪৬]

বঙ্গ প্রেসিডেন্সী আইন সভায় (১৯১২-১৬)

বঙ্গভঙ্গ আইন রদের পর ১৯১২ সালের ১ এপ্রিলে উভয় বঙ্গ সংযুক্ত হলে নওয়াব আলী চৌধুরী ঢাকা বিভাগের জেলাবোর্ডসমূহের প্রতিনিধিরূপে বঙ্গে প্রেসিডেন্সীর আইন সভার সদস্য নির্বাচিত হন এবং ১৯১৬ সাল পর্যন্ত বহাল ছিলেন। পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রাদেশিক কাউন্সিলে তিনি যেমন সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিলেন, তেমনি বঙ্গ প্রেসিডেন্সী কাউন্সিলের অধিবেশনসমূহেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ১৯১৩ সালের ১৪ মার্চ অনুষ্ঠিত বঙ্গ প্রেসিডেন্সীর ব্যবস্থাপক সভায় ভাষণ দিতে

Dhaka University Institutional Repository

গিয়ে নওয়াব আলী চৌধুরী বলেন, পাশ্চাত্য জ্ঞান ও সভ্যতা বঙ্গদেশেই কেন্দ্রীভূত হয়েছে। অথচ মুসলমানরা এখনো বৃটিশ গভর্নমেন্টের এই বড় অবদানের পুরোপুরি অংশীদার হতে পারেনি। তিনি দুঃখ করে বলেন, এদেশে আধুনিক জ্ঞানের আবির্ভাবের অর্ধ শতাব্দী পরেও মুসলমানরা অশিক্ষার অন্ধকারে নিমজ্জিত রয়েছে। মুসলমানদের এই তিমির থেকে টেনে তুলতে হলে শিক্ষা ক্ষেত্রে তাদের অধিকতর সুযোগ-সুবিধা দিতে হবে। তবে এ ব্যাপারে তাদেরকেও স্বাবলম্বী হতে চেষ্টা করতে হবে। মুসলমানরা গভর্নমেন্টকে নীতি ভঙ্গ করতে বলে না; তারা নতুন বিশেষ কিছুই চায় না; অন্য সম্প্রদায়ের চাইতেও বেশী কিছু চায় না; তারা চায় শুধু অন্য সম্প্রদায়ের সক্ষমতা। চৌধুরী সাহেব গভর্নমেন্টকে ১৮৮২ সালের শিক্ষা কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী মুসলিম শিক্ষার প্রতি বিশেষ যত্নবান হওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। তিনি আরো বলেন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ৫০ বছর অবধি ছাত্রদের আবাস ও ভর্তির নীতিমালায় কোন পরিবর্তন ঘটেনি।[৪৭]

১৯১৩ সালের এপ্রিলে বঙ্গ প্রেসিডেন্সীর প্রথম বাজেট অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। বাজেটের উপর বক্তৃতা করতে গিয়ে নওয়াব আলী চৌধুরী আবগারী শুল্ক সম্পর্কে বলেন, দেশে আবগারী শুল্কের বৃদ্ধি আয়ের দিক থেকে ভাল হলেও নৈতিক দিক থেকে তা শুভ নয়। যাঁরা মনে-প্রাণে দেশের মঙ্গল কামনা করেন, তাঁরা এই আয়কে হিতকর বলে মনে করতে পারেন না। কারণ এই শুল্ক বৃদ্ধি মাদকদ্রব্যের প্রতি জনগণের আসক্তিই প্রমাণ করে। ভারতের মত গরীব দেশে, যেখানে শ্রমিকরা প্রায়ই উপবাস করে থাকে, সেখানে দেশীয় মাদকদ্রব্যের মূল্য এত বেশি চড়া রাখা উচিত যা হবে ক্রয় ক্ষমতার উর্দ্ধে প্রায়। গভর্নমেন্ট ও উন্নত চরিত্রের নাগরিকদের উচিত, মাদকদ্রব্যের প্রবণতা বন্ধ করা। ঐ ভাষণে তিনি আরো বলেন, সরকার-প্রকাশিত গেজেট ও বিভিন্ন ফরমের মূল্য যথাসম্ভব কম রাখা উচিত, যাতে তা জনগণের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে না যায়। কলকাতাস্থ ইউনিভার্সিটি 'ল' কলেজের জন্য যে পাঁচতলা হোস্টেল নির্মাণাধীন ছিল, তাতে তিনি কিছুসংখ্যক সিট মুসলমান ছাত্রদের জন্য সংরক্ষিত রাখার প্রস্তাব করেন। মুসলিম শিক্ষার তত্ত্বাবধানের জন্য ১৯১২ সালে বড়লাট হার্ডিঞ্জ নওয়াব সলীমুল্লাহ্-পরিচালিত প্রতিনিধিদলের কাছে পূর্ববঙ্গের জন্য স্বতন্ত্র একজন বিশেষ শিক্ষা-অফিসার তথা সহকারী জনশিক্ষা পরিচালক নিয়োগের আশ্বাস দিয়েছিলেন। সে সম্পর্কে চৌধুরী সাহেব বলেন, ঐ প্রস্তাবিত সহকারী ডিপিআইকে ক্ষমতা ও স্বার্থের দিক থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন না করা হলে সেই নিয়োগ হবে অর্থহীন। প্রকাশ থাকে যে, ১৯১৪ সালে মুসলিম শিক্ষার জন্য জে. এড্রু টেইলরকে প্রথম সহকারী ডিপিআই নিযুক্ত করা হয়। বঙ্গ প্রেসিডেন্সীর ১ম বাজেট অধিবেশনে নওয়াব আলী চৌধুরী আরো বলেন, কলকাতায় কলেজ স্কোয়্যারের আশেপাশে কয়েকটি মুসলিম হোস্টেল থাকা বাঞ্চনীয়। কারণ বেকার মাদরাসা হোস্টেল থেকে পদব্রজে কলেজ স্কোয়্যারে ক্লাস করার মানে মুসলমান ছাত্রদের স্বাস্থ্য বিনষ্ট হওয়া এবং লাইব্রেরীতে গবেষণা করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত থাকা। প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যয়নকারী দেড়শ'-

Dhaka University Institutional Repository

দু'শ মুসলমান ছাত্রের জন্য কলেজের নিকট একটি হোস্টেল প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি দাবি জানান।[৪৮]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য বাজেটে অর্থ ব্যবস্থা রাখায় তিনি আনন্দ প্রকাশ করেন। তবে এর নিয়ন্ত্রণক্ষমতা মিউনিসিপ্যালিটির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখায় তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেন। কারণ বড়লাট কর্তৃক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করার সময় এর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার উপর কোন শর্ত আরোপ করা হয়নি। নওয়াব আলী চৌধুরী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কমিটির অন্যতম প্রধান সদস্য ছিলেন। এই কমিটি প্রস্তাবিত 'মোহামেডান কলেজ' সম্পর্কে কোন কোন অমুসলিম মহল বলাবলি করতো যে, ঢাকায় এরূপ কলেজ স্থাপিত হলে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে রেষারেষি সৃষ্টি হবে। তাদের এ ধারণা খণ্ডন করে নওয়াব আলী চৌধুরী উক্ত বাজেট-বক্তৃতায় বলেন, মুসলমানরা কখনো সাম্প্রদায়িক মনোভাব পোষণ করে না। কলকাতার সংস্কৃত কলেজ, আলিয়া মাদরাসা, হিন্দু স্কুল, মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশন ইত্যাদি যদি হিন্দু-মুসলিম সৌহার্দ্যের পক্ষে ক্ষতিকর না হয়, তবে ঢাকায় মোহামেডান কলেজ স্থাপিত হলে ক্ষতির কি আশংকা থাকতে পারে? ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি প্রস্তাবিত ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ সম্পর্কে কোন কোন মহল থেকে আপত্তি তোলা হয়। এ সম্পর্কে নওয়াব আলী চৌধুরী উক্ত বাজেট-বক্তৃতায় বলেন, অতীতের মুসলিম মনীষীদের চিন্তাধারা ও ইসলামের পুরোপুরি ইতিহাস সম্পর্কে মুসলমানদের অবশ্যই ওয়াকিফহাল হতে হবে; আবার আধুনিক ভাবধারার সাথেও তাদের পরিচয় লাভ করতে হবে। এই উদ্দেশ্যেই প্রাচ্য পাশ্চাত্য শিক্ষার সমন্বয়ে নিউস্কীম মাদরাসা স্থাপন ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ' প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। নিউস্কীমের ছাত্ররা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে প্রবেশ করে এমন গ্র্যাজুয়েশন লাভ করবে, যা সেই বিভাগের গ্র্যাজুয়েটদেরকে উত্তম প্রশাসনিক চাকরি-বাকরি লাভ বা শিক্ষাপেশা অবলম্বনে উপযোগী করে তুলবে এবং আশা করা যায় এরা অন্যান্য বিভাগের গ্র্যাজুয়েটদের তুলনায় কোন অংশেই অধম হবে না। এই নিরিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বোর্ড রাখারও যৌক্তিকতা রয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনে মুসলমানরা যাতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে পারে, সেই দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকল্পনায় স্বতন্ত্র নির্বাচনের ভিত্তিতে মুসলমান গ্র্যাজুয়েট কর্তৃক মুসলমান ফেলো নিয়োগের ব্যবস্থা রাখা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনে মুসলমানদের এই বিশেষ প্রতিনিধিত্ব সম্পর্কে কতক অমুসলমান রাজনীতিক অনুদার মনোভাব পোষণ করতেন। তাঁদের এ মনোভাব লক্ষ্য করে নওয়াব আলী চৌধুরী বলেন, মুসলমানরা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচরণ থেকে শিক্ষা লাভ করেছে। কারণ বিগত যাট বছরের ফেলো নির্বাচনে মুসলমানদের কি দশা হয়েছে, তা তাদের কাছে অবিদিত নয়। তিনি দুঃখ করে বলেন, সিন্ডিকেট তো দূরের কথা, নির্বাচনের সদর দরজা দিয়ে আজও কোন মুসলমান সিনেটে প্রবেশ করতে পারে নি। তাই প্রস্তাবিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনে মুসলমানদের অবশ্যই ভূমিকা থাকতে হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কমিটির অধীনে বাংলা বিষয়ের পাঠ্যসূচী প্রণয়নের জন্য নওয়াব আলী চৌধুরীসহ গঠিত সাব-কমিটি এ মর্মে একটি প্রস্তাব গ্রহণ

Dhaka University Institutional Repository

করেন যে, সকল সম্প্রদায়ের ভাবধারা প্রতিফলনের জন্য বিভিন্ন আদর্শ, দর্শন ও মতবাদের প্রতিনিধিত্বকারী শব্দমালার সংযোজন ঘটিয়ে বাংলা ভাষাকে অধিকতর সম্পদশালী করে তুলতে হবে।[৪৯]

প্রশাসনিক চাকরিতে মুসলমান নিয়োগ সম্পর্কে নওয়াব আলী চৌধুরী বলেন, উচ্চ পদ কি নিম্ন পদ- কোনটাতেই মুসলমানদের প্রতি সদাচরণ করা হয়নি। ভারতের মত দেশে কর্মচারীরা সংখ্যাধিক্য প্রশাসনিক দক্ষতা ও উৎকৃষ্টতার একমাত্র মাপকাঠি নয়; বরং বৃটিশ প্রশাসনের দক্ষতা সম্পূর্ণ নির্ভর করে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের কর্মচারীদের ন্যায়সঙ্গত প্রতিনিধিত্বের উপর। অবশ্য প্রত্যেক কর্মচারীরই প্রয়োজনীয় ন্যূনতম যোগ্যতা থাকতে হবে। এই নিরিখেই নওয়াব আলী চৌধুরী বৃটিশ কর্মচারীদের যথাযথ প্রতিনিধিত্বের উপর জোর দেন। তিনি আরো বলেন, যে দেশের জনগোষ্ঠীর শতকরা পঞ্চাশ ভাগ মুসলমান, সেখানে চাকরি ক্ষেত্রে তাদের ন্যায্য প্রতিনিধত্বের ব্যবস্থা করার প্রয়োজন কেবল তাদের প্রতি ন্যায় বিচারের খাতিরেই নয়' বরং প্রশাসনিক সততা, দক্ষতা ও দৃঢ়তার জন্যেও এর আবশ্যকতা রয়েছে। তিনি এ মর্মে অভিযোগ আনেন যে, সাবডিনেট ও মিনিস্টীরিয়্যাল সার্ভিসের শূন্য পদগুলো যথারীতি বিজ্ঞাপিত হয় না, আবার হলেও স্বজনপ্রীতির দৌরাত্মে মুসলমানরা শিক্ষা-দীক্ষায় পশ্চাদপদ। অমুসলমানরা ৫০ বছর পূর্বেই শিক্ষাক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছে। তাই শূন্য পদসমূহের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অমুসলিম ডিগ্রীধারীরাই প্রার্থী হয়ে থাকে। মুসলমান প্রার্থীসংখ্যা কম নয়, যদিও তারা শিক্ষায় অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের তুলনায় ততটা উচ্চ-শিক্ষিত নয়। দ্বিতীয়ত, তারা পুরনো ঐতিহ্যের দম্ভে চাকরি-বাকরির জন্য খোশামোদ-তোষামোদও করতে জানে না। এমতাবস্থায় চাকরি প্রদানের ব্যাপারে যদি সরকার কর্তৃক ন্যূনতম যোগ্যতা নির্ধারণ না করা হয় এবং সরকারী চাকরিতে মুসলমানদের নিযুক্ত না করা হয়, তবে তাদের প্রতি ভীষণ অবিচার করা হবে।[৫০]

স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাসমূহে প্রতিনিধি প্রেরণের প্রশ্নে নওয়াব আলী চৌধুরী উক্ত বাজেট-বক্তৃতায় বলেন জেলাবোর্ড, পৌরসভা ও লোক্যাল বোর্ডের কর্তৃত্বাধীনে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যরক্ষা খাতে যে মোটা অংক বরাদ্দ করা হয়ে থাকে, তাতে সকল সম্প্রদায়েরই অধিকার রয়েছে। এ সব সংস্থায় যদি সকল সম্প্রদায়ের সঠিক প্রতিনিধিত্ব না থাকে, তবে সেই অধিকার অর্থহীন হয়ে দাঁড়াবে। গভর্নমেন্ট যখন প্রাদেশিক আইনসভা ও কেন্দ্রীয় আইনসভার ক্ষেত্রে ধর্মভিত্তিক স্বতন্ত্র নির্বাচন মেনে নিয়েছেন তবে তা স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাসমূহ পর্যন্ত বর্ধিত হবে না কেন? ব্যবস্থাপক কাউন্সিলে যে কাজগুলো সম্পন্ন হয়ে থাকে, সেগুলোই সীমাবদ্ধ ও সীমিত আকারে স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাসমূহে হয়ে থাকে। সুতরাং মুসলমানরা যখন উচ্চ পর্যায়ে প্রতিনিধিত্ব করতে পারে, তবে স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহে না পারার তো কোন কারণ নেই। স্থানীয় সংস্থাগুলো হলো রাজনৈতিক শিক্ষার সূতিকাগার। বৃটিশ গভর্নমেন্ট বিভিন্ন সম্প্রদায়ের স্বার্থ বজায় রাখতে চান। সুতরাং গভর্নমেন্টের উচিত, পৃথক নির্বাচনের মাধ্যমে

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিনিধি নির্বাচিত করে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার উত্তরণে জনগণকে সাহায্য করা। চৌধুরী সাহেব মত প্রকাশ করেন যে, মুসলমানরা যেহেতু কর-ভার বহন করে, সেইহেতু তারা পৃথক নির্বাচনেরও অধিকারী। পৃথক নির্বাচনের মাধ্যমে প্রতিনিধি নির্বাচিত হলেও হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে হৃদ্যতা বজায় থাকতে পারে।

তিনি আরো বলেন, কৃষকপ্রধান পরিবেশে প্রতিবেশীদের মধ্যে সদ্ভাব ও পারস্পরিক সাহায্য-সহানুভূতি বজায় রাখার মধ্যেই নিহিত রয়েছে সমবায় আন্দোলনের গূঢ় তত্ত্ব ও সার্থকতা। কৃষি সম্পর্কে চৌধুরী সাহেব বলেন, এ দেশ কৃষিভিত্তিক দেশ; এ দেশকে আরো অনেক দিন এরূপই থাকতে হবে; কৃষি-উৎপাদনই আমাদের জাতীয় জীবন ও জাতীয় উন্নতির উৎস। ভারতীয় কৃষির মানকে আরো অনেক দূর উন্নত করা যায়। কিন্তু কথা হলো আমাদের ভূমির অবস্থা তো অধোগতির দিকেই চলেছে; পশু-সম্পদ লয়প্রাপ্ত হচ্ছে; সাধারণ লোকেরা আরো গরীব হতে চলেছে; ফলনশীল বীজের সংগ্রহ, ভাল জাতের পশুপালন ও পশু প্রজননে উত্তম কোন পদ্ধতি অনুসৃত হচ্ছে না; মান্ধাতা আমলের রীতিনীতিই শিকড় গেঁড়ে বসেছে; দেশে ছয়টি আদর্শ কামার রয়েছে। কিন্তু জনগণ সংস্কারের ঊর্দ্ধে উঠতে পারছে না। এসব বিষয়ে কৃষকদের মধ্যে বক্তৃতা প্রদান ও বাস্তব শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা উচিত; গ্রামীণ স্কুলের পাঠ্যসূচীকে কৃষিভিত্তিক করা দরকার। বঙ্গ প্রেসিডেন্সীর মাটি উর্বর; আমাদের একদিকে কৃষি স্কুল-কলেজ ও কৃষিখামার রয়েছে, অন্যদিকে রয়েছে মাঠঘাট। তাই কৃষির উন্নতি হবে না কেন? পৌ-পুলিশ সম্পর্কে তিনি বলেন, পুলিশ-বাজেট বাড়ানো উচিত; এ বিভাগের সংস্কার করা দরকার; সাধারণ পুলিশের দক্ষতা প্রয়োজনীয় মানের চাইতে অনেক নীচে। সুতরাং এ বিভাগের যে কোন সংস্কারকে চৌধুরী সাহেব স্বাগত জানান।[৫১]

বঙ্গ প্রেসিডেন্সী ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন ১৯১৪ সালের ৫ আগস্ট কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয়, তাতে নওয়াব আলী চৌধুরী এ মর্মে এক প্রস্তাব উত্থাপন করেন যে, বঙ্গের দ্বিতীয় রাজধানী তথা ঢাকায় প্রত্যেক বছর আইনসভার অন্তত একটি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হতে হবে। সে প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। এ প্রস্তাব উপস্থাপন করতে গিয়ে, প্রত্যেক বছর আইনসভার অন্তত একটি অধিবেশন প্রদেশের দ্বিতীয় রাজধানী ঢাকায় আহ্বান করার যে সব প্রতিশ্রুতি গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকে ইতিপূর্বে দেয়া হয়েছিল, তিনি সে সব তুলে ধরেন এবং সাথে সাথে ঢাকা শহরের ঐতিহ্যও বর্ণনা করেন। সে সময় ১ম বিশ্বযুদ্ধের সূত্রপাত হয়েছিল। জার্মানি বৃটিশ গভর্নমেন্ট তথা গোটা ইউরোপের উপর যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়। নওয়াব আলী চৌধুরী বঙ্গ প্রেসিডেন্সী, বিশেষ করে মুসলিম বঙ্গের তরফ থেকে বৃটিশ গভর্নমেন্টের প্রতি পূর্ণ আস্থা ও আনুগত্য প্রকাশ করেন এবং ঐ অধিবেশনের ভাষণে বলেন, গ্রেট বৃটেনের সার্বভৌমত্ব ও নিরাপত্তার সাথে ভারতের স্বার্থ ও গোটা বিশ্বের সভ্যতা ওতপ্রোতভাবে জড়িত।[৫২]

নওয়াব আলী চৌধুরী ১৯১৫ সালের এপ্রিলে অনুষ্ঠিত বঙ্গ প্রেসিডেন্সীর ব্যবস্থাপক সভায় নিউস্কীম

Dhaka University Institutional Repository

মাদরাসার প্রবর্তন, চট্টগ্রাম, ঢাকা, হুগলী ও রাজশাহী মাদরাসার প্রাদেশিকীকরণ এবং মুহসিন ফান্ডের অর্থ থেকে মুসলমান ছাত্রের বৃত্তি ও তাদের বেতনের অংশবিশেষ প্রদানের জন্য গভর্নমেন্টকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। ব্যবস্থাপক সভার এই অধিবেশনে তিনি তাঁর ভাষণে আশা ব্যক্ত করেন যে, যুদ্ধকালীন আর্থিক সংকট সত্ত্বেও গভর্নমেন্ট প্রস্তাবিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য বাজেটে কিছুটা অর্থের ব্যবস্থা রেখেছেন: সুতরাং পুরো স্কীমের জন্যই শিগগির অর্থ পাওয়া যাবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্মাণ-কাজও আরম্ভ হবে। কলকাতার 'ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে' বেশ আর্থিক সাহায্য দেওয়া সত্ত্বেও গভর্নমেন্ট 'মুসলিম ইনস্টিটিউটে'র জন্য কোন অর্থ বরাদ্দ করেন নি। এজন্য তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন। সঙ্গতিসম্পন্ন লোকের সন্তানদের জন্য 'হেস্টিংস্ হাউস স্কুল' নামক বিশেষ একটি স্কুল স্থাপন প্রসঙ্গে নওয়াব আলী চৌধুরী বলেন, এ প্রতিষ্ঠানে জনগণ থেকে প্রাপ্ত রাজস্বের মোটা অংক ব্যয় করার কোন যৌক্তিকতা নেই। তিনি মনে করেন, অর্থশালী লোকের নিজেদের অর্থেই তাদের সন্তানাদির জন্য স্কুল স্থাপনে সক্ষম। যুদ্ধকালীন সময়ে (১ম বিশ্বযুদ্ধ) মফঃস্বল শহরে পানীয় জল সরবরাহের জন্য জনগণকে জেলাবোর্ড কর্তৃক ব্যয়িত অর্থের ১/৩ ভাগ দিতে হতো। তাতে গরীব এলাকার লোকেরা অর্থাভাবে পানীয় জল থেকে বঞ্চিত থাকতো। বিষয়টি লক্ষ্য করে নওয়াব আলী চৌধুরী গভর্নমেন্টকে পরামর্শ দিলেন যে, পূর্ত বিভাগীয় 'সেস' থেকে পানি সরবরাহের ব্যয় মিটিয়ে বিনামূল্যে মফস্বল শহরে পানির ব্যবস্থা করা দরকার। আবগারী খাতে আয় বর্ধিত হওয়ায় নওয়াব আলী চৌধুরী সুখী হতে পারে নি। উক্ত ভাষণে তিনি সরকারকে পরামর্শ দেন যে, আবগারী লাইসেন্স দেয়ার জন্য উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন 'লোক্যাল এডভাইজরি কমিটি' গঠন করা উচিত। তিনি মদ্যপানকে নিরুৎসাহিত করেন।[৫৩]

নওয়াব আলী চৌধুরী ১৯১৬ সালের ৩ এপ্রিলে কলকাতায় অনুষ্ঠিত বঙ্গ প্রেসিডেন্সীর ব্যবস্থাপক সভায় বাজেটের উপর যে বক্তৃতা দেন, তা ছিল ১৯১২-১৯১৬ সাল মেয়াদী ব্যবস্থাপক কাউন্সিলে তাঁর সর্বশেষ ভাষণ। এ ভাষণে তাঁর মন ছিল অতীতের সোনালী স্মৃতির আবেশে ভারাক্রান্ত। তিনি অধুনা বিলুপ্ত পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের সেই মধুর দিনগুলোর স্মৃতিচারণ করেন। অতঃপর গভর্নমেন্টের বারংবার প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও ঢাকা তথা বাংলার দ্বিতীয় রাজধানীকে সত্যিকার রাজধানীতে পরিণত না করায় তিনি কর্তৃপক্ষকে তাঁদের পুরনো ওয়াদাগুলো স্মরণ করিয়ে দেন। তিনি এ মর্মে অভিযোগ আনেন যে, ঢাকার উন্নতি তো দূরের কথা, তা পূর্বের গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শনগুলোও হারিয়ে ফেলছে। তিনি আরো বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি এ মর্মে সুপারিশ করেছিলেন যে, ঢাকার ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুলটি কলেজে পরিণত হবে, একটি ইন্ডাস্ট্রিয়্যাল ইনস্টিটিউট স্থাপিত হবে; পরবর্তী সময় অন্য একটি কমিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন যে, কলকাতার শিবপুরস্থ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজটি ঢাকায় স্থানান্তরিত হবে। কিন্তু বাস্তবে কিছুই হয়নি। উল্টো ঢাকা ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল থেকে সার্ভে ক্লাস, ইলেকট্রিক ও মেকানিক্যাল সেকশন নেয়া হয়। চৌধুরী সাহেব ঐ ভাষণের শেষ পর্বে এই আশা ব্যক্ত করেন যে, পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের বিরুদ্ধে যে শক্তি এক সময়

Dhaka University Institutional Repository

তৎপর ছিল, গভর্নমেন্ট যেন তার কাছে নতি স্বীকার না করেন এবং ঢাকাকে সত্যিকারভাবে দ্বিতীয় রাজধানীতে পরিণত করে পূর্ববাংলার জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে নওয়াব আলী চৌধুরী ঐ বাজেট-বক্তৃতায় বলেন, যুদ্ধকালীন আর্থিক সংকটের দরুন প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ শিকায় তুলে রাখা হয়েছে। অথচ সদ্যগঠিত বিহার-উড়িষ্যা প্রদেশে একটি পূর্ণাঙ্গ হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।[৫৪]

নওয়াব আলী চৌধুরী ১৯১৫ সালে প্রকাশিত 'হর্নেল এডুকেশন্যাল এড্ভাইজরি কমিটি'র রিপোর্ট সম্পর্কে আলোচ্য বক্তৃতায় বলেন, এ রিপোর্টটিকে মুসলিম শিক্ষার 'ম্যাগনাকার্টা' বলা চলে। এ কমিটির রিপোর্টগুলো বাস্তবায়িত হলে পদ্ধতিগতভাবে মুসলমানদের শিক্ষার অগ্রগতি সাধিত হবে এবং তাদের সাংস্কৃতিক উন্নতিও ত্বরান্বিত হবে। অতঃপর চৌধুরী সাহেব বঙ্গীয় তথা ভারতীয় শিক্ষার উন্নতি অবনতির তুলনামূলক একটি দীর্ঘ খতিয়ান তুলে ধরেন। ঐ বাজেট-বক্তৃতার শেষের দিকে তিনি গভর্নমেন্টকে মুসলিম শিক্ষার উদ্দেশ্যে একজন সহকারী জনশিক্ষা পরিচালক, বঙ্গ প্রেসিডেন্সীর ৫টি বিভাগের প্রত্যেকটিতে একজন করে সহকারী জনশিক্ষা ইন্সপেক্টর, প্রেসিডেন্সী ও বর্ধমান বিভাগে একজন করে ইন্সপেক্টস অব স্কুলস্ নিয়োগ, মাদরাসা রিফরম্স-এর অধীন মাদরাসাসমূহে আর্থিক সাহায্য দান, মুহসিন ফান্ডের অর্থকে শুধু ছাত্রবেতন, ছাত্রবৃত্তি ও স্টাইপেন্ডের জন্য নির্ধারণ এবং গভর্নমেন্ট ফান্ড থেকে গভর্নমেন্ট মাদরাসাসমূহের পূর্ণ ব্যয়ভার বহনের জন্য সরকারকে ধন্যবাদ জানান।[৫৫]

বঙ্গ প্রেসিডেন্সী মুসলমান শিক্ষা সমিতিতে

বঙ্গবিভাগ রদের পর নবাব সলীমুল্লাহর্ উদ্যোগে ১৯১৪ সালের ১১ ও ১২ এপ্রিল ঢাকায় 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতি' এবং 'বঙ্গ প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতি'র প্রথম যুক্ত অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় এবং এটি ছিল 'বেঙ্গল প্রেসিডেন্সী মুসলমান শিক্ষা সমিতি'র উদ্বোধনী অধিবেশন। অধিবেশনে সমিতির সদর দপ্তর কলকাতায় রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং মুসলিম শিক্ষার উন্নতির উদ্দেশ্যে ৭সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠনের জন্য সরকারকে অনুরোধ জানান হয়। অধিবেশনে মোট ৩০টি প্রস্তাব গৃহীত হয়। ৪০ সদস্য বিশিষ্ট একটি সেন্ট্রাল স্ট্যাণ্ডিং কমিটি গঠিত হয়। এছাড়া নবাব সলীমুল্লাহকে প্রেসিডেন্ট ও নওয়াব আলী চৌধুরীকে সেক্রেটারী করে সমিতির জন্য ৬ সদস্য বিশিষ্ট একটি কার্যনির্বাহী কমিটিও গঠিত হয়। নওয়াব আলী চৌধুরী ১৯১৬ সাল পর্যন্ত 'বঙ্গ প্রেসিডেন্সী মুসলমান শিক্ষা সমিতি'র সেক্রেটারীর দায়িত্বে ছিলেন। কমিটির অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে ছিলেন- বর্ধমানের সৈয়দ আব্দুল্লাহ মুসবী বিএ (সহকারী সেক্রেটারী), কলকাতার আব্দুর রসুল এমএ বার এট ল (ট্রেজারার), কলকাতাস্থ মহিশূর পরিবারের নওয়াব

Dhaka University Institutional Repository

সুলতান আলম (হিসাব রক্ষক), কলকাতার আলীপুরস্থ নাসীম আলী বিএ, বিএল (হিসাব রক্ষক)। অধিবেশনে সভাপতিত্ব করতে গিয়ে নওয়াব আলী চৌধুরী দীর্ঘ ভাষণে বলেন- মুসলমানরা প্রথমে মুসলমান, পরে ভারতীয় এবং একটি স্বতন্ত্র জাতি। আসনের অভাবে অনেক মুসলমান ছাত্র কলেজে প্রবেশ করতে পারছে না; অথচ এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, দেশের সকল সম্প্রদায়ের সমভাবে উন্নতি না হলে গোটা দেশের উন্নতি সম্ভব নয়; ধর্মশিক্ষার সাথে সংযোগ নেই– এমন নিছক লোকায়ত শিক্ষা মুসলমানদের জন্য উপযোগী নয়; প্রচলিত মাদরাসা শিক্ষার সংস্কার সাধিত হলে ধর্মীয় ও পার্থিব–উভয় চাহিদাই মিটবে। মুসলমানদের চাকরি-বাকরি সম্পর্কে তিনি বলেন, এ ক্ষেত্রে মুসলমানদের বিশেষ সুযোগ-সুবিধাদানের জন্য আবেদন করা হলেও তার মানে এই নয় যে, তাদের জন্য দক্ষতার সাধারণ মাপকাঠি শিথিল করা হোক; মুসলমানদের দাবি হলো–প্রয়োজনীয় ন্যূনতম যোগ্যতা থাকলেই তাদের প্রশাসনিক কাজে নিযুক্ত করা উচিত। প্রস্তাবিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা সম্পর্কে তিনি বলেন, এর প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ ঢাকার মিউনিসিপ্যাল এলাকায় সীমাবদ্ধ না হয়ে গোটা পূর্ববঙ্গের কলেজসমূহের উপর হওয়া প্রয়োজন।[৫৭]

মুসলমানদের শিক্ষার উন্নতির জন্য 'বেঙ্গল প্রেসিডেন্সী মুসলমান শিক্ষা সমিতি'র অনুরোধে এবং ভারত সরকারের নির্দেশে ১৯১৪ সালের ৩০ জুন বেঙ্গল গভর্নমেন্ট ২৪৭৪ নং রেজুলেশন অনুসারে জনশিক্ষা পরিচালক ডব্লিউ, ডব্লিউ হর্নেলকে প্রেসিডেন্ট এবং মুসলমান শিক্ষার জন্য নিযুক্ত সহকারী জনশিক্ষা পরিচালক জোসেফ এণ্ড্রু টেইলরকে সেক্রেটারী করে ১৪ সদস্য বিশিষ্ট 'মোহামেডান এডুকেশন্যাল এডভাইজরি কমিটি (হর্নেল কমিটি) গঠন করা হয়। নওয়াব সলীমুল্লাহ্ ও নওয়াব আলী চৌধুরী কমিটির অন্যতম সদস্য ছিলেন। অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে ছিলেন- ১. জনশিক্ষা পরিচালক ডব্লিউ ডব্লিউ হর্নেল (সভাপতি) ২. নওয়াব এ এফ এম আঃ রহমান খানবাহাদুর, ৩. খানবাহাদুর মৌলবী ইব্রাহিম, ৪. খানবাহাদুর মৌলবী আহসানুল্লাহ, ৫. শামসুল উলামা আবু নসর ওহীদ, ৬. নওয়াব খাজা সলীমুল্লাহ, ৭. একে গযনবী, ৮. সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী, ৯. খান বাহাদুর মির্যা শুজাআত আলী বেগ, ১০. একে ফজলুল হক, ১১. মাজহারুল আনোয়ার চৌধুরী, ১২. খান বাহাদুর দেওয়ান খোন্দকার ফযলে রাব্বী, ১৩. যাহ্হাদুর রহীম যাহিদ সুহরাওয়ার্দী, ১৪. সহকারী জনশিক্ষা পরিচালক (মুসলমান শিক্ষা) জে. এন্ড্রু টেইলর (সেক্রেটারী)। ১৯১৫ সালে কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। নওয়াব সলীমুল্লাহ পীড়াবশত কমিটির কোন বৈঠকেই যোগদান করতে পারেন নি। কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার পূর্বেই তিনি ১৯১৫ সালের ১৬ জানুয়ারী ইনতিকাল করেন। নওয়াব আলী চৌধুরী যথারিতি কমিটির বিভিন্ন বৈঠকে যোগদান করেন এবং সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। কমিটির বিবেচনার জন্য তিনি স্বতন্ত্রভাবে কতগুলো প্রস্তাব পেশ করেন। স্ত্রীশিক্ষার জন্যেও তিনি পৃথকভাবে অন্য কতগুলো বিষয় কমিটির সামনে তুলে ধরেন। ১৯১৪ সালের ১১ ও ১২ এপ্রিলে ঢাকায় অনুষ্ঠিত 'বেঙ্গল প্রেসিডেন্সী মোহামেডান এডুকেশন্যাল কনফারেন্স'-এর এক প্রস্তাব মোতাবেক এই এডভাইজরি কমিটির অধীনে 'মর‍্যাল এ্যাণ্ড রিলিজাস্ এডুকেশন্যাল কমিটি' নামক একটি সাব-কমিটি হয়েছিল।

Dhaka University Institutional Repository

ভারতীয় আইন সভায়

পূর্ববঙ্গের মুসলমান সম্প্রদায়ের নির্বাচিত প্রতিনিধিরূপে নওয়াব আলী চৌধুরী ১৯১৬ থেকে ১৯২০ সাল পর্যন্ত ভারতীয় আইনসভার সদস্য ছিলেন। সদস্যরূপে ভারতীয় আইনসভায় প্রবেশ কালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলছিল। তখন ভারতীয় নেতাগণ বৃটিশ গভর্নমেন্টের নিকট স্বায়ত্তশাসন লাভের প্রতিশ্রুতি আদায়ের চেষ্টা করেন। যুদ্ধশেষে ভারতে শাসন সংস্কার প্রবর্তন, প্রতিনিধিত্বশীল সরকার গঠন ও ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন দাবি করে ভারতীয় আইনসভার ১৯জন বেসরকারী সদস্য ১৯১৬ সালের অক্টোবরে ভাইসরয়ের নিকট স্মারকলিপি পেশ করেন। স্মারকলিপিতে মুসলিম স্বার্থ সংরক্ষণের স্পষ্ট উল্লেখ না থাকায় নওয়াব আলী চৌধুরী স্বাক্ষর করা থেকে বিরত থাকেন এবং স্বতন্ত্রভাবে গভর্নমেন্টের নিকট অন্য একটি পাল্টা স্মারকলিপি পেশ করেন। স্মারকলিপিতে মুসলমান ও অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষায় রক্ষাকবচ দাবি করে বলেনঃ হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে হলে মুসলমানদের স্বার্থরক্ষার জন্য তাদের যথোচিত সুবিধা ও অধিকার দিতে হবে এবং তা কেবল স্বতন্ত্র সম্প্রদায় হিসেবে পৃথক নির্বাচন ভিত্তিক প্রতিনিধি নিয়োগের মাধ্যমেই দিতে হবে। লখনৌ চুক্তিতে বাংলাদেশের মুসলমানদের আসন-সংখ্যা ছিল ৪০%। কিন্তু এ প্রদেশের মুসলমানের সংখ্যা মোট জনগোষ্ঠীর অর্ধেকেরও বেশি ছিল বলে তিনি তাদের জন্য ৫০% আসন দাবি করেন।[৫৮] ভাইসরয়ের নিকট পেশকৃত স্মারকলিপির উপর ভিত্তি করে ১৯১৬ সালের ডিসেম্বরে লখনৌতে কংগ্রেস ও লীগের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় এবং বিখ্যাত 'লখনৌ-চুক্তি' (Lucknow Pact) সম্পাদিত হয়। এই চুক্তিতে ভারতের ৭টি প্রদেশের মধ্যে ৫টি প্রদেশকে সংখ্যালঘুদের স্বার্থে এবং সামগ্রিক ভারসাম্য রক্ষার উদ্দেশ্যে অতিরিক্ত প্রতিনিধিত্বের সুযোগ দেয়া হয়। এ নীতি অনুসারে পাঞ্জাব ও বাংলা- এ দুটি মুসলমান প্রধান প্রদেশের কাউন্সিলে হিন্দুদেরকে অতিরিক্ত প্রতিনিধিত্বের সুযোগ দেয়া হয়। তখন বঙ্গ প্রেসিডেন্সীতে মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যা ছিল ৫২.৬%। তা সত্ত্বেও এর ব্যবস্থাপক সভায় মুসলমান আসনসংখ্যা ৪০% রাখা হলে বাংলার মুসলমানদের বড় একটি দল, বিশেষত; নওয়াব আলী চৌধুরীসহ নওয়াব সলীমুল্লাহর অনুসারিগণ চুক্তির নিন্দা করেন। নওয়াব আলী চৌধুরী ১৯১৭ সালে 'বেঙ্গল প্রেসিডেন্সী মুসলিম লীগ'-এর সভাপতির পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে লখনৌ-চুক্তি বিরোধী দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। ১৯১৮ সালের আগস্ট মাসে তিনি সেন্ট্রাল ন্যাশনাল এসোসিয়েশন'-এর সভাপতি নিযুক্ত হন এবং ১৯২৩ সাল পর্যন্ত ঐ পদে বহাল থাকেন।[৫৯]

ফ্র্যাঞ্চাইজ কমিটিও বেঙ্গল গভর্নমেন্টের মতানুসারে মুসলমানদের ৪৫% আসন নির্ধারণ করেন। এই পরিস্থিতিতে 'সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশন'-এর সভাপতি নওয়াব আলী

Dhaka University Institutional Repository

চৌধুরী ফ্র্যাঞ্চাইজ কমিটি বা ফ্রাঙ্কশন্স কমিটির শরণাপন্ন না হয়ে সরাসরি দিল্লীস্থ ভারত গভর্নমেন্টের উচ্চপদস্থ সদস্যদের বোঝাতে চেষ্টা করেন যে, লখনৌ-চুক্তি ভারতের বাকি অংশের জন্য গ্রহণযোগ্য হলেও মুসলমানদের জন্য ন্যায়ানুগ নয়; 'মুসলিম লীগ' মুসলিম বাংলার প্রতিনিধিত্ব করার অধিকারী নয় এবং লীগ-কংগ্রেস স্কীম বাস্তবায়িত হলে তা হবে ১৯১২ সালের বঙ্গভঙ্গ রদের ন্যায় মুসলমানদের সাথে অন্য একটি বিশ্বাসঘাতকতার নামান্তর। নওয়াব আলী চৌধুরীর রাজনীতির মৌলিক দর্শন ছিল সাম্প্রদায়িক পৃথক নির্বাচন। ১৯১৯ সালের ১৯ এপ্রিল সিরাজগঞ্জে অনুষ্ঠিত 'অল বেঙ্গল মোহামেডান কনফারেন্সে' সভাপতির ভাষণে বলেন, সাম্প্রদায়িক পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থা না করা হলে ভারতে নির্বাচনের কোন স্কীমই সফল হবে না।[৬০]

১৯১৮ সালের ৬ ফেব্রুয়ারী ভারতীয় আইনসভায় মিঃ শর্মা ভারতীয় প্রদেশসমূহের সীমারেখা পুনঃ নির্ধারণ ও ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠনের জন্য একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। ঐ প্রস্তাবের উপর আলোকপাত করতে গিয়ে নওয়াব আলী চৌধুরী বলেন, প্রদেশের সীমরেখা পুনঃ নির্ধারণের জন্য কেবল মাতৃভাষাই একমাত্র মাপকাঠি হওয়া উচিত নয়; বরং গোত্র, সম্প্রদায়, অধিবাসীদের মন-মেজাজ, ভৌগোলিক গঠন, রাজস্ব ব্যবস্থা এবং প্রশাসনিক ঐতিহ্যের প্রতিও লক্ষ্য রাখার প্রয়োজন রয়েছে। নওয়াব আলী চৌধুরী আরো বলেন পূর্ববঙ্গের প্রধান অধিবাসী হলো মুসলমান; তাদের মাতৃভাষা আবহমানকাল ধরে আরবী-ফার্সী শব্দে বিশেষভাবে প্রভাবিত। তিনি কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করেন যে, ভবিষ্যতে প্রদেশের সীমারেখা পুনঃ নির্ধারণের প্রশ্ন উঠে, তখন পূর্ববঙ্গ ও সিলেট জেলাকে যেন স্বতন্ত্র প্রশাসনিক ইউনিটে পরিণত করা হয়। ১৯১৮ সালের ২০ ফেব্রুয়ারী ভারতীয় আইনসভায় নওয়াব আলী চৌধুরী সুরা ও মাদক ঔষধ পুরোপুরি নিষিদ্ধ করার জন্য মিঃ শর্মার প্রস্তাব সংশোধনীসহ সমর্থন করেন এবং বলেন, জনসাধারণের স্বার্থে সুরা, মাদক ঔষধ, আফিম ইত্যাদি (ঔষধ তৈরীর উপাদান ছাড়া) ব্যবহার সুনিয়ন্ত্রণের জন্য কেবল বেশী পরিমাণে কর আরোপ এবং মূল্যবৃদ্ধি যথেষ্ট নয়; এ সব মাদক দ্রব্য সংগ্রহের পথ চিরতরে বন্ধ করতে হবে। যেহেতু ভারতের বড় বড় সব ধর্মমতেই সুরা পান ও মাদক দ্রব্যের ব্যবহার অবৈধ।[৬১]

নওয়াব আলী চৌধুরী ১৯১৯ সালের ৩ সেপ্টেম্বর আর. এ. মেন্ট জমি বাজেয়াপ্তকরণ আইন সংশোধন বিলে সমবায় সমিতি, দাতব্য সমিতি ইত্যাদিকে জমি বাজেয়াপ্তির ক্ষমতা প্রদান করার জন্য উত্থাপিত প্রস্তাব সংশোধন করে জমি বাজেয়াপ্তকরণ আইনের আওতা থেকে মসজিদ, মন্দির ও হিন্দু-মুসলমানের অন্যান্য পবিত্র স্থানকে বাদ দেওয়ার জন্য গভর্নমেন্টকে বিশেষভাবে অনুরোধ করেন। তাঁর অনুরোধসহ বিলটি গৃহীত হয়। ১৯১৯ সালের ১১ সেপ্টেম্বর ভারতীয় আইনসভায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিল উত্থাপিত হয় এবং বিলটি ১৯২০ সালের ১৮ মার্চ আইনে পরিণত হয়। নওয়াব আলী চৌধুরী বিলটির উপর দীর্ঘ আলোচনা করেন।[৬২]

ভারতীয় আইনসভায় ১৯২০ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারী পূর্ববর্তী ছয় বছরে বিভিন্ন প্রদেশের মুসলিম

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষা বিষয়ে ভারত সরকার কর্তৃক প্রাদেশিক গভর্নমেন্টসমূহের নিকট প্রেরিত নির্দেশ ও সুপারিশমালা বাস্তবায়ন পর্যালোচনা করার উত্থাপিত প্রস্তাব সমর্থন করে নওয়াব আলী চৌধুরী বক্তৃতায় মুসলিম শিক্ষার প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদাসীনতা ও অবিচারসমূহ তুলে ধরেন এবং এ জন্য সরকারী ও বেসরকারী সদস্য সংবলিত একটি কমিটি গঠনের প্রস্তাব দেন। কলকাতা মাদরাসা-ই-আলিয়ার সংস্কারের উদ্দেশ্যে বেঙ্গল গভর্নমেন্ট ১৯২১ সালে নওয়াব শামসুল হুদা ও জে.এ. টেইলরকে যথাক্রমে প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারী করে 'টেইলর কমিটি' বা 'শামসুল হুদা কমিটি' গঠিত হয়। কমিটিতে নওয়াব আলী চৌধুরী সরকারী সদস্য ছিলেন।[৬৩]

বঙ্গের প্রথম ব্যবস্থাপক সভায়

নওয়াব আলী চৌধুরী ১৯২১-২৩ সালে পূর্ব-ময়মনসিংহের মুসলমান নির্বাচকমণ্ডলীর প্রতিনিধিরূপে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্বাচিত হন। এই নির্বাচনে কংগ্রেস দলের কোন সদস্য প্রার্থী না হলেও ব্যবস্থাপক সভার পুরনো 'মডারেট' তথা পরবর্তী 'লিবারেল' দলের সদস্যগণ এবং আরো অনেকে প্রার্থী হন। সুতরাং ব্যবস্থাপক সভার নির্বাচন ব্যাহত হয়নি। লিবারেল দলের সদস্যগণই অধিক সংখ্যায় নির্বাচিতি হন। এ সময়েই সর্বপ্রথম নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মধ্য থেকে মন্ত্রী নিয়োগের নির্দেশ দেয়া হলে নওয়াব আলী চৌধুরী, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রভাসচন্দ্র মিত্র মধ্যপন্থী সদস্য হিসেবে মন্ত্রীপদে নিযুক্ত হন।

১৯২১ সালে তিনি 'বেঙ্গল মোসলেম ফেডারেশন' গঠন করেছিলেন। তিনি ছিলেন এই রাজনৈতিক দলের প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি। নতুন শাসননীতি অনুসারে গঠিত প্রথম ব্যবস্থাপক সভা (১৯২১-২৩) ও দ্বিতীয় ব্যবস্থাপক সভার (১৯২৪-২৬) নির্বাচনে এই 'ফেডারেশন' চৌধুরী সাহেবকে সমর্থন করেছিলেন। এই ফেডারেশন মন্টেগো চেমসফোর্ড প্রস্তাবিত শাসন-সংস্কার ক্ষেত্রে নওয়াব আলী চৌধুরীর সাথে একমত ছিলেন। ১৯২০ সালে নওয়াব আলী চৌধুরী 'Views on the Present Political Situation in India' (ভারতের বর্তমান রাজনৈতিক সমস্যা) শীর্ষক একটি পুস্তিকা লিখে কলকাতা থেকে প্রকাশ করেন। পুস্তিকায় তিনি মন্টেগো-চেমসফোর্ড প্রণীত শাসন সংস্কারকে স্বাগত জানান। গভর্নমেন্ট তাঁর পূর্বেকার আনুগত্যশীল রাজনৈতিক কার্যাবলী সম্পর্কে অবগত ছিলেন। কাউন্সিলেও তাঁর পক্ষ সমর্থনকারী যথেষ্ট মুসলমান সদস্য ছিল। বাংলায় গভর্নর রোনল্ডশে তাঁকে মন্ত্রীপদে মনোনীত করলে মুসলমান সম্প্রদায়ের দাবি-দাওয়া আদায়ের পথ প্রশস্ত হয়। তিনিই ছিলেন সর্বপ্রথম মুসলমান মন্ত্রী। তাঁর হাতে কৃষি (কো-অপারেটিভ, পশুচিকিৎসা, রেশম-শিল্প ও অন্যান্য ছোট ছোট বিভাগসহ), শিল্প (ফিশারীসহ), পূর্ত বিভাগ ও আবগারী-এ বিভাগগুলোর ভার অর্পিত হয়। তিনি আবগারী বিভাগের যথেষ্ট সংস্কার করেন। মাদক দ্রব্য নিয়ে

Dhaka University Institutional Repository

গোপন ব্যবসা তিনি তা কঠোর হস্তে সংযত করেন।[৬৫] কৃষি ও শিল্পের উন্নতির জন্যে চৌধুরী সাহেব নতুন কার্যপ্রণালী প্রণয়ন করেন। তিনি কৃষি ও শিল্প বিভাগকে একত্র করেন। কৃষক সন্তানদের শিক্ষার উদ্দেশ্যে তিনি ঢাকা ও চুঁচুড়ায় সরকারী কৃষিক্ষেত্রে (Farm) বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন যা পরবর্তীতে ঢাকার আগাঁরগাঁও-এ কৃষি মহাবিদ্যালয় এবং বর্তমান সরকারের আমলে শের-এ বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে চালু হয়েছে। এবং ছাত্রবৃত্তিরও ব্যবস্থা করেন; কৃষিশিক্ষা বিষয়ক কতকগুলো প্রাথমিক স্কুল স্থাপন করেন; শ্রীরামপুরের বয়ন-বিদ্যালয়ের উন্নতি সাধন করেন এবং তথায় ছাত্রবৃত্তির সংখ্যা বাড়িয়ে দেন, তাঁতীদের শিক্ষার জন্য স্থায়ী ও সাময়িক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। টেকনিক্যাল স্কুলে আরো উন্নত শিক্ষা ও বেশি পরিমাণ বৃত্তিদানের ব্যবস্থা করেন; কো-অপারেটিভ ব্যাংক থেকে কম সুদে ঋন দেওয়ার ব্যবস্থা করে গরীব কৃষকদের সাহায্য করেন।[৬৬]

দ্বিতীয় ব্যবস্থাপক সভায়

১৯২৩ সালের ডিসেম্বরে দ্বিতীয় ব্যবস্থাপক সভার (১৯২৪-২৬) নওয়াব আলী চৌধুরী ঢাকা পশ্চিমের মুসলমান নির্বাচকমণ্ডলী কর্তৃক সদস্য নির্বাচিত হন। এই নির্বাচনে লিবারেল দলের শোচনীয় পরাজয় ঘটে এবং চিত্তরঞ্জন দাশ ও মতিলাল নেহেরুর নেতৃত্বে গঠিত স্বরাজ্য দল সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভ করেন। স্বরাজ্য দলের প্রধান লক্ষ্য ও আদর্শ ছিল সরকারী প্রস্তাব প্রত্যাখান করা, বিশেষত বাজেট ও মন্ত্রীদের বেতন বিল নামঞ্জুর করে তাঁদের পদত্যাগ ঘটিয়ে শাসন-যন্ত্রকে বিকল করে দেওয়া। সেই পরিস্থিতিতে গভর্নর কয়েকজন সদস্যের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার পর এ.কে. ফজলুল হক, আবদুল করীম গযনবী ও সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক–এই তিনজনকে মন্ত্রী নিযুক্ত করেন। ১৯২৪ সালের ২২ জানুয়ারী ফজলুল হক মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করলে সি. আর. দাসের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক তিক্ত হয়ে উঠে। ১৯২৫ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারী স্যার আবদুর রহীমের প্রস্তাবে পরবর্তী বাজেটে মন্ত্রীদের বেতন-বিল স্বরাজ্য দলের বিরোধিতা সত্ত্বেও গৃহীত হলো। গভর্নর সন্তোষের রাজা মন্মথনাথ রায় ও নওয়াব আলী চৌধুরীকে মার্চের (১৯২৫) গোড়ার দিকে মন্ত্রী নিযুক্ত করলেন।

একজিকিউটিভ্ কাউন্সিলে

নওয়াব আলী চৌধুরী বেঙ্গল একজিকিউটিভ্ কাউন্সিলে ১৯২৫ সালে স্যার আবদুর রহীমের স্থলে সদস্য মনোনীত হন এবং আমরণ বহাল থাকেন। তিনি এই কাউন্সিলে ভাইস-প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তাঁর উপর অর্পিত বিভাগগুলো হলো- এমিগ্রেশন, ইমিগ্রেশন, সীমারেখা নির্ধারণ, হজ্জব্যবস্থা, বন

Dhaka University Institutional Repository

বিভাগ, কৃষি ও শিল্প, আবগারী ও রেজিস্ট্রেশন। ১৯২৯ সালে আবগারী ও রেজিস্ট্রেশন তাঁর নিকট থেকে অপর সদস্যের নিকট হস্তান্তরিত করা হয়। একজিকিউটিভ্ কাউন্সিলের সদস্যরূপে তিনি প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় তাঁর বিভাগগুলোর দায়িত্ব পালন করতেন। তিনি ব্যবস্থাপক সভায় দলপতি ছিলেন।

সভা-সমিতির সদস্যরূপে

নওয়াব আলী চৌধুরী প্রায় একশ' সমিতি ও জনসেবামূলক সংগঠনের সাথে জড়িত থেকে শিক্ষা ও সমাজ সেবায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। আলোচিত উপরোক্ত সংগঠনগুলি ছাড়াও তিনি জড়িত ছিলেন -

১. বেঙ্গল ল্যান্ডহোল্ডার্স এসোসিয়েশন
২. বৃটিশ ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন
৩. ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি (ফেলো)
৪. ঢাকা ইউনিভার্সিটি কোর্ট
৫. স্যানিটারী বোর্ড অব্ বেঙ্গল
৬. মুসলিম ম্যারেজ রেজিস্টার্ড তত্ত্বাবধায়ক কমিটি
৭. পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের সেন্ট্রাল টেক্সট বুক কমিটি
৮. লন্ডন মস্ক কমিটি
৯. আঞ্জুমান-ই-ইসলামিয়া (ময়মনসিংহ)
১০. গভর্নিং বডি অব্ দি প্রেসিডেন্সী কলেজ (কলকাতা) ইত্যাদি।[৬৭]

একনজরে শিক্ষা বিস্তারে অবদান

তিনি নিম্নোক্ত প্রতিষ্ঠান তৈরী করে ইতিহাসের পাতায় অমর হয়ে আছেন।

১. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা
২. মোহামেডান হল স্থাপন
৩. মেধা বৃত্তি প্রকল্প চালু
৪. নওয়াব ইনস্টিটিউশন প্রতিষ্ঠা
৫. সোনাতলা আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়
৬. কোদালিয়া হাইস্কুল

Dhaka University Institutional Repository

৭. আলতাফী প্রেস স্থাপন
৮. মিহির ও সুধাকর পত্রিকা প্রকাশ
৯. প্রচারক ও ইসলাম প্রচারক পত্রিকা প্রকাশ
১০. বিভিন্ন গ্রন্থ প্রকাশে আর্থিক সাহায্য দান
১১. ধনবাড়ী কলেজ
১২. সাকিনা মেমোরিয়াল বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়
১৩. আসিয়া হাসান আলী মহিলা কলেজ
১৪. আফতাবুন্নেছা হাফিজিয়া মাদরাসা
১৫. কেন্দুয়া উচ্চ বিদ্যালয়
১৬. পাইস্কা উচ্চ বিদ্যালয়
১৭. পাইস্কা হাফিজিয়া মাদরাসা
১৮. পানকাতা ইসলামিয়া উচ্চ বিদ্যালয়
১৯. নিউস্কিম মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থা চালু
২০. কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন
২১. অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন
২২. মুসলিম ছাত্রদের ভর্তি কোটা নির্ধারণ ইত্যাদি।[৬৮]

একনজরে সমাজসেবায় অবদান

সমাজসেবায় অবদানের জন্য তিনি ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছেন। নিম্নে কতিপয় সমাজ সেবামূলক কাজের কথা উল্লেখ করা হলো।

১. দিঘী খনন
২. খাল সংস্কার
৩. আমবাগান তৈরী
৪. রাস্তাঘাট নির্মাণ
৫. কূপ খনন
৬. পানীয়জলের ব্যবস্থা
৭. ঈদগাহ পুকুর
৮. ধনবাড়ী বাজার
৯. কাচারী প্রতিষ্ঠা
১০. দান-সদকার ব্যবস্থা
১১. সামাজিক উন্নয়নে অর্থ দান

Dhaka University Institutional Repository

১২. ডাকঘর স্থাপন
১৩. টেলিগ্রাফ প্রতিষ্ঠা
১৪. সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাংকের শাখা চালু (বর্তমানে বিলুপ্ত)
১৫. ধনবাড়ী উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র
১৬. দরিদ্রদের মাঝে নিয়মিত খাদ্য বিতরণ
১৭. মসজিদ নির্মাণ
১৮. মিলাদ-মাহফিল ও ফাতেহা পাঠ অনুষ্ঠান
১৯. ম্যালেরিয়া ও কালাজ্বরের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ
২০. মুসলমানদের চাকুরীর ব্যবস্থাকরণ
২১. রিচার্স ট্রেনারী প্রতিষ্ঠা
২২. গোশালা স্থাপন
২৩. মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ
২৪. সুদী কারবার বন্ধকরণ
২৫. ঢাকা শহরের উন্নয়ন প্রভৃতি সমাজ সেবামূলক কাজ করেন।[৬৯]

খেতাব লাভ

নওয়াব আলী চৌধুরী বৃটিশ গভর্নমেন্ট কর্তৃক তাঁর স্বদেশ, স্বজাতি, শিক্ষা ও সমাজসেবার স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯০৬ সালে (২৯ জুন) 'খান বাহাদুর', ১৯১১ সালে (১১ ডিসেম্বর) 'নবাব', ১৯১৮ সালে 'সিআইই' এবং ১৯২৪ সালে 'নবাব বাহাদুর' খেতাবে ভূষিত হন।[৭০]

ইন্তেকাল

মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে নওয়াব আলী চৌধুরী অসুস্থ্য হন। তাঁর জীবনের সর্বশেষ জাতীয় কাজ ছিল হিজাব গ্রহণকারী হজ্জযাত্রীদের বিদায়-সম্ভাষণ জ্ঞাপন করা। তখন স্টীমারে তাঁদের বিদায় দিতে গিয়ে তিনি ভীষণ ঠাণ্ডায় আক্রান্ত হন। তাঁর এই অসুখ পরে নিউমোনিয়ায় রূপ লাভ করে। বহুমুখী কর্মতৎপরতার মধ্য দিয়ে ব্যস্ত জীবন যাপন করে তিনি পঁয়ষট্টি বছর বয়সে ১৯২৯ খ্রীস্টাব্দের ১৭ এপ্রিল মোতাবেক ১৩৩৬ সালের ৩রা বৈশাখ বুধবার সকালে তাঁর দার্জিলিংস্থিত 'ইডেন কাসল' নামক বাসভবনে ইন্তিকাল করেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন।

Dhaka University Institutional Repository

মৃত্যুকালে তিনি দুই পুত্র, দুই কন্যা এবং এক স্ত্রী-সৈয়দা সাঈদা আখতার খাতুন চৌধুরানীকে রেখে যান। তাঁকে ধনবাড়িস্থ নিজ গ্রামের মসজিদের উত্তর পার্শ্বে গম্বুজের অভ্যন্তরে ছোট একটি কক্ষে কবরস্থ করা হয়। তাঁর ওসীয়ত মোতাবেক মৃত্যুলগ্ন থেকে অদ্যাবধি তাঁর মাযারে দু'জন হাফেজ পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করে যাচ্ছেন।

নওয়াব আলী চৌধুরীর মৃত্যু তারিখ ১৯২৯ সালের ১৭ এপ্রিল কলকাতা-গেজেটের একটি অতিরিক্ত সংখ্যা প্রকাশিত হয়। তাতে গভর্নর বলেনঃ The government-in-Council has heard with deep regret of the death on April 17, at his Darjeeling residence of the Hon'ble Nawab Bahadur Saiyid Nawab Ali Chowdhury, Khan Bahadur, CIE of Dhanbari, Vice-President of the Executive Council. The Governor-in-Council desires to place on record his high appreciation of the services his deep sympathy with the Begum Saheba and her family in their great and irreparable loss. [৭১]

মরহুম চৌধুরী সাহেবের মৃত্যু উপলক্ষে বেঙ্গল গভর্নর স্ট্যানলি জ্যাকসন কর্তৃক বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থাপিত একটি শোক প্রস্তাব গৃহীত হয়। শোক প্রস্তাবে তিনি বলেনঃ "By his death Bengal has lost a true son of the Muhammadan Community, an adent and fearless patron"

মরহুমের মৃতু-তারিখে কলকাতা কর্পোরেশনের সাপ্তাহিক সভা চলছিল। তাঁর মৃত্যুসংবাদে ঐ সভা মুলতবী রাখা হয় এবং এক শোক-প্রস্তাব গৃহীত হয়। সভার কাজ মুলতবী রাখার নোটিস এসেছিল স্বরাজ্যদলের দিক থেকে, যাঁদের সঙ্গে রাজনীতি ক্ষেত্রে কোন কোন দিক থেকে নওয়াব আলী চৌধুরীর মতের মিল ছিল না। বিরুদ্ধবাদী রাজনীতিকদের কাছেও তাঁর সম্মান ও জনপ্রিয়তা ছিল। ঐ সভায় শচীন্দ্রনাথ মুখার্জী বলেনঃ He made his name as a sagacious member of the territorial aristocracy of Bengal. He worked his way up by virtu of his shrewdness and genial character. A Mohammadan of the old world type-affable and the pink of courtsey—the Nawab had an intense faith in the Bengali language and literature.

মুহম্মদ রফীক কর্পোরেশনের উক্ত সভায় মুসলমানদের পক্ষ থেকে একটি কাসীদা পাঠ করেন। তিনি বলেন, নওয়াব আলী চৌধুরী ছিলেন সকলের নাগালের মধ্যে। সকলের কাছেই তিনি ধরা দিতেন। মুহম্মদ রফীক আরো বলেন, মৃত্যুর কয়েক দিন পূর্বেই হাজীদের জাহাজে যান এবং তাঁদের কুশল জিজ্ঞাসা করেন। ঐ সভায় পি.এন.গুহ, জে.এ.এল, সোওয়ান, উন্‌সুদ্-দৌলাহ্ কে.সি রায় চৌধুরী, কর্পোরেশনের মেয়র ও ডেপুটি মেয়র বিদেহী আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে বক্তৃতা

Dhaka University Institutional Repository

করেন।[৭২]

ঢাকা প্রকাশে (২১ এপ্রিল, ১৯২৯) বলা হয়ঃ 'ধনবাড়ির অনারেবল নবাব বাহাদুর নবাব আলী চৌধুরী খাঁ বাহাদুর গত বুধবার (১৭ এপ্রিল) সকালে তাহার দার্জিলিংস্থ এডেন কাসেলের (Eden Castle) বাড়ীতে নিউমোনিযা রোগে পরলোকগমন করিয়াছেন। তার দেহ সমাহিত করবার জন্য তাঁর জন্মস্থান-ধনবাড়ি (ময়মনসিংহ) লইয়া যাওয়া স্থির হয়েছে। সপরিষদ বড়লাট আদেশ দিয়াছেন, মৃতের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য ঐ দিন বাঙ্গালার সমস্ত অফিস বন্ধ থাকিবে এবং সরকারী অফিসসমূহে অর্ধোত্তলিত পতাকা উড্ডীন করা হইবে।'

'বৃহস্পতিবার স্পেশাল ট্রেনে সমাহিত করার জন্য নবার আলীর মৃতদেহ ধনবাড়িতে লইয়া যাওয়া হইয়াছে। তাঁহার বাড়ী (দার্জিলিংস্থ) হইতে মিছিল করিয়া স্টেশনে লইয়া যাওয়া হয়। বাঙ্গালা সরকারের প্রতিনিধি এবং নবাব বাহাদুরের বন্ধু বান্ধব মিছিলে উপস্থিত ছিলেন। শুক্রবার স্পেশাল ট্রেনে শব পিংগলা পৌছিয়াছে। কনিষ্ঠ পুত্র (হাসান আলী চৌধুরী), পত্নী ও অন্যান্য লোক উহার সঙ্গে ছিল। নবাবের হাজার হাজার প্রজা শোকসন্তপ্ত চিত্তে স্টেশনে অপেক্ষা করিয়াছিল।'

মাসিক সওগাতে (কলিকাতা-বৈশাখ, ১৩৩৬) বলা হয়ঃ 'বঙ্গীয় শাসন পরিষদের সদস্য মাননীয় নবাব বাহাদুর নওয়াব আলী চৌধুরী আর ইহজগতে নাই। ..... নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী বাংলার মুসলমান সমাজের অন্যতম স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন। মুসলমান সমাজের গত ২৫ বৎসরের ইতিহাসের সহিত তাঁহার নাম অবিচ্ছেদ্যরূপে বিজড়িত থাকিবে। নানা সদগুণে নবাব সাহেব বিভূষিত ছিলেন। তাহার মধ্যে দানশীলতা একটা .....নবাব সাহেবের ব্যক্তিগত ভদ্রতাও অত্যন্ত প্রশংসনীয় ছিল। তাঁহার আরও একটা বিশেষ গুণ এই ছিল যে, স্বসমাজে স্বার্থ রক্ষা করিবার আগ্রহে তিনি ভিন্ন সমাজের লোকদের উপর কখনোই অবিচার করিতেন না।'

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশ

দ্বিতীয় অধ্যায়

১. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ ড., নওয়াব আলী চৌধুরীর জীবন ও কর্ম, ঢাকা (ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, ১৯৮৭) পৃষ্ঠা ১৯-৩১।

২. মোকররম আলী, সৈয়দ, মোহম্মদী, ২য় বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৬, পৃঃ ৫০৫।

৩. মোকাররম আলী, সৈয়দ, পূর্বোক্ত।

৪. নওয়াব আলী চৌধুরী, ধনবাড়ি এস্টেটের ওয়াকফনামা, পৃঃ ১২।

৫. মোকররম আলী, সৈয়দ, পূর্বোক্ত।

৬. ওয়াকফ নামা, পৃষ্ঠা নং ৬।

৭. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ ড., নওয়াব আলী চৌধুরীর জীবন ও কর্ম, ঢাকা (ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, ১৯৮৭) পৃষ্ঠা ১৮।

৮. ওয়াকফ নামা, পৃষ্ঠা নং ৫-৬

৯. ওয়াকফ নামা, পৃষ্ঠা নং ৭-৮।

১০. ওয়াকফ নামা, পৃষ্ঠা নং ৮-৯।

১১. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ ড., নওয়াব আলী চৌধুরীর জীবন ও কর্ম, ঢাকা (ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, ১৯৮৭) পৃষ্ঠা ২৩-২৪।

১২. ওয়াকফ নামা, পৃষ্ঠা নং ৪।

১৩. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ ড., নওয়াব আলী চৌধুরীর জীবন ও কর্ম, ঢাকা (ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, ১৯৮৭) পৃষ্ঠা ৩০।

১৪. Who'o who in India, pt. V, Luckow Coronation Edition, 1911,p.27 Bogra District Gazzetteers, 1979, P.215; ওয়াকিল আহমদ, উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা , ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৩, পৃঃ ৯৬; নওয়াব আলী চৌধুরী, ওয়াকফনামা, ধনবাড়ী এস্টেট, কলিকাতা, ১৯২৯, পৃঃ Englishman, March 21, 1894

১৫. ওয়াকফ্নামা, পূবোক্তা, পৃঃ ১১; সৈয়দ মোকারম আলী, মাসিক মোহাম্মদী জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৬)

16. Muslims in India, Vol. I, Naresh Kumar Jain (ed), Manohar Publications, New Delhi, 1976; Syed Mohammad Taifoor: "Nawab Bahadur Syed Nawab Ali Chowdhury C.I.E. (unpublished); Hannan, M.A., Mohammad Ali (Bogra), Sahitya Kutir, Bogra, East Pakistan, 1967; Proceedings of the Bengal Legislative Council, 1922-1944; Official Report of the Bengal Legislative Council Debates, August 8, 1944, Pp. 1589-92; Waqf-Nama by Syed Nawab Ali Chowdhury, Calcutta, 1929

17. মোকররম আলী, সৈয়দ, পূর্বোক্ত।

18. Moslem Chronicle, December 30-31, 1899.

১৯. Nawab Ali, Chowdhury, Syed, Preface to 'Vernacular Education in Bengal.' Calcutta 1900

২০. Ibid, Appendix-A,p.1.

Dhaka University Institutional Repository

২১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'মুসলমান ছাত্রের বাংগালা শিক্ষা', ভারতী, কার্তিক, ১৩০৭, পৃঃ ৩২০।

২২. Sufia Ahmed, Muslim Community in Bengal (1884-1912), Dacca, 1947, P.87.

২৩. মোকররম আলী, সৈয়দ, পূর্বোক্ত।

২৪. Sufia Ahmad, op. cit, p. 319.

২৫. ওয়াকিল আহমদ, উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা (১), বাংলা একডেমী, ঢাকা, ১৯৮৩, পৃঃ ২০০।

২৬. Report of the Proceedings of the Frist Provincial Mohammedan Education Conference held at Rampore Boalia, Rajshahi on the 2nd & 3rd April, 1904, Pp. 6-9.

২৭. ইসরাম প্রচারক, ৮ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, বৈশাখ, ১৩১৪।

২৮. Nawab Ali Chowdhury, My appeal to my Constituencies, July 1923, Pp. 5-6.

২৯. Prospectus of the Provincial Mahomedan Education Conference, Eastern Bengal and Assam, 1906, P.13-26

৩০. মজীবুর রহমান খান, পাকিস্তান আন্দোলন ও মুসলিম সাহিত্য, ঢাকা বাংলা একাডেমী, ১৯৬৮, পৃঃ ১৮।

৩১. Matiur Rahman, Op. Cit, P.9

৩২. ভাষণটির জন্য দেখুন ঃ Report of the India Mohammedan Anglo-Oriental Education Conference, 1906, P.50-55.

৩৩. The Calcutta Gaztte, Pt, IV A, April 28, 1915, p.325.

৪. Pirzada, Sharifuddin, Foundations of Pakistan, Vol. I, Karachi, 1906, P.11.

২. Idib, P.33.

১. নওয়াব আলী চৌধুরী, পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতির কার্যবিবরণী ও সমালোচনা (১৯০৬-১২), কলিকাতা, এপ্রিল, ১৯১৪, পৃঃ ৩০-৩১।

Proceeding of the Annual Session, All India Muslim League, Delhi, January, 1910, P.90; Proceeding of the Annual Meeting, All India Muslim League, Calcutta, 1912, P.III; Proceedings of the Annual Meeting, All India Muslim League, Lucknow, 1913, P.106.

Proceeding of the Annual Meeting of the All India Muslim League, 1912, P.131; Proceesings of the Annual Meeting of the India Muslim League, Luckbow, 1913, Pp. 122-23.

Ibid, P.85

Pirzada (1) pp. 66-68

Ibid, Pp. 130-32.

Proceedings of the Imperial Legislative Council, Sept, 11, 1919, P.116.

Proceeding of the Annual Meeting of the All India Muslim League, Calcutta, 3rd & 4th Maerch, 1912, Complied by Syed Wazir Hasan & published by the All India Muslim, Lucknow, 1912, P.71.

. Pirzada (I), P.320

Dhaka University Institutional Repository

৪৫. Ibid Pp. 388-89.

৪৬. Broomfield J.H. Elite Conflict in a Plural Society London.. 1968. Pp 125-27

৪৭. The Eastern Bengal & Assam Gazzette, Part. VI, May. 1908. P.61.

৪৮. The Eastern Bengal & Assam Gazzette, Part. VI April 21. 1909. P.66-68.

৪৯. Ibid, April 12. 1911. P.81.

৫০. Ibid, April 2. 1913. P.530

৫১. The Calcutta Gazette, Part IV A. April 29. 1913. Pp. 533

৫২. The Eastern Bengal & Assam Gazette, Part IV A. April 2. 1913. P. 434.

৫৩. Ibid, P. 538

৫৪. Ibid, Pp. 824-25

৫৫. The Calcutta Gazette, Part IV A. April 28. 1915. Pp. 327.

৫৬. Ibid, Pp. 291-92

৫৭. Ibid, P. 294

৫৮. Nawab Ali Chowdhury, Syed. An Appeal to my Constituencies. M.P Works. 34, Mechue bazer Street, Calcutta. July. 1923. P.8.

৫৯. An Appeal to my Constituencies. op.cit. p.-4.

৬০. An Appeal to my Constituencies. op.cit Pp. 9-10.

৬১. Shila. Sen. P48.

৬২. Ibid. P.129

৬৩. Ibid. P.505

৬৪. Proceeding of the Indian Imperial Legislative Council. Feb 20. 1918. P.556

৬৫. Proceeding of the Indian Imperial Legislative Council. Sept. 3. 1919. P.25

৬৬. Ibid. Sept 3. 1919 P.29

৬৭. আব্দুস্ সাত্তার, মাওলানা, তারীখ-ই-মাদ্রসা-ই-আলিয়াহ্, ঢাকা ১৯৫৯, পৃঃ ৬১-৬৪

৬৮. Nawab Ali Chowdhury. An Appeal to my Contituencies. M.P Work. 34. mechue Bazar Street. Calcutta. july. 1923. P.18.

৬৯. An Appeal to my Constitencies. op. P. 17

৭০. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রত্রিকা, পঞ্চদশ সংখ্যা, আষাঢ়, ১৩৮৯/জুন, ১৯৮২, পৃঃ ১৯-২০

৭১. Proceedings. Bengal Legislative Council. 1929. Vol. XXXIII. P.15

72. The Statesman. Calcutta. April 18. 1929

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী'র শিক্ষা ও সমাজসেবা

নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী ছিলেন শিক্ষার পৃষ্ঠপোষক ও প্রসিদ্ধ সমাজ সেবক। তিনি আমৃত্যু মুসলিম জনসাধারণের শিক্ষা বিস্তারে আর্থিক, প্রাতিষ্ঠানিক ও প্রশাসনিক সুযোগ বৃদ্ধির জন্য বিশেষ ভূমিকা পালন করে গেছেন। উনবিংশ শতাব্দিতে নওয়াব আবদুল লতীফ ও স্যার সৈয়দ আহমদ মুসলিম শিক্ষাবিস্তারে যেরকম ভূমিকা পালন করেন, বিশ শতকে নওয়াব আলী চৌধুরী সে দায়িত্ব সম্পন্ন করেন। বাংলার প্রত্যেকটি শিক্ষা-সমিতি, শিক্ষা-কমিটি ও শিক্ষা আন্দোলনের সাথে জড়িত থেকে তিনি শিক্ষা বিস্তারে যথাযথ ভূমিকা পালন করেন। পূর্ববংগ ও আসাম প্রাদেশিক আইনসভা, বংগ প্রেসিডেন্সি আইনসভা, ভাইসরয়-কাউন্সিল ও বেঙ্গল এগজেকিউটিভ কাউন্সিলের সদস্য এবং বেঙ্গল গভর্নমেন্টের মন্ত্রীর দায়িত্ব পেয়ে বাংলার জনগণের কল্যানে নিরলসভাবে কাজ করে গেছেন। শিক্ষার উন্নতির জন্য তাঁর আগ্রহ ও সমাজসেবায় উদারতার কারণে নিম্নবর্ণিত সংগঠনগুলোর সদস্য পদ লাভ করতে সক্ষম হন। সংগঠনগুলোর মধ্যে অন্যতম হল- 'বংগীয় সাহিত্য বিষয়িনী মুসলমান শিক্ষা সমিতি'র প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি, 'মুসলমান ভার্নাকিউলার সাহিত্য সোসাইটি'র প্রেসিডেন্ট, 'পূর্ববংগ ও আসামের সেন্ট্রাল টেক্সট বুক কমিটি'র একমাত্র মুসলমান সদস্য, 'নিখিল ভারত মুসলমান শিক্ষা সমিতি'র সদস্য, 'পূর্ববংগ ও আসাম প্রাদেশিক শিক্ষা সমিতি' ও 'বংগ প্রেসিডেন্সী মুসলমান শিক্ষা সমিতি'র সেক্রেটারি, 'পূর্ববংগ ও আসাম প্রাদেশিক স্ত্রী-শিক্ষা কমিটি'র সদস্য ও এর শাখা– 'মুসলমান স্ত্রী-শিক্ষা কমিটি'র সেক্রেটারি, 'পূর্ববংগ ও আসাম প্রাদেশিক মাদরাসা সংস্কার কমিটি'র সদস্য, 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি, 'বেংগল প্রেসিডেন্সি মোহামেডান এডুকেশন্যাল অ্যাডভাইজারি কমিটি', ও 'শামসুল হুদা কমিটি'র সদস্যরূপে তিনি শিক্ষানীতি প্রণয়ন, মুসলিম শিক্ষাবিস্তারের উপায় উদ্ভাবন, পাঠ্যসূচী রচনা ও সংকলন ইত্যাদি বিষয়ে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন।

নওয়াব আলী চৌধুরী মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন, শিক্ষাই জাতির অগ্রগতি ও উন্নতির প্রথম সোপান।[১] বেকার জাতীকে উন্নতির শিখরে নিয়ে যেতে হলে শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। শিক্ষা বিভাগ পুলিশ বিভাগের মতই একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ। ১৮১৫ সালে 'মিহির ও সুধাকর' পত্রিকার প্রকাশনার মাধ্যমেই তাঁর কর্ম ও সমাজ জীবন আরম্ভ হয় এবং তখন থেকেই শিক্ষা ও সমাজ চেতনার উন্মেষ ঘটে। তদানীন্তন কালের মুসলিম সাহিত্যিক মুনশী আবদুর রহিম এর সম্পাদনায় প্রকাশিত 'মিহির ও সুধাকর' পত্রিকাটি মুসলমানদের ধর্মীয় চেতনা শাণিত করে তাদেরকে সমাজে প্রতিষ্ঠালাভের সুযোগ সৃষ্টিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। নওয়াব আলী চৌধুরী মনে করতেন যে,

Dhaka University Institutional Repository

মাতৃভাষার মাধ্যমে যে শিক্ষালাভ করা হয়, তার উপরই জাতির উন্নতি ও সমৃদ্ধি অনেকাংশে নির্ভর করে। নওয়াব আলী চৌধুরী সকল স্তরের মুসলিম শিক্ষা বিস্তারে বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষার উপরই তিনি সবচাইতে বেশি গুরুত্ব দিয়ে ছিলেন। এ শিক্ষাকেই তিনি গণশিক্ষা বিস্তারের উপায় এবং জাতীয় সভ্যতা বিকাশের সূতিকাগার বলে মনে করতেন। ১৯১১-১২ সালের বাজেট-বক্তৃতায় তিনি সরকারের নিকট মেধাবী ও গরীব শিক্ষার্থীদের জন্য বৃত্তির সংখ্যা ও অর্থ বৃদ্ধির আবেদন করেন এবং হাইস্কুলের স্বল্পতা নিরসনের প্রতি কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ১৯১৪ সালে 'বেংগল প্রেসিডেন্সি মুসলমান শিক্ষা সমিতি'র উদ্বোধনী অধিবেশনে সভাপতির ভাষণেও তিনি অনুরূপ কথা উচ্চারণ করেন এবং মুসলমান ছাত্রের ভর্তির জন্য কলেজে 'কোটা' নির্ধারণ এবং নতুন কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।২

বাংলার মুসলমানদের উচ্চশিক্ষার সুযোগ সৃষ্টিতেও নওয়াব আলী চৌধুরীর ভূমিকা ছিল অগ্রগন্য। ১৯১১ সালে রংপুরে অনুষ্ঠিত 'পূর্ববংগ ও আসাম প্রাদেশিক শিক্ষা সমিতি'র ৪র্থ বার্ষিক অধিবেশনের বক্তৃতায় তিনি উল্লেখ করেনঃ 'উচ্চ শিক্ষায় অগ্রসর হতে না পারলে আমাদের সমাজের উন্নতির আশা সুদূর-পরাহত এবং অনেক স্থলে আমাদের দাবি-দাওয়াও যুক্তিযুক্ত বলে বিবেচিত হবে না। অতএব আমাদের ছাত্রগণ যাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার থেকে প্রত্যাবর্তন না করে, তজ্জন্য আমাদেরকে বিশেষ তৎপর হতে হবে। কেবল নিম্ন শিক্ষায় পারদর্শী হলে আমাদের সমাজ অন্য সমাজের সাথে প্রতিযোগিতায় কিছুতেই দাঁড়াতে পারবে না– এটি যেন সভ্য মহোদয়গণের স্মরণ থাকে।' মুসলমানদের উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রশাসনিক বা প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিবন্ধকতার বিষয় তিনি প্রাদেশিক আইনসভা, কেন্দ্রীয় আইনসভা ও 'মুসলমান শিক্ষা সমিতি'র বিভিন্ন অধিবেশনে সরকার ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের গোচরীভূত করেন। সে সময় মাধ্যমিক স্কুল ও উচ্চশিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলো কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ন্ত্রণ করতো। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন কমিটিতে যেমন- সিনেট, সিন্ডিকেট এবং অফিসসমূহে মুসলমানদের কোন স্থান ছিল না। ১৯১৩ সালে বংগীয় আইনসভার বাজেট-বক্তৃতায় চৌধুরী সাহেব বলেন- 'কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬০ বছরের জীবনে কোন মুসলমান নির্বাচনের মাধ্যমে সিনেটে প্রবেশ করতে পারে নি, সিন্ডিকেটের প্রশ্ন তো উঠেই না।' ১৯১৪ সালে 'বেংগল প্রেসিডেন্সি মুসলমান শিক্ষা সমিতি'র উদ্বোধনী অধিবেশনে নওয়াব আলী চৌধুরী সভাপতির বক্তৃতায় বলেন- 'মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা নিয়ন্ত্রণের ভার অর্পিত হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর। অথচ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটে একজন মুসলমানও নেই। সিনেটে ১০০ জন সাধারণ সদস্যের মধ্যে মাত্র ৬ জন মুসলমান। বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিসে কোন মুসলমান অফিসার নেই।' ১৯২০ সালে ভারতীয় আইনসভার অধিবেশনে চৌধুরী সাহেব বলেন- ২৩টি কলেজের গভর্নিং-বডিতে কোন মুসলমান প্রতিনিধি নেই; ১০৬৫ জন কলেজিয়েট শিক্ষকের

Dhaka University Institutional Repository

মধ্যে মাত্র ৩৭ জন মুসলমান শিক্ষক রয়েছেন; ল-কলেজের ৭০ জন প্রভাষকের মধ্যে একজনও মুসলমান নেই। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মাত্র দু'জন মুসলমান প্রভাষক নিয়োজিত আছেন।' সঙ্গত কারণেই চৌধুরী সাহেব কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে 'সাম্প্রদায়িক বিশ্ববিদ্যালয়' আখ্যা দেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মুসলমানদের প্রতিনিধি না থাকায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ মুসলমানদের প্রতি কিরূপ আচরণ করেন, সে সম্পর্কে চৌধুরী সাহেব ১৯২০ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি ভারতীয় আইনসভায় দুঃখের সাথে বলেন- Sir, consistently with the principle that in the 'sacred temple of learning' there is no room for the consideration of sectarian grievances, the unbiassed, the impartial body of pure educationists did not condsider it worth their while even to condescend to favour the Musalmans with a reply. Repeated reminders, Sir, could not elicit even the ordinary courtesy of a formal acknowledgement. This deplorable state of affairs was due solely to the very poor representation of the Mussalmans in the different bodies of the University"

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনে মুসলমানদের প্রতিনিধি নির্বাচনের সুযোগ না থাকায় চৌধুরী সাহেব মনোনয়নের মাধ্যমে তাতে প্রতিনিধি নিয়োগের জন্য সরকারের নিকট দাবী জানান।

নওয়াব আলী চৌধুরী তাঁর রাজনৈতিক জীবনের শুরুতেই মুসলমানদের উচ্চশিক্ষার জন্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব অনুধাবন করেন। তিনি আলীগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটি ফান্ড-কমিটির সদস্য থাকাকালীন নওয়াব সলীমুল্লাহর মত আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়কে মুসলিম ভারতের জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বলে ভাবতেন। ময়মনসিংহে ১৯০৮ সালে অনুষ্ঠিত 'পুর্ববংগ ও আসাম প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতি'র দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনে সেক্রেটারির ভাষণে নওয়াব আলী বলেন- 'অত্র প্রদেশের মুসলমানগণের মধ্যে উচ্চশিক্ষা বিস্তার হওয়া সম্বন্ধে আমি যতদূর বিবেচনা করে দেখেছি, তাতে অত্র প্রদেশে একটি স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হওয়া কর্তব্য। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এ পর্যন্ত আমাদের প্রদেশ সেরূপ উপযুক্ত হয় নি, কারণ এ প্রদেশে কলেজের সংখ্যা অতি অল্প। বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের চেষ্টা করার পূর্বে কলেজ ও স্কুলের সংখ্যা বৃদ্ধির চেষ্টা করা একান্ত কর্তব্য। মুসলমানদের জাতীয় বিদ্যালয় বললে একমাত্র আলীগড় কলেজই বুঝায়।'

১৯১১ সালের ১৯ আগস্ট ঢাকার কার্জন হলে গভর্নর ল্যান্সলট হেয়ারের বিদায় এবং চার্লস বেইলীর শুভাগমন উপলক্ষে সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়। সভায় 'পূর্ববংগ ও আসাম প্রাদেশিক মুসলমান

Dhaka University Institutional Repository

সমিতি' এবং 'পূর্ববংগ ও আসাম প্রাদেশিক মুসলিম লীগ'-এর পক্ষ থেকে দু'টি মানপত্র পেশ করা হয়। নবাব সলীমুল্লাহ পাঠ করেন মুসলমান সমিতি'র মানপত্র এবং নওয়াব আলী চৌধুরী পাঠ করেন 'মুসলিম লীগের' মানপত্র । দু'টি মানপত্রে ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের দাবি অন্তর্ভুক্ত ছিল।[৩] কিন্তু ১৯১২ সালের ৩১ জানুয়ারীতে মুসলিম ডেপুটেশনের মানপত্রের উত্তরে লর্ড হার্ডিঞ্জ কর্তৃক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রতিশ্রুতি প্রদানের আগে পূর্ববাংলায় কোন ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠার দাবি শোনা যায় নি।

১৯১০ সালের ৫ এপ্রিল কাউন্সিল-সদস্য বাবু অনংগ মোহন সাহা যখন পূর্ববংগ ও আসাম-আইনসভায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের দাবি করেছিলেন কিন্তু তাঁর সে প্রস্তাব গৃহীত হয় নি। পূর্ববংগ ও আসাম প্রাদেশিক সরকারও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন।[৪] কিন্তু ভারত সরকার কর্তৃক তা গৃহীত হয় নি। লর্ড হার্ডিঞ্জ কর্তৃক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি প্রদানের পর নওয়াব সলীমুল্লাহ ও নওয়াব আলী চৌধুরী ঐ প্রতিশ্রুতির রূপায়ণে প্রাণপণ চেষ্টা করেন। নওয়াব সলীমুল্লাহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দেখে যেতে পারেন নি। নওয়াব আলী চৌধুরী তাঁর চেষ্টার ফল স্বচক্ষে দেখে গেলেন এবং মনের আনন্দও উপভোগ করলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পেছনে অবদান তো অনেকেরই রয়েছে, কিন্তু নওয়াব আলী চৌধুরীর মত এত বেশি অবদান আর কারুর আছে বলে মনে হয় না। সেই ১৯১১ সালের ৩১ জানুয়ারি অর্থাৎ যে দিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি ঘোষিত হয়, সে দিন থেকে ১৯২০ সালের ২৩ মার্চ অর্থাৎ যে দিন বড়লাটের আইনসভায় 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এ্যাক্ট' পাস হয়, সে দিন পর্যন্ত এর পেছনে নওয়াব আলী চৌধুরীর চেষ্টার বিরাম ছিল না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কমিটির সদস্যরূপে বিশ্ববিদ্যালয়ের নীল নক্শা অংকনে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি বেংগল প্রেসিডেন্সি আইনসভায়, অল-ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ-এর অধিবেশনে, বেংগল প্রেসিডেন্সি মুসলমান শিক্ষা সমিতির কর্মকান্ডে ও ইম্পিরিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য বেংগল গভর্নমেন্ট ও ইন্ডিয়া গভর্নমেন্টের উপর চাপ দিতে থাকেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি প্রণীত রূপরেখা বাস্তবায়িত করার জন্য তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করেন; বড়লাট ব্যবস্থাপক পরিষদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এ্যাকট পাসের জন্য গভর্নমেন্টের উপর চাপ সৃষ্টি করেন। গভর্নমেন্ট থেকে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার নিশ্চয়তা পাওয়ার পরেই তিনি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন এবং সর্বশেষে বিশ্ববিদ্যালয় এ্যাকট প্রণয়নের সময় মুসলিম স্বার্থ সংশ্লিষ্ট নীতিমালা নির্ধারণের আলোচনায় বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কাজকে বিলম্বিত হতে দেখে চৌধুরী সাহেব ১৯১৭ সালের ২০ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা-বিল যথাসত্বর উত্থাপনের জন্য ভারতীয় আইনসভায় দাবী পেশ করলে গভর্নমেন্টের পক্ষে শিক্ষা সচিব শঙ্করণ নায়ার বলেন- 'ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্ববিদ্যালয়-বিলের খসড়া প্রস্তুত রয়েছে; তবে গভর্নমেন্ট যুদ্ধ সংকটের মধ্যে ঐ বিলে হাত দিতে চান না।'

শিক্ষার ভারপ্রাপ্ত সদস্য মিঃ শফী ঢাকায় একটি স্বতন্ত্র আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের বিল উত্থাপন করেন ভারতীয় আইনসভার সিমলা-অধিবেশনে ১৯১৯ সালের ১১ সেপ্টেম্বর। নওয়াব আলী চৌধুরী বিলটিকে স্বাগত জানান। তিনি লর্ড হার্ডিঞ্জ কর্তৃক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি প্রদান থেকে বিলটির উত্থাপন পর্যন্ত বিভিন্ন ধাপের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেন। ভাষণে তিনি দাবি করেন যে, ৩১ জানুয়ারি, ১৯১২ তারিখে লর্ড হার্ডিঞ্জের সাথে সাক্ষাৎকারী মুসলিম প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তিনি নিজে। কিছু লোকের বিরোধিতা সত্ত্বেও বিলটি যথাশীঘ্র আইনে পরিণত হবে বলে তাঁর বিশ্বাস জন্মে। এতকাল পরে তাঁর নিজ চেষ্টা, পরিশ্রম ও লালিত স্বপ্ন বাস্তাবায়ন হতে দেখে তিনি উল্লসিত হযেছিলেন। আবেগাপ্লুত হয়ে তিনি বলেন, 'আজ এই আইনসভায় আমার চাইতে বেশি সুখী দ্বিতীয় আর কোন ব্যক্তি নেই।' তাঁর মূল ইংরেজী পাঠ হলো ঃ

It gives me intense pleasure to rise to-day to speak a few words generally in support of the bill .....As a matter of fact, I have been working for its success at considerable loss of time and energy, and have given myself no rest until, at last, to-day I see my dream fairly on the way to realisation. As a member of the Dacca University Committee of 1912, I promoted the idea as far as lay in my power and imparted an impetus to the movement. It is impossiible for me to give vent to the feelings of joy that are uppermost in my heart to-day. I shall not be far wrong, if I say that in this Council Chamber nobody is happier than I am at this moment.[৫]

১৯২০ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি ভারতীয় আইনসভার অধিবেশনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিলের খুঁটিনাটি পরীক্ষার জন্য 'সিলেক্ট কমিটি'-তে পাঠানোর সিদ্ধান্ত হয়। নওয়াব আলী চৌধুরী বিলে কয়েকটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করার দাবি জানান। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণাধিকার ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে গোটা পূর্ববংগের সকল স্কুল-কলেজ এর অন্তর্ভুক্ত করার দাবি করেন। তিনি বলেন, 'কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় যদি সপরীক্ষা পরিষদ হওয়া বাঞ্ছনীয় হয়, তবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য তা সমীচীন হবে না কেন?' প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ রায় কুমুদিনীকান্ত ব্যানার্জী বাহাদুর, ডঃ হীরালাল হালদার, প্রফেসর হেমচন্দ্রদাশ গুপ্ত, অতুলচন্দ্র সেন

Dhaka University Institutional Repository

মহামহোপাধ্যায় এবং প্রমথনাথ তারাভূষণও নওয়াব আলী চৌধুরী সাহেবের দাবীর সাথে একমত পোষণ করেন। তাঁর সে দাবী গৃহীত না হলে চৌধুরী সাহেব একটি সংশোধনী প্রস্তাব করেন যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-উভয়ের জন্য ১০ মাইল বৃত্তাকারের একটি নিরপেক্ষ এলাকা রাখা হোক, যাতে ঐ এলাকার মধ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কোন কলেজ স্থাপন করতে না পারে এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাব খর্ব করার সুযোগ না পায়। তাঁর এ প্রস্তাব ভোটে নাকচ হয়ে যায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের সুপারিশ সত্ত্বেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিলে ফ্যাকালটি অব মেডিসিন ও ফ্যাকালটি অব এ্যাগ্রিকালচারকে অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি, যদিও সিলেক্ট কমিটি এ দু'টি ফ্যাকালটিকে বিলের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। নওয়াব আলী চৌধুরী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিলের সমালোচনা করেন এবং সিলেক্ট কমিটির ঐ পদক্ষেপ সমর্থন করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের সুপারিশ থাকার পরও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিলে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন প্রশাসনিক সংস্থায় নির্বাচনের মাধ্যমে মুসলমান প্রতিনিধি নিয়োগের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত হয় নি। নওয়াব আলী চৌধুরী বিষয়টি তুলে ধরলে আইনসভা কর্তৃক তা সমর্থিত হয় এবং এ্যাক্টে পরিণত হয়। হিন্দু সদস্যগণ তাঁর এ দাবি সমর্থন করলে তিনি তাঁদের ধন্যবাদ জানান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধিক সংখক মুসলিম শিক্ষক নিয়োগের জন্য তিনি গভর্নমেন্টের নিকট দাবী করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের উল্লেখ থাকার পরও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিলে স্থানলাভ না করায় চৌধুরী সাহেব ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, 'অর্ডিন্যান্স বা রেগুলেশনের মাধ্যমে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ খোলার পথ উন্মুক্ত থাকলেও তা নিশ্চিত পন্থা নয়। তাই এই বিভাগের গুরুত্বের নিরিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিলে এর বিশেষ উল্লেখ থাকা আবশ্যক।' তাঁর এ সংশোধনী প্রস্তাব গৃহীত হয়। ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অভিনব সৃষ্টি। উপমহাদেশে কোথাও এর নজীর ছিল না। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এখনো এরূপ কোন বিভাগ নেই।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিল মতামতের জন্য ১৯২০ সালের ১৮ মার্চ আইন পরিষদে পেশ করা হয় এবং সর্বসম্মতিক্রমে আইনে পরিণত হয়। ২৩ মার্চ 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এ্যাকট' গভর্নর জেনারেল কর্তৃক অনুমোদিত হয়। ১৯২১ সালের জুলাই মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আনুষ্ঠানিকভাবে আরম্ভ হয়। ১৯১২ সালের ৩১ জানুয়ারি লর্ড হার্ডিঞ্জ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ওয়াদা করেন। ২ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সুপারিশ সম্পর্কিত ভারত সরকারের একটি ইশতিহার প্রকাশিত হয়। ভারত-সচিবের অনুমোদন লাভের পর ভারত সরকার ৪ এপ্রিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। ২৭ মে বেংগল গভর্নমেন্ট, প্রস্তাবিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি'

Dhaka University Institutional Repository

গঠন করেন। কমিটি পরবর্তী শরৎকালে (১৯১২) রিপোর্ট প্রকাশ করেন। ১ম বিশ্বযুদ্ধজনিত কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা বিলম্বিত হয়। ১৯১৭ সালের ২০ মার্চ নওয়াব আলী চৌধুরী ভারতীয় আইনসভায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা বিল উত্থাপনের জন্য প্রস্তাব দেন। ২৩ মার্চ গভর্নর জেনারেল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশু প্রতিষ্ঠার কথা স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেন। ৬ জুলাই ভারত সরকার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন গঠনের কথা ঘোষণা করেন। ১৪ সেপ্টেম্বর কমিশনের সদস্যদের নাম ঘোষিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কমিটির রিপোর্টটি বিবেচনার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের নিকট পেশ করা হয়। ১৯১৯ সনের মার্চ মাসে কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। সে বছর ১১ সেপ্টেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিল ভারতীয় আইনসভায় উত্থাপিত হয় এবং ১৯২০ সালের ১৮ মার্চ আইনে পরিণত হয়। ২৩ মার্চ গভর্নর জেনারেলের অনুমোদন লাভ করে। লর্ড হার্ডিঞ্জ কর্তৃক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দানের প্রায় এক দশক পর ১৯২১ সালের জুলাই মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কার্যক্রম শুরু হয়।

নওয়াব আলী চৌধুরী দেশের শিক্ষার উন্নতির জন্য স্ত্রীশিক্ষার অগ্রগতিকে অপরিহার্য বলে মনে করতেন। ১৯০৮ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি পূর্ববংগ ও আসাম প্রাদেশিক সরকার স্ত্রী-শিক্ষার উন্নতিকল্পে আর. ন্যাথানের নেতৃত্বে 'ফীমেল এডুকেশন কমিটি' গঠন করেন। নওয়াব আলী চৌধুরীসহ সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষ ঐ কমিটিতে সদস্য ছিলেন। তাঁরা স্ত্রী-শিক্ষার উন্নতির জন্য গভর্নমেন্টের নিকট কিছু প্রস্তাব করেন এবং কমিটির প্রচেষ্টায় স্ত্রী-শিক্ষার যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়।

ফীমেল এডুকেশন কমিটির অধীনে মুসলমান স্ত্রী-শিক্ষার জন্য একটি স্পেশাল সাব-কমিটিও গঠন করা হয়। নওয়াব আলী চৌধুরী ছিলেন সাব-কমিটির সেক্রেটারি। এছাড়া ঢাকার নবাব বাহাদুর খাজা সলীমুল্লাহ, চট্টগ্রামের স্কুল-ইন্সপেকটর মৌলবী আহছান উল্লাহ ও কলকাতার 'মোসলেম ক্রনিক্যাল' পত্রিকার সম্পাদক মৌলবী আবদুল হামীদ বি. এ. প্রমূখ সদস্য ছিলেন। সাব-কমিটি ঢাকা শহরের প্রাইমারী বালিকা বিদ্যালয়গুলোর সুবন্দোবস্ত, বাংলা ও ইংরেজী স্কুলে শিক্ষয়িত্রী নিয়োগ ও তাঁদের বেতনের হার ইত্যাদি বিষয় বিবেচনার জন্যে সুপারিশ পেশ করেন। মুসলমান শিক্ষয়িত্রীদের জন্য ট্রেনিং স্কুল স্থাপন এবং মুসলমান-প্রধান এলাকায় মহল্লা-ক্লাস প্রবর্তনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তা ছাড়া ছাত্রীদের বৃত্তি প্রদান ও স্কুল স্থাপনেরও প্রস্তাব দেন। এই সাব-কমিটি সরকারী ব্যয়ে ঢাকায় একটি কেন্দ্রীয় বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন, ঢাকায় ইডেন গার্লস হাইস্কুলের সাথে একটি হোস্টেল প্রতিষ্ঠা এবং বগুড়া জেলার যে কোন একটি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের প্রাদেশিকীকরণ ইত্যাদির জন্য সুপারিশ করেন। জেনারেল কমিটি সাব-কমিটির প্রস্তাবগুলো গ্রহণ করেন। ভারত গভর্নমেন্টও জেনারেল কমিটির সুপারিশসমূহ সমর্থন করেন।

Dhaka University Institutional Repository

নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সম্ভবতঃ শিক্ষাদীক্ষায় মুসলমানদের পশ্চাৎপদতা ও দরিদ্রতার প্রেক্ষিতেই বিশ্ববিদ্যালয়-শিক্ষা ও ব্যয়বহুল আইন শিক্ষা, কারিগরি শিক্ষা বা মেডিক্যাল-ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন নি। ১৯১৩ সালের ১৪ মার্চ বংগীয় আইন সভায় বাজেট-আলোচনায় তিনি ১৮৯৯ থেকে ১৯০৯ সাল পর্যন্ত কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার পরিসংখ্যান উল্লেখ করে মুসলমান ছাত্রদের পশ্চাৎপদতার জন্য দুঃখ প্রকাশ করে বলেন ঃ On closer scrutiny, we find that there has been appreciable decrease in the number of Muhammadan students in technical and professional institutions. It is a serious state of affairs for a community and I hope we must take timely note of it.[৬]

চৌধুরী সাহেব ১৯১৪ সালের ১৪ এপ্রিল 'বেংগল প্রেসিডেন্সি মুসলমান শিক্ষা সমিতি'র উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতির ভাষণে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় মুসলমানদের নৈরাশ্যজনক পশ্চাৎপদতার কথা উল্লেখ করে বলেন- 'মুসলমান গ্রেজুয়েটরা প্রয়োজনীয় বৃত্তিমূলক পেশা অবলম্বনের চাইতে প্রশাসনিক চাকরি-বাকরি করার বেশি পক্ষপাতী। এই মানসিকতা তাঁদের থাকা উচিত কিনা, সে বিষয়ে তাঁদের চিন্তা-ভাবনা করা উচিত।' তিনি আরো বলেন- 'আইন-শিক্ষায় মুসলমানদের সংখ্যা বাড়লেও আইন-পেশার দিকে তাঁরা ঝুঁকছেন না। মেডিক্যাল, ইঞ্জিনিয়ারিং ও টেকনিক্যাল শিক্ষার প্রতি তাঁদের অবহেলা খুবই নৈরাশ্যজনক।' ১৯১৩ সালের ১৪ মার্চ বংগীয় ব্যবস্থাপক পরিষদে বাজেট-বক্তৃতায় নওয়াব আলী চৌধুরী মুসলমানদের শিক্ষার উন্নতির জন্য নিম্নের প্রস্তাব পেশ করেনঃ

a) That a substantial sum out of the provision of Rs. 24.80.000 entered for expenditure during 1913-4 from the Imperial nonrecurring Educational grant of Rs. 75,00,000, be applied-

i) Towards providing better facilities for the education of Muhammadan boys in existing colleges, schools and madrasas and.

ii) Towards starting new educational institutions with similar facilities in centres of Muhhamadan population; and

b) That a fair and reasonable amount out the recurring educational grant (Rs. 13,20,000) be appropriated in that behalf.[৭]

Dhaka University Institutional Repository

প্রস্তাব প্রসংগে তিনি দীর্ঘ ভাষণের মধ্যে দুঃখ করে বলেন- 'অর্ধ শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে বৃটিশ গভর্নমেন্ট এ দেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিস্তারের চেষ্টা করে আসছেন এবং প্রধানত এ প্রদেশেই তাঁদের জ্ঞান-সম্পদ পুঞ্জীভূত হয়েছে। অথচ মুসলমানরা এখনো আধুনিক শিক্ষায় অভীষ্ট পর্যায়ে উত্তীর্ণ হতে পারে নি; তারা এখনো মূর্খতার অন্ধকারে নিমজ্জিত রয়েছে; মুসলমানদের শিক্ষোন্নয়নে বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বনের কথা অর্ধ শতাব্দীকাল পূর্বেও শোনা গেছে, কিন্তু মুসলমানদের জোরালো দাবি সত্ত্বেও বাস্তবে যতটুকু করার প্রয়োজন ছিল, তা করা হয় নি। আমরা এখন গভর্নমেন্টের কাছে বিশেষ কোন অনুদান চাই না; অন্য সম্প্রদায়ের চাইতেও বেশি কিছু চাই না; আমরা শুধু চাই আমাদের ন্যায্য দাবি প্রতিষ্ঠিত হোক।' তাঁর ভাষায়-

My resolution merely wants new educational institutions in centres of Muhammadan population. It wants grant of money to bring about reforms in the existing Madrasas and Maktabs and to start new ones wherever there seems to be any demand. It demands facilities in the shape of hostels, stipends, new colleges, schools, remission of fees and in such other ways as the Government may think it proper and necessary.

In asking for this I need not make any apology. It is so little to give and so much to receive that I hope the Government will be pleased to accept it. My Lord, of late there has been much talk of special treatment and special privileges. We do not want here any such thing. We do not want that the Government should educate us more than others. We do not want to enjoy the loaves and fishes of anything.[৮]

আধুনিক শিক্ষা বিস্তারে মুসলিম নেতৃবৃন্দের ভূমিকা

স্যার সৈয়দ আলীগড়ে ১৮৭৫ সালে আলীগড় হাইস্কুল এবং ১৮৭৭ সালে আলীগড় কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। কলেজটি ১৯২০ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত হয় এবং তা 'আলীগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটি' নামে অভিহিত হয়। আধুনিক শিক্ষা প্রদানের জন্য ভারতে প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের মধ্যে আলীগড় স্কুল, আলীগড় কলেজ ও আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় ছিল অবিমিশ্র আধুনিক শিক্ষার প্রাচীনতম মুসলিম প্রতিষ্ঠান। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে অবিমিশ্র ইংরেজী

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষার জন্য কোন মুসলিম স্কুল বা কলেজ ছিল না। ঢাকায় মুসলিম হাইস্কুল স্থাপিত হয় ১৯১৬ সালে এবং চট্টগ্রামেও মুসলিম হাইস্কুল প্রতিষ্ঠা লাভ করে একই সালে। উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে চাঁদা সংগ্রহ করে স্যার সৈয়দ আলীগড় কলেজ স্থাপন করেন। ঢাকার নওয়াব আবদুল গনী ও নওয়াব আহসানুল্লাহ ঐ কলেজ প্রতিষ্ঠায় অর্থ-সাহায্য দিয়েছিলেন। আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনেও বাংলার নেতৃবৃন্দের সাহায্য-সহযোগিতা ছিল। নওয়াব সলীমুল্লাহ ও নওয়াব আলী চৌধুরী আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের আন্দোলনে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। লক্ষণীয় হলো- স্যার সৈয়দ আলীগড় কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য চাঁদা ভিক্ষার ঝুলি হাতে নিয়েছিলেন এবং এ শুভকাজে বাংলাকেও প্রভাবিত করতে পেরেছিলেন। কিন্তু বাংলার দুর্ভাগ্য হলো- এখানকার কোন নেতা বাংলার আধুনিক শিক্ষা বিস্তারের জন্য ঐ স্তরে অবতীর্ণ হতে পারেন নি এবং স্বীয় অঞ্চলের স্বার্থে উপমহাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের মুসলিম নেতৃবৃন্দের সাহায্য-সহানুভূতি লাভে সক্ষম হন নি। বাংলার আধুনিক শিক্ষা বিস্তারে আলীগড় কলেজ বা আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যক্ষ প্রভাব না থাকলেও পরোক্ষ প্রভাব অবশ্যই ছিল। বাংলার বেশ কিছু লোক আলীগড়ে উচ্চশিক্ষা লাভ করেন। ঢাকার খাজা নাযিম উদ্‌দীন আলীগড় কলেজ থেকে বি. এ পাস করেন। ঢাকার নওয়াব পরিবারের নওয়াবজাদা আহসানুল্লাহ্, খাজা লতীফুল্লাহ, খাজা হাসান আস্‌কারী, খাজা শাহেদ প্রমুখ আলীগড় কলেজ ও আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্জন করেন।

উপর্যুক্ত আলোচনা হতে প্রতিভাত হয়ে থাকবে যে, মুসলিম সমাজে আধুনিক শিক্ষা বিস্তারের জন্য কেবল সরকারের দিক থেকেই চেষ্টা করা হয় নি, মুসলিম নেতৃবৃন্দের দিক থেকেও এ ব্যাপারে অনেক কাঠ-খড় পোড়ানো হয়েছে। ১৭৭৮ থেকে ১৯১২ পর্যন্ত বাংলা তথা ভারতের রাজধানী ছিল কলকাতায়। পূর্ববংগের শীর্ষস্থানীয় নেতাগণ সেখানে অবস্থান করে সভা-সমিতি পরিচালনা করতেন। মুসলিম নেতৃবৃন্দ কখনো ব্যক্তিগতভাবে, আবার কখনো সরকারী কর্মকর্তারূপে স্বজাতির স্বার্থের প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করেন। তাঁরা সভা-সমিতি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মুসলিম সম্প্রদায়ের অভাব-অভিযোগ সরকারের গোচরীভূত করেন এবং সেগুলোর প্রতিকারের জন্য কর্তৃপক্ষের উপর চাপ সৃষ্টি করেন। কর্তৃপক্ষ কখনো বা তাঁদের আবেদনে সাড়া দিতেন, আবার হয়তো বা কুম্ভকর্ণ সেজে বসতেন। কিন্তু নেতৃবর্গ তাঁদের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখে দাবি আদায়ের পথ খুঁজে নিতেন।

Dhaka University Institutional Repository

হান্টার শিক্ষা কমিশনে মুসলিম শিক্ষার উন্নতি বিধানের সুপারিশ

উপমহাদেশের সামগ্রিক শিক্ষা পরিস্থিতি তদন্ত করার জন্য ১৮৮২ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি বড়লাট রিপন কর্তৃক ডব্লিউ ডব্লিউ হান্টারের নেতৃত্বে 'হান্টার শিক্ষা কমিশন' গঠিত হয়। কমিশনে সাক্ষ্য দেয়ার জন্য মুসলমানদের মধ্যে স্যার সৈয়দ, নওয়াব আবদুল লতীফ, সৈয়দ আমীর আলী প্রমুখ আমন্ত্রিত হন। বাংলা-বিহারের মুসলিম শিক্ষার প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ স্তরের হাল-হকিকত, সেগুলোর উন্নতি বিধানের সর্বোৎকৃষ্ট উপায় উদ্ভাবন এবং এ দু'টি প্রদেশের মুসলিম সমাজকে দেশীয় কোন্ কোন্ ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেয়া উচিত- এসব বিষয়ে নওয়াব আবদুল লতীফ কমিশনে সাক্ষ্য দেন। ঐ সাক্ষ্যে তিনি বলেন ঃ

"উচ্চ পদের সরকারি চাকরি লাভের চাবিকাঠি হলো উচ্চ শিক্ষা। যেসব পেশা জ্ঞান সম্পর্কিত, সেগুলোর জন্যও উচ্চ শিক্ষা আবশ্যক। সুতরাং মুসলমান সম্প্রদায় যাতে উচ্চ শিক্ষা লাভের উপযুক্ত সুযোগ-সুবিধা পায়, গুরুত্বসহকারে তার ব্যবস্থা করা উচিত।"[৯]

এ সাক্ষ্যে নওয়াব আবদুল লতীফ কলিকাতা মাদ্রাসার অ্যাংলো-পার্সিয়ান শাখাকে পুনরায় কলেজ পর্যায়ে উন্নীত করার জন্যও সুপারিশ করেন। তদনুসারে গভর্নমেন্ট ১৮৮৩ সালে ঐ মাদ্রাসায় আবার কলেজ ক্লাস খোলেন। কিন্তু ফলপ্রসূ না হওয়ায় তা বন্ধ করে দেয়া হয়।[১০]

সৈয়দ আমীর আলী ঐ সাক্ষ্যে ভার্নাকিউলার শিক্ষা বন্ধ করে দেয়ার দাবি জানান এবং অবিমিশ্র ইংরেজী প্রচলনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন, আরবী শিক্ষার একটা ভারী বোঝা মুসলমান সম্প্রদায়কে চেপে রেখেছে। মিডল্ ও উচ্চ ক্লাসসমূহে ইংরেজীকে বাধ্যতামূলক না করে ১৮৭২ সালে বড় একটা ভুল করা হয়েছে। স্যার জর্জ ক্যাম্পবেল ১৮৭২ সালে প্রাচ্য শিক্ষার উন্নতির জন্য যে নীতি গ্রহণ করেছিলেন, তার ব্যর্থতা নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয়েছে। বিগত পঞ্চাশ বছরে মুসলমানেরা যে গৌরব হারিয়ে ফেলেছে, তা একমাত্র ইংরেজী শিক্ষার মধ্য দিয়েই পুনরুদ্ধার করা যেতে পারে। এবার আমীর আলীর ভাষায় বলা যাক ঃ

A dead weight, however, seems still to press down the Moslem community. The mistake which was committed in 1872, was not to make English compulsory on all students who sought middle class and high education. The consequence is that the only kind of education which is necessary to enable them to retrieve the ground they had lost within the last 50 years, is in a most unsatisfactory condition. I think, it has been satisfactorily proved that the scheme

Dhaka University Institutional Repository

devised by Sir George Campbell in 1872 to promote a purely Oriental education among the Moslems, has proved a practical failure.[১১]

হান্টার কমিশন কর্তৃক সকলের সাক্ষ্য গ্রহণের পর গভর্নমেন্ট যে রেজলিউশন প্রকাশ করেন, তাতে স্বীকার করে নেয়া হয় যে, দেশের বিভিন্ন অংশে মুসলিম সমাজ সত্যসত্যই হিন্দুদের তুলনায় অনেক পেছনে পড়ে রয়েছে। শিক্ষা কমিশনের সদস্যগণ তাঁদের রিপোর্টের উপসংহারে মুসলিম শিক্ষার উন্নতির জন্য যেসব সুপারিশ করেছিলেন, তার অনেকটাই মুসলিম শিক্ষার জন্য ছিল ফলপ্রসূ।

পূর্ববংগ ও আসাম প্রাদেশিক শিক্ষা সমিতি ও আধুনিক শিক্ষাবিস্তার

প্রথম বার্ষিক অধিবেশন

বংগ-বিভাগের ফলে 'পূর্ববংগ ও আসাম প্রদেশ' সৃষ্টি হলে এই নতুন প্রদেশে 'নিখিল ভারত মুসলমান শিক্ষা সমিতি'র শাখা খোলার প্রশ্ন দাঁড়ায়। নওয়াব সলীমুল্লাহ্ ও নওয়াব আলী চৌধুরীর উদ্যোগে ১৯০৬ সালের ১৪ই ও ১৫ই এপ্রিল ঢাকার শাহবাগে 'পূর্ববংগ ও আসাম প্রাদেশিক শিক্ষা সমিতি' গঠিত হয়। সলীমুল্লাহ ও নওয়াব আলী চৌধুরী যথাক্রমে এর স্থায়ী প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারি নির্বাচিত হন। বংগ-বিভাগ রহিত হওয়া পর্যন্ত (১৯১১) এর চারটি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এরপর বংগ প্রেসিডেন্সীতে নওয়াব সলীমুল্লাহর জীবদ্দশায় এ সমিতির মাত্র একটি অধিবেশন আহূত হয়। নতুন প্রদেশ গঠিত হলে মুসলিম সমাজে নব জাগরণের জোয়ার আসে। প্রথমেই মুসলিম নেতৃবৃন্দের দৃষ্টি পড়ে আধা-শিক্ষিত ও অশিক্ষিত জনগণের শিক্ষার অগ্রগতির উপর। তাই তাঁরা এ 'প্রাদেশিক শিক্ষা সমিতি' প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেন। বাংলাদেশে এটাই ছিল এ ধরনের প্রথম প্রতিষ্ঠান। 'মুসলিম ইনস্টিটিউট' জার্নালে এ সমিতির উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে সম্পাদক বলেন ঃ The Mohamedan leaders of Estern Bengal seem determined to take time by the forelock and to remove as shortly as possible the stigma of backwardness from the community.[১২] শিক্ষা সমিতির উক্ত প্রতিষ্ঠা সভায় সভাপতিত্ব করেন নওয়াব সলীমুল্লাহ। এ সভায় চার থেকে পাঁচ হাজার সুধী যোগদান করেন। নতুন প্রদেশের প্রত্যেক জেলা থেকে প্রতিনিধি আগমন করেন। পশ্চিম বংগ থেকেও অনেক গণ্যমান্য লোক সভায় যোগ দেন। কলকাতা থেকে মুসলিম ইন্স্টিটিউট-এর প্রতিনিধিরূপে এ. এফ. এম. আবদুল আলী, এম. এ. কামালুদ্দীন আহমদ, এম. এ. হাজী আবদুল কাইউম, ওলিউল ইসলাম ও সৈয়দ ফযলুর রহমান এতে যোগ দেন। আলীগড় কলেজ ও 'অল-ইন্ডিয়া মোহামেডান এডুকেশন্যাল কনফারেন্সে'র সেক্রেটারি নওয়াব মুহসিনুল মুল্‌কের উপস্থিতিতে সভার গৌরব বৃদ্ধি পায়। নওয়াব

Dhaka University Institutional Repository

সলীমুল্লাহ, খাজা মুহাম্মদ আসগর, স্কুল ইনস্‌পেক্টর মৌলবী আবদুল করীম, কুমিল্লার খানবাহাদুর সিরাজুল ইসলাম, মৌলবী মাহমুদুন নবী, নওয়াব আলী চৌধুরী ও সৈয়দ শামসুল হুদা সভায় বক্তৃতা করেন। সভায় গৃহীত ২০-টি প্রস্তাবের মধ্যে মাদ্রাসা শিক্ষার সংস্কার, সরকারী ও বেসরকারী দানে ঢাকায় একটি মুহাম্মদীয় হল বা হোস্টেল স্থাপন, প্রাইমারি স্কুলে পাঠ্যভুক্ত বাংলা সাহিত্য-গ্রন্থটি ভাষা ও বিষয়ের দিক থেকে মুসলিম শিক্ষার্থীদের জন্য উপযোগী নয় বলে বিকল্প পাঠ্য পুস্তক প্রণয়নের জন্য সরকারের প্রতি আবেদন, ভার্নাকিউলার সাহিত্য সৃষ্টির জন্য মুসলিম মনীষীদের উৎসাহদান, আরবী, ফার্সী ও অন্যান্য ভাষার মানসম্পন্ন পুস্তকাদি থেকে 'মুসলমানী বাংলায়' অনূদিত গ্রন্থাদি প্রকাশের উদ্দেশ্যে আর্থিক সাহায্যদানের জন্য সরকারের প্রতি আবেদন, স্কুলে কৃষক–সন্তানদের জন্য উপযোগী পাঠ্যসূচী প্রবর্তন, হাইস্কুল ও ভার্নাকিউলার স্কুলে ঐচ্ছিক বিষয়রূপে উর্দু বিষয়ের প্রবর্তন এবং মুসলিম সংখ্যানুপাতে নতুন প্রদেশের জন্য অর্থ বরাদ্দের আবেদন সংক্রান্ত সিদ্ধান্তগুলো ছিল উল্লেখযোগ্য।[১৩]

'প্রাদেশিক শিক্ষা সমিতি'র এই প্রথম অধিবেশন সার্থক ও সফল হয়। 'মুসলিম ইন্‌স্টিটিউট' জার্নালে ঐ অধিবেশন সম্পর্কে এই মন্তব্য করা হয় ঃ

Suffice it to say that the conference was as great a success as its best well-wishers could wish it to be, and the sincere thanks of the entire Mussulman community of both Bengals is due to the Hon'ble the Nawab Bahadur Khawja Salimolla, C.S.I., and Khan Bahadur Syed Nawab Ali Chowdhury for the time, energy and money they so readily devoted to this noble cause.[১৪]

পূর্ববংগ ও আসাম প্রাদেশিক শিক্ষা সমিতির প্রথম অধিবেশনে নিম্নলিখিত প্রস্তাবসমূহ গৃহীত হয়

১. এই প্রদেশের মুসলমানের উন্নতির শ্লথ গতি দুঃখজনক ব্যাপার। কিন্তু তারা, শিক্ষা যে উন্নতির মূল– এ বিষয়টি বুঝতে পারায় এবং তাদের মধ্যে ক্রমাগত জাগরণের অনুভূতি জাগায় এই সমিতি আনন্দ প্রকাশ করছে।

২. সমিতির মতে মাদ্রাসা শিক্ষার সংস্কার করতে হবে এবং এ জন্য কি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়, তা বিবেচনা করার জন্য কতেক ভদ্রলোককে নিয়ে একটি কমিটি গঠন করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

৩. ঢাকা মাদ্রাসা ও চট্টগ্রাম মাদ্রাসার অ্যাংলো-পার্সিয়ান বিভাগে শক্তিশালী শিক্ষকমন্ডলী নিয়োগ করে তাকে দৃঢ় ভিত্তিক করতে হবে।

৪. ঢাকায় মুসলমান ছাত্রদের জন্য খেলার মাঠসহ এমন একটি হল বা হোস্টেল নির্মাণের আশু প্রয়োজন দেখা দিয়েছে, যাতে একজন ইউরোপীয় আবাসিক প্রভোস্ট থাকবে; তার সাথে আরো আবাসিক সহকারী থাকবে; একজন দক্ষ মৌলবী তাদের ধর্মীয় দিকের তদারক করবে এবং অধ্যয়নে ছাত্রদের সহায়তাদানের উদ্দেশ্যে কয়েকজন আবাসিক গৃহশিক্ষক নিয়োগ করা হবে।

৫. হল নির্মাণের প্রস্তাবকে বাস্তব রূপ দেয়ার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হোক, কমিটিকে সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধির ক্ষমতা দেয়া হোক, বিভিন্ন কেন্দ্রে সাব-কমিটি গঠন বা এজেন্ট নিয়োগের ক্ষমতা কমিটিকে দেয়া হোক। গভর্নমেন্টের কাছে আবেদন করার মত তহবিল গড়ে উঠলে ঐ বিষয়ে একটি স্মারকলিপি গভর্নমেন্টের নিকট পেশ করা হোক।

৬. সমিতি এই অভিমত ব্যক্ত করছে যে, প্রাইমারি স্কুলে ব্যবহৃত বাংলা পাঠ্য পুস্তকগুলো ভাষা ও বিষয়ের দিক থেকে মুসলমান বালকদের জন্য সম্পূর্ণ অযোগ্য। সুতরাং অন্যান্য বিষয়াদির পাশাপাশি মুসলিম মনীষীদের জীবন ও কর্ম নিয়ে লিখিত অসাম্প্রদায়িক প্রকৃতির পাঠ্যপুস্তক স্কুলে প্রবর্তন করার জন্য গভর্নমেন্টের নিকট আবেদন করা হোক।

৭. সমিতি এই মত পোষণ করছে যে, বাংলার মুসলমানদের জন্য ভার্নাকিউলার-সাহিত্যের উন্নতি বিধানের পদক্ষেপ নেয়া হোক। মুসলিম বালকদের প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রেখে মৌলিক বই লেখার জন্য মুসলমান পন্ডিতদের উৎসাহিত করা হোক। ফার্সী, আরবী ও অন্যান্য ভাষায় লিখিত মানসম্পন্ন বইয়ের বাংলা অনুবাদ প্রকাশের ব্যবস্থা করা হোক, এবং এসব বিষয়ে আর্থিক সাহায্য দেয়ার জন্য গভর্নমেন্টকে অনুরোধ করা হোক।

৮. শিক্ষা কমিশনের সুপারিশের নিরিখে এবং বাংলা সরকারের অনুমোদনের পরিপ্রেক্ষিতে মুসলমান ছাত্রদের জন্য নিম্নরূপ ধারাবাহিক বৃত্তি মন্জুর করা হোক ঃ

ক) প্রাইমারি স্কুলে প্রাপ্ত বৃত্তি ভোগ করা হবে মিডল স্কুল ও হাইস্কুলে।

খ) মিডল স্কুলে প্রাপ্ত বৃত্তি ভোগ করা হবে হাইস্কুলে।

গ) ম্যাট্রিকুলেশন, এফ. এ. এবং বি. এ. পরীক্ষার ফলের উপর ভিত্তি করে প্রাপ্ত বৃত্তি ভোগ করা হবে কলেজে।

Dhaka University Institutional Repository

৯. সরকার পরিচালিত বা সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলের প্রত্যেক শ্রেণীর কিছু সংখ্যক উপযুক্ত মুসলমান ছাত্রকে সম্পূর্ণ বিনাবেতনে বা আংশিক বেতনে অধ্যয়নের সুযোগ দেয়া হোক।

১০. ইংরেজী বিষয় বাধ্যতামূলক করে মিডল মাদ্রাসা স্থাপনের প্রস্তাবাবলী তৈরী করার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হোক এবং দক্ষ শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে মিঞাজীদের প্রশিক্ষণের জন্য একটি বিশেষ ক্লাস খোলা হোক।

১১. শহরের প্রাইমারি শিক্ষা এবং গ্রামের মক্তব শিক্ষার স্কীম প্রণয়নের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হোক।

১২. সমিতি এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করছে যে, কৃষি অঞ্চলের প্রাইমারি স্কুলে এমন স্কীমের শিক্ষা প্রবর্তন করার জন্য গভর্নমেন্টের কাছে আবেদন করা হোক, যাতে কৃষক শ্রেণীর সন্তানেরা তাদের পৈতৃক পেশায় সমৃদ্ধি অর্জন করতে পারে।[১৫]

২য় বার্ষিক অধিবেশন

১৯০৮ সালের ১৮ ও ১৯ এপ্রিল কলকাতার পুলিস ম্যাজিস্ট্রেট মৌলবী আবদুস সালামের সভাপতিত্বে সমিতির দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন মহাসমারোহে ময়মনসিংহে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় আনুমানিক তিন হাজার লোক যোগদান করেন। অনেক পদস্থ ইউরোপীয় রাজপুরুষ এ সময় উপস্থিত ছিলেন। অনেক হিন্দুও সমিতির কাজে সাহায্য করেন। এ অধিবেশনে যে ২২-টি প্রস্তাব গৃহীত হয়, তন্মধ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়, উচ্চবিদ্যালয় ও মক্তবসমূহের মুসলিম শিক্ষার্থীদের জন্য সমিতি কর্তৃক যথোপযোগী পাঠ্য পুস্তক নির্বাচন, উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের নিম্ন শ্রেণীর ছাত্রদের জন্য সরকারের কাছে ঐচ্ছিক উর্দু প্রবর্তন করার সুপারিশ, বৈষয়িক শিক্ষা, কারিগরি শিক্ষা ও উচ্চ গবেষণারত ছাত্রদের সাহায্যার্থে 'প্রাদেশিক শিক্ষা ধন-ভান্ডার' স্থাপন, মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নতিকল্পে সরকারী বৃত্তির দাবি উত্থাপন এবং প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে যথারীতি সেগুলোর বিতরণ, গভঃ হাইস্কুল ও এডেড্ হাইস্কুলের ছাত্রাবাস নির্মাণের জন্য সরকারের প্রতি আবেদন এবং জিলাস্কুল ও কতেক মধ্য-ইংরেজী স্কুলে একটি পৃথক শ্রেণী খুলে তাতে ছুতার, কর্মকার ও কুমারের কার্য, কৃষিবিদ্যা, কাপড় বুনন, সেলাই প্রভৃতি বিষয় শিক্ষাদানের জন্য সরকারের প্রতি অনুরোধ জ্ঞাপন ছিল গুরুত্বপূর্ণ। এ অধিবেশনে যোগদানকারী নেতৃবৃন্দের অনুরোধে জনগণ কর্তৃক গফরগাঁও ইসলামিয়া হাই স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯১০ সালে স্থানীয় শহরুল্লাহ্ ভূঞা নামক জনৈক ব্যক্তির বদান্যতায় কিশোরগঞ্জে কোদালিয়া হাইস্কুল স্থাপিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

পূর্ববাংলা ও আসাম প্রাদেশিক শিক্ষা সমিতির দ্বিতীয় অধিবেশনে নিম্ন প্রস্তাবসমূহ গৃহীত হয়

১. প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতির প্রথম বার্ষিক অধিবেশনের ৫ নং ও ৬ নং প্রস্তাবে যা গৃহীত হয়েছে, তার বাস্তবায়নের জন্য একটি সাব কমিটি গঠিত হোক। ঐ কমিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়, উচ্চবিদ্যালয় ও মক্তবের জন্য মুসলমান ছাত্রদের পাঠোপযোগী পুস্তক নির্বাচিত করবে। কমিটি এই সব পুস্তকের ভাষা এবং বিষয়ও বিবেচনা করবে। এ ছাড়া আসাম প্রদেশে সম্প্রতি যে পাঠ্যপুস্তক প্রবর্তিত হচ্ছে, এ দেশে তার উপযোগিতা সম্পর্কে কমিটি চিন্তা করবে এবং প্রয়োজনবোধে তাতে কিছুটা পরিবর্তন করে পূর্ববাংলার মুসলমান ছাত্রদের জন্য তা পাঠোপযোগী করা যায় কি–না, সে বিষয়টিও কমিটি খতিয়ে দেখবে।

২. মিডল মাদ্রাসা মুসলমানদের মধ্যে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। সুতরাং প্রত্যেক জেলায় এ ধরনের যথেষ্ট সংখ্যক মাদ্রাসায় উদারভাবে সাহায্য দেয়ার জন্য গভর্নমেন্টকে অনুরোধ করা হোক।

৩. প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের নিম্নশ্রেণীর ছাত্রদেরকে ঐচ্ছিক উর্দু অধ্যয়নের সুযোগ দেয়ার জন্য গভর্নমেন্টকে অনুরোধ করা হোক।

৪. প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতির জন্য একটি প্রাদেশিক শিক্ষা তহবিল গঠন করা হোক। প্রত্যেক জেলায় এর শাখা গঠন করা হোক। এই তহবিল হতে উপযুক্ত মুসলমান ছাত্রদের বৈষয়িক শিক্ষা ও কারিগরি শিক্ষা অথবা বিশেষ কোন বিষয়ে মৌলিক গবেষণার জন্য সাহায্য করা হবে। প্রত্যেক মুসলমানকে তার আয়ের কিয়দংশ এবং সে ধর্মীয় কাজে যা ব্যয় করতে চায়, তার কতেকাংশ এই তহবিলে দান করার জন্য উৎসাহিত করা হোক।

৫. অর্থ বছর–শেষে শিক্ষা বিষয়ক বিবরণের সংগে মুহসিন ফান্ডের আয়-ব্যয়ের হিসাব পেশ করার জন্য গভর্নমেন্টকে অনুরোধ করা হোক।

৬. স্ত্রীশিক্ষা খাতে গভর্নমেন্ট প্রচুর অর্থ দিচ্ছেন। তাই মুসলমান বালিকাদের শিক্ষার জন্য তাদের বিশেষ প্রয়োজনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে মক্তবসমূহ খোলার চেষ্টা করা হোক।

৭. নিখিল ভারত শিক্ষা সমিতি তার সর্বশেষ অধিবেশনে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় পরিক্ষার্থীর নাম বাদ দিয়ে কেবল রোল নম্বর লেখার যে প্রস্তাব গ্রহণ করেছে, তা এই সমিতিও গ্রহণ করছে।

৮. গভর্নমেন্ট স্কুল ও সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলে মুসলমান-পর্বোপলক্ষে কতকগুলো সাধারণ ছুটি ও বিশেষ ছুটির ব্যবস্থা রাখার জন্য জনশিক্ষা পরিচালককে অনুরোধ করা হোক।

Dhaka University Institutional Repository

৯. জেলা বোর্ডের মডেল স্কুলগুলো বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রয়োজন ও চাহিদামত বিভিন্ন স্থানে স্থাপন করার জন্য সংশ্লিষ্ট বোর্ডগুলোকে অনুরোধ করা হোক এবং গভর্নমেন্ট সাহায্যপ্রাপ্ত সার্কেল স্কুলগুলো সম্বন্ধেও অনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য জনশিক্ষা পরিচালককে অনুরোধ করা হোক।

১০. গভর্নমেন্ট মাদ্রাসাগুলোর সাথে যুক্ত অ্যাংলো–পার্সিয়ান স্কুলের ব্যয়ভার প্রাদেশিক রাজস্ব থেকে বহন করার জন্য গভর্নমেন্টকে অনুরোধ করা হোক এবং এর ফলে মুহসিন ফান্ডের যে অর্থ উৎবৃত্ত হবে, তা আধুনিক পদ্ধতিতে পরিচালিত মাদ্রাসাগুলোর উন্নয়নে ব্যয় করা হোক।

১১. প্রাদেশিক রাজস্ব হতে মাদ্রাসার উন্নতিকল্পে বৃত্তি মঞ্জুর করার জন্য গভর্নমেন্টকে অনুরোধ করা হোক। এই বৃত্তিগুলো প্রতিযোগিতায় যারা উত্তীর্ণ হবে, তাদেরকে দেয়া হবে।

১২. প্রয়োজন মত গভর্নমেন্ট হাইস্কুল ও সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত হাই স্কুলগুলোতে সরকারী ফান্ড থেকে যথোপযুক্ত অর্থ নিয়ে মুসলমান ছাত্রদের জন্য হোস্টেল ও খেলার মাঠের বন্দোবস্ত করার জন্য গভর্নমেন্টকে অনুরোধ করা হোক।

১৩. দরিদ্র মুসলমান হোস্টেল–বোর্ডারকে মাসিক ২/- টাকা সাহায্য দেয়ার জন্য গভর্নমেন্টকে অনুরোধ করা হোক। তবে কোন হোস্টেলে ৫০/- টাকার বেশী সাহায্য দেয়া হবে না।

১৪. মুসলমান ছাত্রদেরকে মানবিক শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা, বিশেষত চিকিৎসা বিজ্ঞান ও ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে শিক্ষা দেয়ার জন্য রাজস্ব হতে যথেষ্টসংখ্যক বৃত্তি মঞ্জুর করার জন্য গভর্নমেন্টকে অনুরোধ করা হোক।

১৫. অত্র প্রদেশের জুনিয়ার মাদ্রাসা পাঠ–শেষে ছাত্রদের একটি বিভাগীয় পরীক্ষা নেয়া হোক এবং ফলাফলের ভিত্তিতে তাদেরকে কতগুলো বৃত্তি দেয়া হোক এবং এ মর্মে গভর্নমেন্টকে অনুরোধ করা হোক।

১৬. প্রয়োজন মত গভর্নমেন্ট হাইস্কুল ও সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত হাইস্কুলে অতিরিক্ত মৌলবী নিয়োগ করে আরবী শিক্ষায় আরো সুবিধা দেয়ার জন্য গভর্নমেন্টকে অনুরোধ করা হোক।

১৭. ১৯০৬ সালের ১৪ এপ্রিল পূর্ববংগ ও আসাম প্রাদেশিক শিক্ষা সমিতিতে মাদ্রাসার সংস্কারকল্পে যে সাব-কমিটি গঠিত হয়েছিল, ঐ কমিটি প্রদত্ত রিপোর্ট গ্রহণ করা হোক এবং তাতে বিবৃত রূপরেখা অনুসারে মাদ্রাসা সংস্কারের বিষয়টি আরো বিশেষভাবে বিবেচনা করার জন্য জনশিক্ষা পরিচালককে একটি শক্তিশালী কমিটি নিযুক্ত করতে অনুরোধ করা হোক।

Dhaka University Institutional Repository

১৮. ১৯০৬ সালের ১৪ এপ্রিল প্রাদেশিক শিক্ষা সমিতির অধিবেশনে মিডল মাদ্রাসা স্থাপনের এবং মিঞাজীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য যে কমিটি গঠিত হয়েছিল, তার রিপোর্ট গৃহীত হোক।

১৯. গভর্নমেন্টের নিকট অনুরোধ করা হোক যে, যে-সব মাদ্রাসা মুহসিন-ফান্ড হতে সাহায্য পাচ্ছে, বিশেষ স্থলে সেগুলোতে রাজকোষ হতেও সাহায্য করা হোক।

২০. জিলাস্কুল এবং কতেক মধ্যইংরেজী স্কুলে একটি পৃথক ক্লাস খুলে তাতে স্থানীয় শিল্প তথা ছুতারের কার্য, কর্মকারের কার্য, কুমারের কার্য, কৃষিবিদ্যা, কাপড় বুনন এবং সেলাইয়ের কার্য প্রভৃতি শিক্ষা দেয়ার ব্যবস্থা করার জন্য এবং ঐ ক্লাসের ছাত্রদেরকে প্রচুর সাহায্য দেয়ার জন্য গভর্নমেন্টকে অনুরোধ করা হোক।

২১. আরবী, ফার্সী ও উর্দু হতে ইংরেজী বা বাংলা অনুবাদের উত্তরপত্র পরীক্ষা করার জন্য, যদি পাওয়া যায়, তবে মুসলমান পরীক্ষক নিযুক্ত করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করা হোক।

২২. ঢাকা ও চট্টগ্রাম মাদ্রাসার ন্যায় অ্যাংলো-পার্সিয়ান বিভাগযুক্ত কোন মাদ্রাসা রাজশাহী বিভাগে নেই। কেবল একটিমাত্র উচ্চ মানের মাদ্রাসা ঐ বিভাগের মধ্যে সিরাজগঞ্জে আছে। অতএব স্যার ব্যামফিল্ড ফুলার সাহেবের অংগীকার অনুযায়ী ঐ মাদ্রাসার সংগে যুক্ত একটি হাইস্কুল স্থাপনের জন্য গভর্নমেন্টকে অনুরোধ করা হোক।১৬

প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতির দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনের প্রস্তাবানুসারে ফীমেল এডুকেশন কমিটি গঠন

১৯০৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে স্ত্রীশিক্ষার উন্নতিকল্পে পূর্ববংগ ও আসাম প্রদেশ-সরকার কর্তৃক রবার্ট ন্যাথানের নেতৃত্বে 'ফীমেল এডুকেশন কমিটি' গঠন করা হয়। ১৯০৮ সালের ১৮ ও ১৯ এপ্রিল ময়মনসিংহে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতির দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনের ৬ষ্ঠ মন্তব্যানুসারে এ কমিটির কাজ ত্বরান্বিত হয়। এ কমিটিতে নওয়াব সলীমুল্লাহ্ ও নওয়াব আলী চৌধুরীসহ কতিপয় খ্যাতনামা ও বিদ্যোৎসাহী ইংরেজ, হিন্দু ভদ্রলোক, হিন্দু মহিলা ও মুসলমান পুরুষ সদস্য নিযুক্ত হন। কমিটি তার প্রস্তাবসমূহ প্রাদেশিক সরকারের মাধ্যমে ভারত গভর্নমেন্টের কাছে প্রেরণ করেন। ভারত গভর্নমেন্ট ঐ সকল প্রস্তাব গ্রহণ করেন। এ কমিটির অধীনে ঐ বছরই 'সাব-কমিটি ফর মোহামেডান ফীমেল এডুকেশন কমিটি' গঠিত হয়। এই সাব-কমিটির প্রেসিডেন্ট

Dhaka University Institutional Repository

ও সেক্রেটারি ছিলেন যথাক্রমে নওয়াব খাজা সলীমুল্লাহ ও খানবাহাদুর নওয়াব আলী চৌধুরী; অপর দুইজন সদস্য ছিলেন চট্টগ্রামের স্কুল ইন্‌স্‌পেক্‌টর আহছান উল্লাহ এম. এ. এবং 'মোসলেম ক্রনিকল'-এর সম্পাদক আবদুল হামীদ বি. এ.। এ কমিটি ১৯১১ সাল পর্যন্ত কার্যকর থাকে। এ কমিটির চেষ্টায় স্ত্রীশিক্ষার প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। ১৯০৮-১৯১২ সালের কুইনকুইনাল রিপোর্টে জনশিক্ষা পরিচালক তা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন। মুসলমান সমাজে কিভাবে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার লাভ করতে পারে এবং এর পাঠ্য পুস্তকই বা কিরূপ হওয়া উচিত- এসব বিষয় বিবেচনার জন্য উক্ত মুসলমান সাব-কমিটি নিযুক্ত করা হয়। এই সাব-কমিটি শহরস্থ বালিকা বিদ্যালয়গুলোর সুবন্দোবস্ত, মধ্য বাংলা, মধ্য ইংরেজী স্কুল প্রভৃতির শিক্ষয়িত্রীর সংখ্যা ও তাদের বেতনের হার নির্ধারণ ইত্যাদি বিষয়ের নিরিখে মন্তব্য স্থির করেন। এই 'মুসলমান স্ত্রীশিক্ষা সাব-কমিটি' ছাত্রীদের বৃত্তিদান, বালিকা স্কুল স্থাপন ইত্যাদি বিষয়ও বিবেচনা করেন। এই সাব-কমিটি ঢাকা ইডেন স্কুলের (১৮৮০) মুসলমান বালিকাদের জন্য সেই স্কুল সংলগ্ন একটি উত্তম হোস্টেল নির্মাণের আবশ্যকতা উপলব্ধি করেন; রংপুর ও কুমিল্লার বালিকাদের শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করাও কর্তব্য মনে করেন। মুসলমানদের সামাজিক পর্দা-প্রথা রক্ষা করে যাতে বালিকারা নিজেদের ধর্ম সম্বন্ধে উপদেশ পেতে পারে এবং ইচ্ছা করলে উর্দু-ফার্সী শিক্ষা করতে পারে, সাব-কমিটি সেই ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যেও সুপারিশ করেন।[১৭] সাব-কমিটির সমষ্টিগত রিপোর্ট ছাড়াও নওয়াব আলী চৌধুরী স্বতন্ত্রভাবে 'ফীমেল এডুকেশন কমিটি'র বিবেচনার জন্য কতকগুলো মন্তব্য উপস্থাপিত করেন।

৩য় বার্ষিক অধিবেশন

১৯১০ সালের ২৬ মার্চ মৌলবী তসলীমুদ্দিন আহমদের সভাপতিত্বে বগুড়ায় সমিতির তৃতীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। সভায় আনুমানিক ৪০০ প্রতিনিধি ও ৪০০ দর্শক উপস্থিত ছিলেন। গণ্যমান্য উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী এবং অনেক হিন্দুও সভায় যোগদান করেন। এ অধিবেশনে গৃহীত ২৬টি প্রস্তাবের মধ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেট্রিকুলেশন পরীক্ষার আরবী-ফার্সীর পাঠ্য পুস্তক দুরূহ ও সুদীর্ঘ বলে তা পরিবর্তনের জন্য সিন্ডিকেটের প্রতি অনুরোধ, সরকার-প্রতিষ্ঠিত মিডল মাদ্রাসার অর্ধেক ব্যয়ভার বহনের জন্য সরকারের প্রতি আবেদন, বিশেষ শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে মুসলিম হোস্টেলের ছাত্রদের ধর্ম ও নীতিমূলক শিক্ষাদান, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য সরকার কর্তৃক শিশু-উপযোগী বাংলা পাঠ্য পুস্তক প্রণয়ন, কলেজ পর্যায়ে মুসলিম ছাত্রদের ভর্তির জন্য কোটা নির্ধারণ, মেট্রিকুলেশনের পাঠ্যসূচী থেকে 'বেহুলা' নামক বইয়ের বহিষ্করণ, মুসলিম শিক্ষোন্নতির উদ্দেশ্যে এবং একটি শিক্ষা-তহবিল গঠনের লক্ষ্যে মুসলমানদের উপর শিক্ষাকর প্রয়োগের জন্য

Dhaka University Institutional Repository

সরকারের প্রতি আবেদন, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবিধ পরীক্ষার কার্যপ্রণালী আলোচনার জন্য সিন্ডিকেটের নিকট মুসলমান সদস্য বৃদ্ধির অনুরোধ, স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের জন্য 'মুসলমান সমিতি'র উদ্যোগে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন, কলেজের দরিদ্র মুসলিম শিক্ষার্থীদের বিনা বেতনে পড়ানোর জন্য সরকারের কাছে আবেদন এবং ভার্নাকিউলার স্কুলে তদানীন্তন যুগে পাঠ্যভুক্ত 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' নামক গ্রন্থটি মুসলমানদের পক্ষে মনোকষ্টদায়ক বলে তার বহিষ্করণ সংক্রান্ত প্রস্তাবগুলো ছিল প্রধান। এ অধিবেশনে যোগদানকারী নেতৃবৃন্দের অনুরোধে জনগণের প্রচেষ্টায় বগুড়াতে সোনাতলা হাইস্কুল স্থাপিত হয়।

৩য় বার্ষিক অধিবেশনে নিম্নলিখিত প্রস্তাবসমূহ গৃহীত হয় ঃ

১. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় মেট্রিকুলেশন পরীক্ষার্থীদের জন্য আরবী ও ফার্সীর যে পাঠ্যপুস্তক নির্বাচিত করেছে, তা সমিতির বিবেচনায় অতি দুরূহ ও সুদীর্ঘ এবং পরীক্ষার্থীদের মেধাতীত। অতএব সমিতি সিন্ডিকেটকে এই দু'টি বিষয় বিবেচনা করার জন্য এই অনুরোধ করছে ঃ

ক) ফার্সীর পাঠ্য পুস্তক হতে আরবীর অংশ একেবারে বাদ দিয়ে ছাত্রদের ক্ষমতার উপযোগী নতুন একখানি পাঠ্য পুস্তক প্রণয়ন করা প্রয়োজন।

খ) উক্ত পাঠ্যপুস্তক প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত বর্তমান পাঠ্যপুস্তক হতে আরবীর অংশ একেবারে ত্যাগ করতে হবে এবং উভয় ভাষার গদ্য-পদ্য অংশ হতে অতি কঠিন ও অলংকারবিদ্যা সংক্রান্ত অংশ বাদ দিয়ে পুস্তকের কলেবর ক্ষুদ্র করতে হবে।

২. প্রত্যেক জেলার আয়তন ও লোকসংখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমানে মিডল স্কুল, উচ্চ ও নিম্ন প্রাইমারি স্কুলের জন্য যে ছাত্র বৃত্তি নির্ধারিত আছে, তা অতি অল্প। অতএব প্রস্তাব করা হলো যে, মুসলমান ছাত্রদের উচ্চশিক্ষার সুযোগ দেয়ার জন্য গভর্নমেন্টকে এ মর্মে অনুরোধ করা হোক যে, ঐ ছাত্রবৃত্তির সংখ্যা বৃদ্ধি করে কেবল মুসলমান ছাত্রের জন্য প্রত্যেক মহকুমায় ২টি মধ্যবাংলা ও ২টি উচ্চ প্রাইমারি ছাত্রবৃত্তি এবং প্রত্যেক থানায় ১টি নিম্ন প্রাইমারি ছাত্রবৃত্তি পৃথক করে রাখা হোক।

৩. দয়ালু গভর্নমেন্ট মুসলমানদের শিক্ষার উন্নতির জন্য মিডল মাদ্রাসা নামে এক শ্রেণীর যে নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছেন, শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক ঐ ধরনের বিদ্যালয়ে অত্যধিক ব্যয়ের ব্যবস্থা রাখায় সেগুলো আশানুরূপ ফলপ্রদ হতে পারছে না। সুতরাং ঐসব বিদ্যালয়ের মাসিক ব্যয়ের অর্দ্ধেকাংশ দেয়ার জন্য গভর্নমেন্টকে অনুরোধ করা হোক।

৪. মুসলমান ছাত্রদের অভিভাকদেরকে বুঝিয়ে দেয়া হোক যে, ব্যায়াম হলো চরিত্র গঠনের একটি উপায়; এবং শিক্ষা বিভাগকে অনুরোধ করা হোক যে, মুসলমান হোস্টেলের ছাত্রদেরকে স্কুল-সময়ের

Dhaka University Institutional Repository

পরে কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে ব্যবস্থাকৃত ব্যায়াম বা ক্রীড়ায় বাধ্যতামূলকভাবে সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য নির্দেশ দেয়া হোক।

৫. এই শিক্ষা সমিতি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত পরীক্ষার উত্তরপত্রে পরীক্ষার্থীর নাম লেখার প্রথা রহিত করার আবশ্যকতা বিশেষভাবে উপলব্ধি করছে এবং ইতোপূর্বে গৃহীত নিখিল ভারত মুসলমান শিক্ষা সমিতি, প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতি এবং জেলা মুসলমান শিক্ষা সমিতি কর্তৃক গৃহীত প্রস্তাবটি সম্পর্কে সিন্ডিকেটকে এ মর্মে দৃঢ়ভাবে অনুরোধ করছে যে, মুসলমান কর্তৃক সর্বসম্মতি ক্রমে গৃহীত প্রস্তাবটি যেন অবিলম্বে কার্যে পরিণত করা হয়।

৬. ছাত্রদেরকে সকল প্রকার অনভিপ্রেত প্রভাব হতে রক্ষা করার জন্য এই সমিতি সমস্ত হোস্টেল এবং বোডিং-কর্তৃপক্ষকে এ মর্মে অনুরোধ করছে যে, তাঁরা যেন উপযুক্ত শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে ঐ সকল হোস্টেলে ধর্ম শিক্ষা ও নীতি শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। এই সমিতি আরো অনুরোধ করছে যে, হোস্টেলের কার্য প্রণালী তত্ত্বাবধানের জন্য জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমতিক্রমে স্থানীয় কমিটি গঠিত হোক।

৭. যেসব প্রাইমারি স্কুলে মুসলমান ছাত্রসংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে, তাদের পাঠের জন্য লাহোরের 'আনজুমানে হেমায়েতে ইসলামিয়া'-র ন্যায় বাংলা ভাষায় শিশুদের পাঠ্যোপযোগী পুস্তক প্রণয়ন করার জন্য শিক্ষা বিভাগকে অনুরোধ করা হোক। এ শ্রেণীর পুস্তক সে-সব বিদ্যালয়ে পঠিত হবে, যাতে বিদ্যালয়ের অধিকাংশ বা সম্পূর্ণ ছাত্র মুসলমান।

৮. সমিতি এটা সংগত মনে করে যে, ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার্থী ছাত্রদের মধ্যে যারা আরবী বা ফার্সী দ্বিতীয় ভাষারূপে পড়বে, তারা ঐ ভাষা পড়ার সুবিধার জন্য ৬ষ্ঠ ও ৫ম শ্রেণীতে ড্রয়িং-এর পরিবর্তে উর্দু পড়তে পারবে।

৯. বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম অনুসারে কলেজের প্রত্যেকটি ক্লাসের জন্য ছাত্রসংখ্যা নির্দ্ধারিত থাকে। সুতরাং মুসলমান ছাত্ররা যাতে ঐসব শ্রেণীর প্রবেশাধিকার হতে বঞ্চিত না হয়, সেই উদ্দেশ্যে প্রত্যেক শ্রেণীর ছাত্রসংখ্যা পূর্ণ হওয়ার এক সপ্তাহ পূর্ব পর্যন্ত প্রত্যেক শ্রেণীতে দেশের মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যানুপাতে মুসলমান ছাত্রদের জন্য স্থান সংরক্ষিত রাখা হোক। তৎপর প্রয়োজনীয় সংখ্যক মুসলমান না জুটলে অন্য সম্প্রদায়ের ছাত্র দ্বারা ঐ সব আসন পূর্ণ করা হোক।

হাই স্কুলসমূহেও অনুরূপ ব্যবস্থা হোক। অপর সম্প্রদায়ের ছাত্র দ্বারা নির্দিষ্ট সংখ্যা পূর্ণ হয়ে গেলে মুসলমান ছাত্রদের জন্য স্বতন্ত্র একটি ক্লাস খোলা হোক।

Dhaka University Institutional Repository

১০. বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ম্যাট্রিকুলেশন-ছাত্রদের পাঠোপযোগী যেসব বাংলা পুস্তক মনোনীত করেছেন, তার মধ্যে "বেহুলা" নামক পুস্তক এই সমিতির মতে মুসলমান ছাত্রদের পাঠের সম্পূর্ণ অনুপযোগী এবং আপত্তিজনক। অতএব উক্ত পুস্তক পরিহার করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়কে অনুরোধ করা হোক।

১১. এই প্রদেশে মুসলমানেরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। তাদেরকে শিক্ষায় পশ্চাৎপদ দেখে এই সমিতি গভর্নমেন্টকে সশ্রদ্ধ অনুরোধ করছে যে, গভর্নমেন্ট যেন অনুগ্রহ করে একজন সিনিয়র সরকারী কর্মকর্তাকে জনশিক্ষা পরিচালকের সহকারীরূপে নিযুক্ত করেন। এই সহকারী কর্মকর্তা মুসলমানদের শিক্ষোন্নতি ও অন্যান্য প্রয়োজন সম্বন্ধে পরিচালক সাহেবকে পরামর্শ দেবেন।

১২. মুসলমানদের ইংরেজী শিক্ষার ক্রমবর্দ্ধমান আগ্রহের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রস্তাব করা হচ্ছে যে, যে-সব মধ্যবাংলা স্কুলে মুসলমান ছাত্রসংখ্যা অধিক, সেগুলোকে মধ্য ইংরেজী স্কুলে রূপান্তরিত করার জন্য জনশিক্ষা পরিচালককে অনুরোধ করা হোক। রূপান্তরিত স্কুলের দক্ষ শিক্ষকমণ্ডলীর পৌনঃপুনিক ব্যয়ের অর্ধেক স্থানীয় চাঁদার মাধ্যমে সংগৃহীত হবে।

১৩. বিগত ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় আরবী ও ফার্সীর প্রশ্ন সিলেবাসের বাদ দেয়া অংশ হতে সেট করার বিরুদ্ধে এই সমিতি জোরালো আপত্তি জ্ঞাপন করছে এবং ঐসব প্রশ্নের জন্য নির্দিষ্ট নম্বর অপরাপর প্রশ্নে নির্দ্ধারিত করে দেয়ার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়কে বিশেষ অনুরোধ করছে।

১৪. মুসলমানদের শিক্ষোন্নতির জন্য একটি স্থায়ী তহবিলের অনিবার্য প্রয়োজন উপলব্ধি করে এই সমিতি গভর্নমেন্টের নিকট এ মর্মে আবেদন করছে যে, মুসলমানদের উপর একটি শিক্ষা কর আরোপ করা হোক এবং একজন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীকে সভাপতি নির্বাচন করে সরকারী ও বেসরকারী সভ্যদের নিয়ে একটি কমিটি গঠিত হোক। ঐ কমিটি শিক্ষা কর সম্পর্কিত সকল বিষয় বিবেচনা করবে ও সিদ্ধান্ত নেবে।

১৫. মুসলমান সমাজ হতে বহুসংখ্যক পরিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পরীক্ষায় অবতীর্ণ হচ্ছে। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যপ্রণালীতে মুসলমান স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য মুসলমান সভ্যসংখ্যা বৃদ্ধি করতে বিশ্ববিদ্যালয়কে অনুরোধ করা হোক।

আরো প্রস্তাব করা হয় যে, কলা অনুষদে মুসলমান সভ্য নেয়া হোক এবং তাঁদের অনুমোদিত আরবী-ফার্সীর পুস্তক, পাঠ্যপুস্তক-নির্বাচনী সভার বিবেচনার জন্য দেয়া হোক।

১৬. ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে আরবী ও ফার্সী বাধ্যতামূলক বিষয় বা অতিরিক্ত ঐচ্ছিক বিষয়রূপে গণ্য হওয়ায় এবং মুসলমান ছাত্রদের জন্য ঐ দুই বিষয় পাঠ্যরূপে গ্রহণ করার

Dhaka University Institutional Repository

ব্যবস্থা থাকায় গভর্নমেন্ট স্কুল ও সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত উচ্চ ইংরেজী স্কুলে একজন অতিরিক্ত মৌলবী নিযুক্ত করার প্রয়োজন রয়েছে। শিক্ষাকর্তৃপক্ষকে তা করার জন্য অনুরোধ করা হোক।

১৭. মুসলমান সমাজ অত্যন্ত দরিদ্র এবং এই সমাজের অতি অল্পসংখ্যক ছাত্র কলেজে পড়ছে বলে গভর্নমেন্ট পরিচালিত বা গভর্নমেন্ট সাহায্যপ্রাপ্ত সকল মানবিক কলেজে মুসলমান ছাত্রদের বিনাবেতনে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করার জন্য জনশিক্ষা পরিচালক মহোদয়কে অনুরোধ করা হোক।

১৮. যে-সব জুনিয়ার মাদ্রাসা শিক্ষাবিভাগের নিয়ম অনুযায়ী পরিচালিত হবে, সেগুলোকে উপযুক্ত সাহায্য দেয়ার জন্য গভর্নমেন্টকে অনুরোধ করা হোক।

১৯. মুসলমান সমিতিগুলোর প্রচারক দ্বারা স্ত্রীশিক্ষার আবশ্যকতা লোকদের বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য এবং প্রয়োজন মত স্থানে স্থানে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য ঐ সকল সমিতিকে অনুরোধ করা হোক।

২০. এই বগুড়া জেলায় স্ত্রীশিক্ষার অসাধারণ ও দ্রুত প্রসার ঘটার পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষয়িত্রীদের প্রশিক্ষণের জন্য এই জেলায় একটি স্কুল স্থাপনের জন্য গভর্নমেন্টকে অনুরোধ করা হোক।

২১. প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতি–তহবিল গঠন করার উদ্দেশ্যে এই সমিতি মুসলমানদের শিক্ষোন্নতি-অভিলাষী ব্যক্তিদের এ মর্মে অনুরোধ করছে যে, তাঁরা যেন ঢাকাস্থ পূর্ববংগ ও আসাম প্রদেশের কো-অপারেটিভ সেন্ট্রাল ব্যাংকের ডিবেঞ্চার বন্ড ক্রয় করেন। কারণ এই ব্যাংক তার লাভের পুরো অংশ এই প্রদেশের মুসলমানদের শিক্ষোন্নতির জন্য প্রদান করতে প্রস্তুত।

২২. এই নিয়ম করা হোক যে, প্রাদেশিক ফান্ড অথবা জেলাবোর্ড হতে সাহায্য পেতে হলে মুসলমান- প্রধান মিডল স্কুলসমূহে একজন মৌলবী নিযুক্ত করতে হবে।

২৩. যে-সব জেলায় মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যা ৫০%-এর অধিক, সে–সব জেলার সকল ধরনের স্কুলে, বিশেষত যে–সব স্কুলে আরবী, ফার্সী ও উর্দু শিক্ষা দেয়া হয়, ঐসব স্কুল পরিদর্শন করার জন্য একজন মুসলমান ডেপুটি ইনস্‌পেক্টর নিয়োগ করা হোক।

২৪. অধুনা পূর্ববংগ ও আসাম প্রদেশের মিডল স্কুলে পাঠ্যপুস্তকরূপে ভারতের যে ইতিহাস নির্দিষ্ট আছে, তা অতি দুরূহ বাংলা ভাষায় লিখিত। তাতে মুসলমানদের মনোকষ্টদায়ক ও আপত্তিকর অনেক বিষয় সন্নিবিষ্ট হয়েছে। অতএব ঐ পুস্তকের পরিবর্তে সরল ভাষায় লিখিত অন্য পুস্তকের ব্যবস্থা করা হোক।

Dhaka University Institutional Repository

২৫. মাননীয় মিঃ করিম ভাই ইব্রাহীম শিল্প শিক্ষা, বিশেষত মুসলমানদের শিল্প শিক্ষার জন্য সাড়ে চার লক্ষ টাকার যে মহান দান করেছেন, সে জন্য এই সমিতি তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছে।

২৬. এই সমিতি দয়াবান গভর্নমেন্টকে, বিশেষত মাননীয় শার্প এবং মাননীয় ন্যাথান সাহেবকে মুসলমান শিক্ষার প্রতি তাঁদের অবিচল সহানুভূতির জন্য গভীর ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছে।[১৮]

৪র্থ বার্ষিক অধিবেশন

এ সমিতির চতুর্থ ও সর্বশেষ অধিবেশন নওয়াব সলীমুল্লাহ্‌র উদ্যোগে ও করটিয়ার জমিদার মৌলবী ওয়াজেদ আলী খান পন্নীর সভাপতিত্বে রংপুরে অনুষ্ঠিত হয় ১৯১১ সালের ১৫ ও ১৬ এপ্রিল। নতুন প্রদেশের বিভিন্ন জেলা থেকে প্রায় ৫০০ প্রতিনিধি এবং ঐ পরিমাণ দর্শক-সর্বসমেত প্রায় এক হাজার লোক ঐ অধিবেশনে যোগদান করেন।[৭৭] কতেক রাজকর্মচারী এবং অনেক হিন্দুও সভায় উপস্থিত ছিলেন। পশ্চিমবংগ থেকেও অনেক সুধী আগমন করেন।

১৫ই এপ্রিল অভ্যর্থনা-কমিটির চেয়ারম্যান আবদুল মজীদ চৌধুরী বক্তৃতা প্রসংগে বলেন, জাতীয় শিক্ষা জাতীয় ভাষায় (বাংলায়) দেওয়ার জন্য শিক্ষা সমিতির উদ্যোগ গ্রহণ করা উচিত। সভাপতি ওয়াজিদ আলী খান পন্নী তাঁর ভাষণে বলেন, রাজপুরুষরা ধর্ম শিক্ষাকে শিক্ষার অংগন থেকে একেবারে সরিয়ে রেখেছেন। বিষয়টি সমিতির পক্ষ থেকে সরকারের গোচরীভূত করার প্রয়োজন। ঐ দিনের অধিবেশনে মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় (আলীগড়) স্থাপনের উদ্দেশ্যে জনসাধারণের নিকট থেকে চাঁদা আদায় করা এবং ঐ কাজ ত্বরান্বিত করার জন্য বিভিন্ন স্থানে সমিতি গঠন করার প্রস্তাব গৃহীত হয়।

১৬ এপ্রিলের অধিবেশনে নওয়াব সলীমুল্লাহ বাহাদুরের অনুপস্থিতিতে সমিতির জেনারেল সেক্রেটারি নওয়াব আলী চৌধুরী তাঁর নিকট থেকে প্রাপ্ত একটি তারবার্তা পাঠ করেন। তিনি তাঁর ভাষণে শিক্ষা সমিতির প্রচেষ্টায় শিক্ষার উন্নতি হওয়ায় আনন্দ প্রকাশ করেন। প্রস্তাবিত আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে সাহায্য করার জন্য তিনি সকল প্রদেশের মুসলমানদের উৎসাহিত করেন। শিক্ষা সমিতির প্রস্তাবানুসারে মাদ্রাসা শিক্ষা সংস্কারের উদ্দেশ্যে গঠিত 'শার্প-কমিটি'র রিপোর্ট বাস্তবায়িত করার প্রতি তিনি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সমিতির চেষ্টায় ও সরকারী সাহায্যে অনেকগুলো মুসলিম হোস্টেল স্থাপিত হওয়ায় তিনি আনন্দ প্রকাশ করেন। এ ছাড়া মুহসিন-ফান্ড থেকে আরো অর্থ আদায়ের উদ্দেশ্যে গভর্নমেন্টের কাছে আবেদন করার জন্য তিনি মুসলিম সমাজের মনোযোগ আকর্ষণ করেন।

Dhaka University Institutional Repository

রংপুর–অধিবেশনে মোট ১৫টি প্রস্তাব গৃহীত হয়। তন্মধ্যে 'পাঠ্য পুস্তক নির্বাচক সমিতি'-তে (Text Book Committee) মুসলমান সভ্য বৃদ্ধির জন্য সরকারের প্রতি আবেদন, প্রদেশের মুসলমান অধিবাসীদের সংখ্যানুপাতে মুহসিন–ফান্ড থেকে আরো অর্থ মঞ্জুরির জন্য গভর্নমেন্টের প্রতি অনুরোধ জ্ঞাপন, প্রত্যেক জেলায় 'মুসলমান সমিতি'–এর আওতায় শিক্ষা সাব–কমিটি গঠন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট, সিন্ডিকেট, ফ্যাকালটি ও পাঠ্য পুস্তক নির্বাচন-সমিতিতে মুসলমান সভ্য-সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের নিকট অনুরোধ জ্ঞাপন, আসামের জেলাসমূহে মুহসিন–ফান্ডের অর্থ প্রদানের জন্য গভর্নমেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণ, মাদ্রাসা রিফরম কমিটির সুপারিশসমূহের বাস্তবায়ন এবং সংস্কার সাধিত মাদ্রাসাসমূহের জন্য বাজেটে অধিক অর্থ বরাদ্দের আবেদন সংক্রান্ত প্রস্তাবগুলো ছিল উল্লেখযোগ্য।

পূর্ববংগ ও আসাম প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতির চতুর্থ বার্ষিক অধিবেশনে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলো গৃহীত হয় ঃ

১. পূর্ববংগ ও আসাম প্রদেশের প্রত্যেক জেলার মুসলমান শিক্ষা সমিতি কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি প্রতিনিধি কমিটি গঠিত হোক। শিক্ষা সমিতির আগামী বার্ষিক অধিবেশনের তিন মাস পূর্বে ঐ কমিটির বৈঠক ঢাকা নগরীতে অনুষ্ঠিত হবে। এই কমিটি পূর্ববংগ ও আসাম প্রদেশের শিক্ষা সমিতির আগামী অধিবেশনের নিয়ম-প্রণালী প্রণয়ন করবে এবং পশ্চিমবংগ হতে আগমনকারী মুসলমান সভ্যদের পদমর্যাদা সম্বন্ধেও বিবেচনা করবে।

২. কোন প্রস্তাব প্রসংগে কোন সময় উত্তেজনাকর বাদ–প্রতিবাদের আশংকা আছে বলে যদি সভাপতি সাহেব মনে করেন, তবে তিনি বিষয়টিকে বিতর্কমূলক বলে গণ্য করতে পারবেন এবং প্রস্তাবটি আগামী বছরের সভায় বিবেচিত হওয়ার জন্য স্থগিত থাকবে। সভাপতি সাহেব কোন সভ্যের বক্তৃতার কোন অংশকে বাদ–প্রতিবাদপূর্ণ মনে করলে তিনি সেই সভ্য দ্বারা তাঁর বক্তৃতার উক্ত অংশকে প্রত্যাহার করাতে পারবেন।

৩. ভারতে একটি মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য সর্বসাধারণ মুসলমানের নিকট থেকে চাঁদা সংগ্রহ করা হোক এবং সেই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে সাব-কমিটি গঠিত হোক।

৪. গভর্নমেন্ট পরিচালিত ও সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলসমূহে মুসলমান পর্ব উপলক্ষে যে ছুটি দেয়া হয়, তা অপ্রতুল। ঐ ছুটি আরো বর্দ্ধিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। মুসলমান জনসাধারণের পরামর্শক্রমে ছুটির তালিকা প্রস্তুত করা হোক।

Dhaka University Institutional Repository

৫. মুসলিম প্রতিনিধিত্বের জন্য টেক্স্ট বুক কমিটিতে মুসলমান সভ্যসংখ্যা আরো বর্দ্ধিত করে মুসলিম স্বার্থ সুরক্ষিত করার ব্যবস্থা নেয়ার জন্য গভর্নমেন্টকে অনুরোধ করা হোক।

৬. গত বছরের শিক্ষা সমিতি কর্তৃক গৃহীত প্রথম প্রস্তাবটি সমিতির এই অধিবেশনও অনুমোদন লাভ করে এবং ম্যাট্রিকুলেশন, ইন্টারমিডিয়েট ও বি. এ. পরীক্ষার জন্য নির্দ্ধারিত ফার্সীর পাঠ্যপুস্তক হতে আরবীর অংশ বর্জন করার এবং ঐসব পাঠ্যপুস্তক হতে জটিল অংশগুলো বাদ দিয়ে পাঠ্যসূচীর কলেবর হ্রাস করার আবশ্যকতাও এই অধিবেশন অনুভব করে এবং সমিতির এ প্রস্তাব কার্যে পরিণত করার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-প্রণীত নিয়মকানুন পরিবর্তন করার জন্য কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করে।

৭. বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল পরীক্ষার উত্তরপত্রে পরীক্ষার্থীর নাম লেখার প্রথা রহিত করার আবশ্যকতা এই সমিতি তীব্রভাবে অনুভব করছে এবং ইতোপূর্বে নিখিল ভারত মুসলমান শিক্ষা সমিতি, প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতি ও জেলা মুসলমান শিক্ষা সমিতি কর্তৃক গৃহীত ও মুসলমানদের সর্বসম্মত এ প্রস্তাবটিকে অবিলম্বে কার্যে পরিণত করার জন্য এই সমিতি সিন্ডিকেটকে আবার দৃঢ়ভাবে তাগিদ করছে।

৮. শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর সাহেবকে এই অনুরোধ করা হোক যে, হাইস্কুল ও কলেজসমূহে ভর্তি হওয়ার জন্য যে-সব আবেদনপত্র দাখিল করা হয়, তাদের যেন একটি রেজিস্ট্রার রাখা হয় এবং তাতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো দেখানো হয় ঃ

১. ভর্তির আবেদন পত্রের তারিখ।

২. আবেদনকারীর নাম ও ঠিকানা।

৩. আবেদনপত্র সম্বন্ধে গৃহীত ব্যবস্থা।

৪. আবেদন অগ্রাহ্য হলে তার কারণ।

৯. এ মর্মে প্রস্তাব গৃহীত হলো যে, এই প্রদেশের আশু প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রেখে যেন মুহসিন ফান্ডের জমা-খরচের জন্য বাজেট প্রস্তুত করা হয় এবং এই প্রদেশের মুসলমান-সংখ্যার অনুপাতে যেন মুহসিন ফান্ডের ন্যায্য অংশ পাওয়া যেতে পারে, সেই চেষ্টা করার জন্য প্রাদেশিক গভর্নমেন্টকে অনুরোধ করা হোক।

১০. বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলমান পরীক্ষার্থীদের স্বার্থ যাতে যথাযথভাবে রক্ষিত হয়, সেই অভিপ্রায়ে এই শিক্ষা সমিতি বিশেষভাবে অনুরোধ করছে যে- সিনেট, সিন্ডিকেট, ফ্যাকালটি ও

Dhaka University Institutional Repository

উচ্চবিদ্যা-বোর্ডে যেন অধিক পরিমাণ মুসলমান সভ্য শামিল করা হয় এবং এই প্রদেশের দাবিদাওয়া বিশেষভাবে বিবেচিত হয়।

১১. শিক্ষা বিভাগের সকল স্কুলে ডেপুটি ইনস্‌পেক্টর কর্তৃক এই সমিতির রিপোর্ট প্রেরণ করার জন্য শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর সাহেবকে অনুরোধ করা হোক।

১২. আরবী ও ফার্সীর পাঠ্যপুস্তক যে বছরের জন্য পাঠ্যভুক্ত করা হয়, সেই বছর আরম্ভ হওয়ার অন্তত ছয় মাস পূর্বেই যাতে ঐসব পাঠ্যপুস্তক মুদ্রিত হয়, তৎপ্রতি যত্নবান হওয়ার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটকে অনুরোধ করা হোক।

১৩. প্রত্যেক জেলার মুসলমান সমিতির আওতায় একটি শিক্ষা সাব-কমিটি গঠিত হোক। এসব কমিটি কেবল শিক্ষা বিষয়ে আলোচনা করবে। আর শিক্ষা বিভাগের রাজকর্মচারীদেরকে এই সাব-কমিটিতে যোগদান করার জন্য অনুরোধ করা হোক। এই সাব-কমিটি শিক্ষাবিষয়ক অভাব-অভিযোগ প্রতি বছর শিক্ষা সমিতির স্ট্যান্ডিং কমিটির জেনারেল সেক্রেটারির নিকট পেশ করবে এবং তৎসম্বন্ধে যে উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক, তা সেক্রেটারি করবেন।

১৪. আসাম প্রদেশের জেলাসমূহে মুহসিন ফান্ডের অর্থ বিতরণ করার জন্য গভর্নমেন্টকে অনুরোধ করা হোক।

402457

১৫. বিগত ১৯১০ সালের মার্চে ঢাকা নগরীতে মাদ্রাসা সংস্কার কমিটির অধিবেশনে মাদ্রাসা সংস্কার সম্বন্ধে যে-সব প্রস্তাব বিধিবদ্ধ হয়েছিল, ঐসব প্রস্তাব কার্যে পরিণত করার আবশ্যকতা বিবেচনা করার জন্য গভর্নমেন্টকে বিনীতভাবে অনুরোধ করা হোক এবং নতুন নিয়ম অনুযায়ী যে-সব মাদ্রাসার সংস্কার সাধন করা হয়েছে, ঐসব মাদ্রাসার জন্য প্রাদেশিক বাজেটে অধিক সাহায্য দেয়ার ব্যবস্থা করা হোক।

রংপুরের অধিবেশন ছিল পূর্ববাংলা ও আসাম প্রাদেশিক শিক্ষা সমিতি সর্বশেষ অধিবেশন। এর পর ১৯১১ সালের ১২ ডিসেম্বর বংগ বিভাগ রদ ঘোষিত হলে ১৯১৪ সালে যুক্ত বাংলায় পূর্ববাংলা ও আসাম প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতি এবং বংগীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতি একত্রীভূত হয়ে যায়।

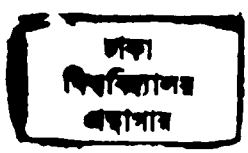

Dhaka University Institutional Repository

বংগীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতির ৫ম বার্ষিক অধিবেশন

নওয়াব সলীমুল্লাহ, নওয়াব আলী চৌধুরী প্রমুখ নেতা যে উদ্দেশ্যে 'পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রাদেশিক শিক্ষা সমিতি' স্থাপন করেছিলেন, তা অনেকটা সফল হয়েছে। এ সমিতির কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে বাংলার মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষা-চেতনা জাগ্রত হয়; তারা আধুনিক শিক্ষা-দীক্ষার দিকে ঝুঁকতে আরম্ভ করে। বংগ-বিভাগ রহিত হওয়ার পূর্বেই শিক্ষাক্ষেত্রে মুসলমানদের এই জাগরণ পরিলক্ষিত হয়।

পূর্ববংগ ও আসাম প্রদেশের (১৯০৫-১৯১১) প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতির সংক্ষিপ্ত কার্যবিবরণী জানার জন্য ১৯১৪ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত যুক্তবাংলার প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতির প্রথম অধিবেশনে পঠিত সমিতির সেক্রেটারি নওয়াব আলী চৌধুরীর কার্যবিবরণীর অংশ বিশেষ নিম্নে পেশ করা হলো ঃ

"সভ্য মহোদয়গণ,

পূর্ববংগ ও আসাম প্রদেশের প্রাদেশিক শিক্ষা সমিতির সম্পাদকরূপে আমি আপনাদের সমক্ষে দণ্ডায়মান হইয়াছি। বলা বাহুল্য যে, উক্ত প্রদেশের আর এখন অস্তিত্ব নাই। উক্ত প্রদেশের আসাম বাদ দিয়া অবশিষ্টাংশ ও বংগ-প্রদেশের বিহার বাদ দিয়া অবশিষ্টাংশ লইয়া "বাংগালা প্রেসিডেন্সি" নূতনভাবে গঠিত হইয়াছে। আর আমরা এই নূতন প্রেসিডেন্সির শিক্ষা সমিতির প্রতিষ্ঠাকল্পে সকলে একত্রিত হইয়াছি। প্রকৃত প্রস্তাবে অদ্যকার শিক্ষা সমিতি নবপ্রসূত হইলেও শিক্ষা সমিতি আমাদের নিকট নূতন জিনিষ নহে। নব প্রদেশ গঠিত হওয়ার পূর্বে আমাদের উভয় প্রদেশে দুইটি শিক্ষা সমিতি বর্তমান ছিল। আমরা "পূর্ববংগ ও আসাম প্রদেশের মুসলমান শিক্ষা সমিতির" দ্বারা কি কি উপকার পাইয়াছি তাহারই আলোচনা করা আমার এই কার্যবিবরণীর উদ্দেশ্য।

"মহোদয়গণ, শুভ মুহূর্তে ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর তারিখে পূর্ববংগ ও আসাম প্রদেশের সৃষ্টি হয়। সে সময় হইতেই তৎপ্রদেশের মুসলমানগণ এক নব আশা ও উৎসাহে অনুপ্রাণিত হন। তাঁহাদের অধোগতি এবং জাতীয় জড়তা তাঁহারা সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিতে আরম্ভ করেন এবং শিক্ষাহীনতাই যে জাতীয় অধোগতির একমাত্র কারণ, তাহা তাঁহাদের হৃদয়ংগম হয়। সৌভাগ্যক্রমে নব প্রদেশের তদানীন্তন রাজপুরুষবর্গ মুসলমানগণের অধোগতিতে দুঃখিত এবং তাহাদের উন্নতিকল্পে আন্তরিক সহানুভূতি প্রকাশ করেন। পূর্ববংগের মুসলমানগণের নেতা মাননীয় নবাব সার খাজা সলিম উল্লাহ বাহাদুর, জি, সি, আই, ই, কে, সি, এস, আই, মুসলমানগণের মধ্যে এই জাতীয় উন্নতির আকাঙ্ক্ষা কিসে সজীব থাকিতে পারে, ইহাই চিন্তা করিতে থাকেন এবং তাঁহার

Dhaka University Institutional Repository

সমীচীন চিন্তার ফলস্বরূপ গত ১৯০৬ সালের ১৪ এপ্রিল তারিখে ঢাকা নগরীতে "পূর্ববংগ এবং আসাম প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতির" প্রথম প্রতিষ্ঠা হয়।

"যে কয়েক বৎসর পূর্ববংগ ভিন্ন প্রদেশ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল, সেই সময় মুসলমানগণের বিদ্যাশিক্ষার লিপ্সা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হওয়াই পরিলক্ষিত হইয়াছে। নিম্নে যে সকল প্রমাণ আনিয়া আপনাদিগের নিকট উপস্থিত করিব, তাহাতে প্রতীয়মান হইবে যে, ঐ সময় মুসলমানগণ শিক্ষাক্ষেত্রে আশাতীত উন্নতিলাভ করিয়াছে। মুসলমানগণের শিক্ষাকল্পে অনেক সুব্যবস্থা হইয়াছে। মুসলমান ছাত্রগণের জন্য অনেক ছাত্রাবাস স্থাপিত হইয়াছে। তাহাদের জন্য অনেক বৃত্তি দেওয়া হইয়াছে। তাহাদের পাঠ্য পুস্তক অনেকটা সংশোধিত হইয়াছে। আবার ফার্সী পাঠের সুযোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। স্কুল কমিটিগুলির সংস্করণ হইয়াছে– মুসলমানগণের চেষ্টায় অনেক স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মুসলমান নেতাগণ যখন যে বিষয়ে রাজপুরুষগণের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন, তখনই সম্পূর্ণ সহানুভূতি পাইয়াছেন। তাহাতে তাহাদের উৎসাহও দিন দিন বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

"মহোদয়গণ, আমাদের পূর্ববংগ ও আসাম প্রদেশের অস্তিত্ব এখন আর নাই। এখন আমরা পশ্চিম বংগের সহিত একত্রিত এবং অদ্যকার মহাসভায় আমরা উভয় বংগের ভ্রাতা সম্মিলিত হইয়াছি। আমরা পূর্ববংগের মুসলমানগণ পূর্ব কয়েক বৎসরে শিক্ষোন্নতিকল্পে যে সকল উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিলাম, ঐগুলি বজায় রাখিয়া আমরা নব প্রেসিডেন্সির মুসলমান কিসে শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে পারিব এবং আপন জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করিতে সক্ষম হইব, তাহারই বিচার ও উপায় উদ্ভাবনার্থ অদ্য আমরা এই সভায় সমাগত হইয়াছি এবং অদ্য আমরা এই অভিনব শিক্ষা সমিতির প্রতিষ্ঠা করিতেছি। খোদাতালা আমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন ইহাই তাঁহার নিকট করজোড়ে প্রার্থনা।

"এস্থলে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, সেই স্মরণীয় দিল্লি দরবারের রাজঘোষণার পর হইতে মুসলমান জগতে উপর্যুপরি যে সকল দুর্ঘটনা উপস্থিত হইয়াছে, তাহাতে কাহারও মনে শান্তি ছিল না এবং মুসলমানগণ অন্য কোন দিকে মনোনিবেশ করিতে পারেন নাই। খোদার ফজলে এক্ষণে ঐ সকল অশান্তি প্রায়ই চলিয়া গিয়াছে। তাই আমরা পুনরায় প্রকৃতিস্থ হইতে সক্ষম হইয়াছি। ঐ কারণে শিক্ষা সমিতির অধিবেশনও এ পর্যন্ত হইতে পারে নাই।

"সভ্য মহোদয়গণ, বর্তমান সমিতির কার্যারম্ভের পূর্বে আমরা "পূর্ববংগ এবং আসাম প্রদেশের শিক্ষা সমিতি" দ্বারা কি কি উপকার পাইয়াছি, কি কি মন্তব্য বিধিবদ্ধ করিয়াছিলাম এবং তাহা কতদূর কার্যে পরিণত করিতে সক্ষম হইয়াছি– ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি। কিন্তু সেই

Dhaka University Institutional Repository

আলোচনার পূর্বে প্রদেশ গঠিত হওয়ার সময় মুসলমান শিক্ষার অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহা আলোচনা করা বোধ হয় অপ্রাসংগিক হইবে না।

"আপনারা সকলেই অবগত আছেন যে, ইংরেজি ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর তারিখে পূর্ববংগ ও আসাম প্রদেশ গঠিত হয়। ১৯০৬ সালের ৩১ মার্চ তারিখে উক্ত প্রদেশের সকল প্রকার বিদ্যালয়ে ছাত্র ও ছাত্রী সংখ্যা ৭৯২৯৮৭ জন ছিল, তন্মধ্যে হিন্দু ৩৬২৯৫০ অর্থাৎ শতকরা ৪৫.৭ জন, মুসলমান ৩৯৮৩৭০ অর্থাৎ শতকরা ৫০.২ জন, ইউরোপীয়ান ৫৯ অর্থাৎ শতকরা .০০৭ জন। দেশী খ্রীস্টান ৯৬০৩ অর্থাৎ শতকরা ১.৮ জন। এবং অন্যান্য জাতীয় ২২০০৫ অর্থাৎ শতকরা ২.৭ জন। আবার ৬ বৎসর পরে অর্থাৎ ১৯১২ সালের ১ এপ্রিল তারিখে যখন উক্ত প্রদেশের অস্তিত্ব লোপ হয়, সেই সময় ঐ প্রদেশে সকল প্রকার বিদ্যালয়ে ছাত্র ও ছাত্রী সংখ্যা থাকে ১০,৭৫,১২৪ জন। তন্মধ্যে হিন্দু ৪,৫৭,৭৭৮ অর্থাৎ শতকরা ৪২.৫ জন। মুসলমান ৫,৭৫,৬৭৪ অর্থাৎ শতকরা ৫৩.৫ জন। ইউরোপীয়ান ৫৪৯ অর্থাৎ শতকরা ·৩ জন। দেশীয় খ্রীষ্টান ১৩,৫৪৪ অর্থাৎ শতকরা ১.২ জন এবং অন্যান্য জাতীয় ২৭,৫৭৯ অর্থাৎ শতকরা ২.৫ জন। এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, আলোচিত ৬ বৎসরে হিন্দু ছাত্র ও ছাত্রী শতকরা ২৬.০১ জন বাড়িয়াছে, মুসলমান শতকরা ৪৪.৫ জন বাড়িয়াছে, ইউরোপীয়ান শতকরা ৮৩০.৪ জন বাড়িয়াছে, দেশীয় খ্রীস্টান শতকরা ৪১ জন বাড়িয়াছে এবং অন্যান্য জাতীয় ছাত্র শতকরা ২৫.৩ জন বাড়িয়াছে। এই হিসাব দৃষ্টে বুঝা যায় কেবল এক ইউরোপীয়ান ছাত্র ভিন্ন মুসলমান ছাত্র যত বৃদ্ধি হইয়াছে, অন্য কোন জাতীয় ছাত্র তাহা হয় নাই।"[১৯]

বংগ বিভাগ রদের পর নওয়াব সলীমুল্লাহর আহবানে যুক্তবাংলায় 'প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতি'র প্রথম সম্মিলিত অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় ঢাকার রমনাস্থ প্রেসভবনে ১৯১৪ সালের ১১ ও ১২ এপ্রিল। সভায় প্রতিনিধি, দর্শক, আমন্ত্রিত সুধী, স্বেচ্ছাসেবক প্রভৃতি মিলিয়ে প্রায় ছয়শ' লোক সমবেত হয়। বংগ প্রেসিডেন্সীর বিভিন্ন স্থান থেকে যথেষ্ট সংখ্যক গণ্যমান্য প্রতিনিধি এ সভায় যোগদান করেন। মুর্শিদাবাদের নওয়াব মির্জা শুজাআত আলী বেগও উপস্থিত ছিলেন। এ সভায় সভাপতিত্ব করেন নওয়াব আলী চৌধুরী। অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি ও সেক্রেটারি ছিলেন যথাক্রমে নওয়াব সলীমুল্লাহ ও খান বাহাদুর আওলাদ হোসেন। এ সভায় 'পূর্ববংগ ও আসাম প্রাদেশিক শিক্ষা সমিতি' এবং 'বংগীয় প্রাদেশিক শিক্ষা সমিতি'-কে সংযুক্ত করা হয়। এই অধিবেশনে বাংলার মুসলমানদের উৎসাহ–উদ্দীপনা লক্ষ্য করে 'ঢাকা প্রকাশ' বলেন ঃ

'সভার উদ্যোক্তাবৃন্দের আগ্রহ, সৌজন্য ও অমায়িকতা বাস্তবিকই প্রশংসনীয়। ধনী-দরিদ্র, ছোট-বড়-সকলেই যেন ধনমদ, পদগৌরব, বংশমর্যাদা প্রভৃতি ভুলে গিয়ে এক মহান ভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে এই

Dhaka University Institutional Repository

মহাব্রত উদযাপনের জন্য সচেষ্ট। বাস্তবিক এই সমিতিতে মুসলমান সম্প্রদায়ের যেরূপ আগ্রহাতিশয্য পরিলক্ষিত হচ্ছে, তাতে মনে হয় সত্যিই দেশে সুদিন উপস্থিত। শিক্ষার জন্য মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দের এরূপ অনুরাগ শুভ চিহ্নজ্ঞাপক, সন্দেহ নেই।'

স্যার সলীমুল্লাহ তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত 'বংগীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতি' ও 'বংগীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগ'এর সভাপতি ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর বংগীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতির সভাপতি ও সম্পাদক নির্বাচিত হন যথাক্রমে মৌলবী আবদুল করীম ও নওয়াব নওয়াব আলী চৌধুরী। এঁরা উভয়ই কয়েক বছর নিজ নিজ পদে বহাল ছিলেন। এ সময় বর্ধমান ও অন্যান্য স্থানে শিক্ষা সমিতির বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। সৈয়দ ওয়াহেদ হোসেন নওয়াব আলী চৌধুরীর স্থলাভিষিক্ত হলে (১৯১৭) আবদুল করীম পুনরায় ঐ শিক্ষা সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হন এবং যতদিন সমিতিটি কার্যকর ছিল (১৯২০), ততদিনই তিনি ঐ পদে বহাল ছিলেন। তাঁর সভাপতি থাকাকালে তাঁর সভাপতিত্বে এর জেলাভিত্তিক প্রথম বার্ষিকসভা মালদহে অনুষ্ঠিত হয় ১৯১৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে। অনুরূপভাবে তাঁরই সভাপতিত্বে শিক্ষা সমিতির প্রাদেশিক বার্ষিক অধিবেশন বর্ধমানে অনুষ্ঠিত হয় সে বছর এপ্রিলে। এটি ছিল বংগীয় মুসলমান শিক্ষা সমিতির একটি গুরুত্বপূর্ণ বার্ষিক অধিবেশন। এতে বিভিন্ন জেলার প্রতিনিধি যোগদান করেন। এই অধিবেশনে আবদুল করীম মুসলিম শিক্ষকের স্বল্পতার বিষয়টি উল্লেখ করেন এবং মুসলমানদের জন্য যথোচিত শিক্ষাব্যবস্থা কি হবে– তা ব্যাখ্যা করেন এবং বলেন, ধর্মীয় শিক্ষা ও লোকায়ত শিক্ষার সমন্বয়ে গঠিত শিক্ষাপদ্ধতিই হবে তাদের জন্য সঠিক শিক্ষাব্যবস্থা। তাঁর ভাষায় ঃ

I have always held that unless and until there is a combination of secular and religious instruction in institutions intended for the education of Muhammadan boys, the complicated problem of Muhammadan education cannot be properly solved ..... To a Musalman education means first religious education, secondly moral education and lastly professional Education.[২০]

নিউস্কীম মাদ্রাসা শিক্ষা প্রবর্তন ও আধুনিক শিক্ষার বিস্তার সাধন

১৯০৫ খ্রীঃ পূর্ববংগ ও আসাম নামক একটি নতুন প্রদেশ গঠিত হয়। সে সময় এতদঞ্চলের মুসলমানদের মধ্যে প্রাণচাঞ্চল্য পরিলক্ষিত হয়। শিক্ষা–দীক্ষার অগ্রগতি অর্জনের জন্য তারা স্বাধীনভাবে চিন্তা–ভাবনা করতে আরম্ভ করেন। এ পথে অগ্রণীর ভূমিকা পালন করেন নওয়াব

Dhaka University Institutional Repository

সলীমুল্লাহ বাহাদুর (১৮৭১-১৯১৫), নওয়াব শামসুল হুদা (১৮৪০-১৯২২), নওয়াব আলী চৌধুরী (১৮৬৩-১৯২৯), মওলানা আবু নসর ওহীদ (১৮৭২-১৯৫৩) প্রমুখ। এ সময় মওলানা আবু নসর ওহীদ মওলানা শিবলীর ন্যায় প্রাচীন ইসলামী শিক্ষা ও আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষার সমন্বয়ে একটি নিউস্কীম মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থার পরিকল্পনা পেশ করেন (১৯১০)। তাঁর সে পরিকল্পনা ১৯১৪ সালে সরকার কর্তৃক গৃহীত হয় এবং ১৯১৫ সালে তা প্রবর্তিত হয়। এ স্কীমের বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, এ শিক্ষাসূচিতে ইংরেজীকে বাধ্যতামূলক করা হয় এবং ফার্সী শিক্ষাকে বাদ দেয়া হয়। চারটি সরকারী মাদ্রাসা, পাঁচটি সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত মাদ্রাসা ও বেশ কয়েকটি প্রাইভেট মাদ্রাসা এ স্কীমের অন্তর্ভুক্ত হয়। কলিকাতা মাদ্রাসাকে এ স্কীমের বাইরে রাখা হয়। এ স্কীমের জন্য যে পাঠ্যসূচীর সুপারিশ করা হয়, তা ছিল এই ঃ কুরআন, উর্দু, বাংলা, অংক, ভূগোল, ইতিহাস, ইংরেজী, আরবী, ড্রইং (অংকন), সূচীকর্ম (দটভঢ ষমরপ) ও ড্রিল। সিনিয়র ক্লাসের পাঠ্যসূচিতে আরবী, ইংরেজী ও অংকের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

নিউস্কীম মাদ্রাসা প্রবর্তনের ফলে আধুনিক শিক্ষাক্ষেত্রে বংগীয় মুসলমানদের, বিশেষত পূর্ব বংগীয় (বর্তমানে বাংলাদেশী) মুসলমানদের বিশেষ উন্নতি সাধিত হয়। এ স্কীমে ডঃ এস. এম. হুসাইন, ডঃ এম. এ. বারী, জনাব এ. এফ. আবদুল হক, ডঃ কাজী দীন মুহম্মদ, মওলানা ইয়াকুব শরীফ, জনাব এ. এস. মাহমুদ, অধ্যাপক জনাব এ. টি. এম. মুসলিহ উদ্দীনের ন্যায় খ্যাতনামা আরবী-ফার্সীবিদ সৃষ্টি হয়।

১৯১৯ খ্রীঃ ঢাকা মাদ্রাসাকে ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজে পরিণত করা হয়। ১৯১৯ খ্রীঃ আই. এ. ১ম বর্ষ এবং ১৯২০ খ্রীঃ ২য় বর্ষ খোলা হয়। চট্টগ্রাম মাদ্রাসা এবং হুগলী মাদ্রাসাকেও ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজে উন্নীত করা হয় যথাক্রমে ১৯২৭ ও ১৯৩৯ সালে। এ ছাড়া সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত সিরাজগঞ্জ হাই মাদ্রাসাকেও কলেজে পরিণত করা হয়। এ কলেজগুলো ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। বিশ শতকের গোড়ার দিকে বাংলার মুসলমানরা শিক্ষা-দীক্ষায় হিন্দুদের পাশাপাশি দাঁড়াবার মানসে এবং একাধারে ধর্মীয় ও পার্থিব শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে নিউস্কীম মাদ্রাসা প্রবর্তন করেছিল। তাদের সে উদ্দেশ্য অনেকটা সফল হয়েছে।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর দেশে জাতীয় সরকার গঠিত হলে পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটে। সেই প্রেক্ষাপটে চলতি শতকের ষষ্ঠ দশকের দিকে সকল নিউস্কীম মাদ্রাসাকে হাইস্কুলে এবং ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজগুলোকে জেনারেল কলেজে পরিণত করা হয়। ১৯১৫ খ্রীঃ থেকে আরম্ভ করে প্রায় চল্লিশটি বছর এই শিক্ষাব্যবস্থা মুসলমানদের আধুনিক শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ করে এবং মুসলিম

Dhaka University Institutional Repository

সমাজের তাৎক্ষণিক প্রয়োজন মেটাতে সাহায্য করে। এ শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে বাংলাদেশে আরবী শিক্ষার মানও কতকটা উন্নতি লাভ করে।

নিউস্কীম মাদ্রাসা আধুনিক শিক্ষা বিস্তারে যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল, তা বর্ণনা করে মরহুম আবদুল হক ফরিদী বলেন ঃ

প্রসংগত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, প্রধানত নিউ স্কীম মাদ্রাসা শিক্ষার মাধ্যমে এ অর্ধ শতকে ইংরেজী শিক্ষার প্রতি বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত ও নিম্ন–মধ্যবিত্ত মুসলিম সমাজের বৈরী মনোভাবে প্রায় অজ্ঞাতসারেই যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়, তা আনার ক্ষেত্রে নিউস্কীম মাদ্রাসার ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। মুসলমানদের অনীহা ও বিমুখতা প্রথমে মৃদু মনোযোগ, পরে আগ্রহ এবং অবশেষে আকর্ষণে পরিণত হয়। ক্রমবর্ধমান সংখ্যায় তাঁরা ইংরেজী শিক্ষার প্রতি ঝুঁকে পড়েন। কাজেই ক্রমে সর্বস্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মুসলিম ছাত্র, শিক্ষক, অধ্যাপক, অধ্যাপিকা, অধ্যক্ষ, ব্যবস্থাপক ইত্যাদির সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। এদের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ আসেন নিউস্কীম মাদ্রাসায় শিক্ষিত তরুণদের মধ্য থেকে।[২১]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও আধুনিক শিক্ষা বিস্তার

পূর্বেই বলা হয়েছে, মুসলমানদের উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ অনুকূল ছিল না। অগত্যা তারা আলীগড় কলেজকেই তাদের জাতীয় কলেজ বলে ভাবতো। পূর্ববাংলার অনেকেই ঐ কলেজে অধ্যয়ন করেন। এমনকি আলীগড় কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করার আন্দোলনেও তাঁরা শরীক হয়েছিলেন। বাংলাদেশ থেকে অনেকে চাঁদাও দিয়েছিলেন। পূর্ববাংলার মুসলমানরা ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যাশা তো করেছিলেন, কিন্তু আলীগড়ের ব্যাপারে যেমন একটা আন্দোলন গড়ে উঠেছিল, ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য তেমন একটা আন্দোলন গড়ে উঠে নি। তবে পূর্ববংগ ও আসাম প্রদেশ গঠিত হওয়ার পর এই নতুন প্রদেশটি শিক্ষা–দীক্ষায় বেশ কিছুটা অগ্রসর হয়। কিন্তু বংগবিভাগ রদের (১৯১১) ফলে বাংলাদেশের মুসলিম সমাজে নৈরাজ্য ও ক্ষোভ সৃষ্টি হয়। তারা ভারতে শুরু করে যে, এখানে অগ্রগতির যে জোয়ার এসেছে, বংগবিভাগ রদের ফলে তাতে নিশ্চয়ই ভাটা পড়বে। এই নৈরাজ্য ও ক্ষোভ প্রশমনের জন্য বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ ঢাকায় আসেন এবং ১৯১২ সালের ৩১ জানুয়ারি এক মুসলিম প্রতিনিধি দলের নিকট ঘোষণা করেন ঃ "বিগত পাঁচ বছরে এই প্রদেশের যথেষ্ট উন্নতি লাভের পরিপ্রেক্ষিতে ভারত সরকার এখানকার শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা এত বেশী উপলব্ধি করেন যে, ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের

Dhaka University Institutional Repository

জন্য এবং পূর্ববংগ শিক্ষা বিভাগীয় একজন স্বতন্ত্র কর্মচারী নিয়োগের জন্য তাঁরা ভারত সচিবের (ভারত মন্ত্রী) নিকট সুপারিশ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।"

লর্ড হার্ডিঞ্জের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ঘোষণাকে মুসলমানরা বংগবিভাগ প্রত্যাহারের ক্ষতিপূরণ মনে করে নয়, বরং উচ্চশিক্ষা লাভের সোপান বিবেচনা করেই স্বাগত জানায়। কিন্তু এ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে মুসলিম নেতৃবৃন্দের অনেক কাঠ-খড় পোড়াতে হয় এবং দীর্ঘ ৯/১০-টি বছর তাদেরকে অপেক্ষা করতে হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ঘোষণা শুনেই হিন্দু বুদ্ধিজীবী ও হিন্দুনেতৃবৃন্দ এর বিরোধিতায় উঠে পড়ে লাগলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দিয়ে লর্ড হার্ডিঞ্জ কলকাতায় ফিরে গেলে স্যার রাসবিহারী ঘোষের নেতৃত্বে শীর্ষস্থানীয় হিন্দুদের এক প্রতিনিধি দল তাঁর সংগে সাক্ষাৎ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করেন। কিন্তু ভাইসরয় তাঁর প্রতিশ্রুতিতে অনড় থাকেন এবং উত্তরে বলেন ঃ "আমি সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম অধিবাসীদের মধ্যে একটা ব্যাপক ভয়, নৈরাশ্য ও সন্দেহ লক্ষ্য করেছি; তারা মনে করে যে, বংগবিভাগ রদের ফলে হয়তো তাদের ক্রমবর্ধমান উন্নতি ব্যাহত হবে। আমি তাদের প্রতিনিধি দলকে আশ্বস্ত করে বলেছি যে, বিগত কয়েক বছরে তারা শিক্ষায় এত বেশি উন্নতি লাভ করেছে যে, ভারত সরকার মুগ্ধ হয়ে ভারত সচিবের নিকট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য সুপারিশ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এবার ডঃ হার্ডিঞ্জের ভাষায় দেখা যাক ঃ

When I visited Dacca, I found a widespread apprehension, particularly among the Moslems, who form the majority of the population, lest the attention which the partition of Bengal secured for the eastern provinces should be relaxed, and that there might be a setback in educational progress. It was to allay this not unreasonable apprehention that I stated to a deputation of Moslem gentlemen that the Government of India were so much impressed with the necessity of promoting education in a province which had made such good progress during the past few years that we have decided to recommend to the Secretary of State the constitution of a University at Dacca and the appointment of a special officer for education in Eastern Bengal.[২২]

Dhaka University Institutional Repository

১ম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা বিলম্বিত হয়। ১৯১৭ সালের ২৬ নভেম্বর বেংগল গভর্নমেন্ট এক ঘোষণায় মুসলমানদের এ নিশ্চয়তা প্রদান করেন যে, ন্যাথান কমিটির রিপোর্ট সম্পর্কে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের অনুমোদন পাওয়ার পর যথাসময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হবে। ১৯১৭ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন গঠিত হয় এবং ন্যাথান কমিটির রিপোর্ট সেই কমিশনের নিকট অনুমোদনের জন্য পাঠানো হয়। কমিশনের অনুমোদন লাভের পর ১৯২০ সালের ২৩ মার্চ ভাইসরয়ের ব্যবস্থাপক পরিষদে "ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এ্যাক্ট" পাস করা হয়। এখানেও ভাইসরয়-কাউন্সিলের হিন্দু সদস্যগণ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করেন। যাহোক, সাত ঘাটের জল খাওয়ার পর ১৯২১ সালের জুলাই মাসে বহু প্রতীক্ষিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশোনা যথারীতি আরম্ভ হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল বাংলাদেশের জনগোষ্ঠীর জন্য আধুনিক উচ্চশিক্ষার সূতিকাগার। ১৯৫৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এবং ১৯৬৫ সালে প্রতিষ্ঠা লাভ করে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়। এ দু'টি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এককভাবে বাংলাদেশের আধুনিক উচ্চশিক্ষা বিস্তারে এক মহান ভূমিকা পালন করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায় শিক্ষিত লোকেরাই প্রধানত বাংলাদেশের আনাচ-কানাচে আধুনিক শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেন। এঁরা দেশবাসীর মধ্যে জাতীয় জাগরণ সৃষ্টি করেন; দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন; জাতীয় ও রাজনৈতিক চেতনা সঞ্চারে এঁদের অবদান অপরিসীম। পাকিস্তান আন্দোলন, বাংলাভাষা আন্দোলন ও বাংলাদেশ আন্দোলন প্রধানত এঁরাই ত্বরান্বিত করেন।

পূর্ববাংলার মুসলমান-প্রধান অঞ্চলের জনগণের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলেও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার (১৯৪৭) পূর্বক্ষণ পর্যন্ত এ প্রতিষ্ঠান হতে মুসলমানদের চাইতে অমুসলমানেরাই বেশি উপকৃত হয়। তৎকালে বাংলাদেশের মুসলমানগণ শিক্ষাক্ষেত্রে এতটা পেছনে ছিল যে, উচ্চশিক্ষা লাভের সুযোগ তারা নিতে পারে নি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার খরচ যোগাবার মত বিত্তশীল অভিভাবকবর্গ তখনো গড়ে উঠে নি। কিন্তু ১৯৪৭ খ্রীঃ ব্যাপারটি অন্যরূপ হয়ে দাঁড়ায়। তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দু ছাত্র-শিক্ষকদের অনেকেই দেশ ত্যাগ করে চলে যায়।

শিক্ষা, সমাজ ও রাজনীতি ক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবদানের কথা উল্লেখ করে শ্রদ্ধেয় উস্তাদ মরহুম প্রফেসর আবদুর রহীম বলেন ঃ

The higher education at the University of Dacca had an important role in the educational development of the people of Eastern Bengal. Its extended educational facilities benefitted all sections of its inhabitants.

Dhaka University Institutional Repository

As a result, this backward region made rapid advance in Education and it was soon regarded as a progressive part of the subcontinent. It is to be noted that the Dacca University promoted an intellectual awakening and produced an impact of great social and political significance in the history of this Country.[২৩]

কলিকাতা ইসলামিয়া কলেজ

বাংলার মুসলিম নেতৃবৃন্দ বিশ শতকের গোড়া থেকেই একটি মুসলিম কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য গভর্নমেন্টের নিকট দাবি জানিয়ে আসছিলেন। কিন্তু ঐ দাবি পূরণ হয় দীর্ঘকাল পর ১৯২৬ সালে।

এগ্‌জেকিউটিভ কাউন্সিল–সদস্য থাকাকালে নওয়াব শামসুল হুদা কলকাতায় একটি মুসলিম কলেজ স্থাপনের উদ্দেশ্যে নয় লক্ষ টাকার বিনিময়ে ওয়েলেস্‌লী স্ট্রীটে একখন্ড জমি খরিদ করেন।[৯৯] কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের দরুন তাঁর পক্ষে কলেজটি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয় নি। ১৯২৬ সালে বহু চেষ্টার পর এ. কে. ফজলুল হক কর্তৃক ইসলামিয়া কলেজ নামে ঐ কলেজটি প্রতিষ্ঠিত হয়।[১০০] এটি ছিল বাংলার একমাত্র জেনারেল মুসলিম কলেজ। ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ২০ বছর ধরে কলেজটি বাংলার মুসলমানদের মধ্যে আধুনিক শিক্ষাবিস্তারে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করে। ভারত বিভাগের পর কলেজটি 'মওলানা আযাদ কলেজ' নামে অভিহিত হয়।

বিশ শতকের গোড়া থেকে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত আরবী ও ইংরেজী শিক্ষার আধুনিকায়নের জন্য বিভিন্ন সময় কনফারেন্স ও কমিটি গঠিত হয়। বিশ শতকের প্রথমার্ধে আর্ল কনফারেন্স (১৯০৭), হর্নেল কমিটি (১৯১৪), হার্লে কমিটি (১৯১৫), শামসুল হুদা কমিটি (১৯২১), মুমিন কমিটি (১৯৩১), মওলা বখ্‌শ কমিটি (১৯৩৮), সৈয়দ মুআয্‌যম হোসেন কমিটি (১৯৪৬) ইত্যাদি গঠিত হয় এবং এমনি করে বিভিন্ন দৃষ্টি কোণ্‌ থেকে ক্রমাগত মাদ্রাসা শিক্ষা ও আধুনিক শিক্ষার যথোপযোগী সংস্কার তথা আধুনিকায়ন করা হয়। এগুলোর মধ্য দিয়ে ধাপে ধাপে বাংলার মুসলমানদের মধ্যে আধুনিক শিক্ষাবিস্তার লাভ করতে থাকে।

ঐ কমিটিগুলোর মধ্যে 'হর্নেল কমিটি' ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ১৯১৩ সালের ৩রা এপ্রিল ভারত সরকার বাংলা সরকারের নিকট এ মর্মে একটি পত্র লিখলেন যে, এমন একটি কমিটি গঠন করা হোক, যার উদ্দেশ্য হবে শিক্ষায় মুসলিম সম্প্রদায়ের পশ্চাৎপদতার কারণ নির্ণয় করা এবং এর নিরসনের জন্য সরজমিনে তদন্ত করে পদক্ষেপসমূহ সম্পর্কে সুপারিশ করা।

Dhaka University Institutional Repository

ঐ পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা সরকার ১৯১৪ সালে বাংলার তদানীন্তন জনশিক্ষা পরিচালক ডব্লিউ. ডব্লিউ. হর্নেলের নেতৃত্বে ১৪ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করেন। এ কমিটিতে বাংলার মুসলমানদের সাধারণ শিক্ষা, কারিগরি শিক্ষা, নৈতিক শিক্ষা, ধর্মীয় ও স্ত্রীশিক্ষার বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখা হয় এবং মুসলিম শিক্ষার উন্নয়নের জন্য ১৯৭টি সুপারিশ করা হয়। বাংলা সরকার ১৯১৬ সালের ৩রা আগস্ট কমিটির রিপোর্ট বিবেচনা করে একটি সার্কুলার প্রকাশ করেন। ঐ ঘোষণা অনুযায়ী মুসলিম শিক্ষার সম্প্রসারণে বেশ কতগুলো ফলপ্রসূ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। ঐ ঘোষণায় বলা হয় যে, রাজনীতি ক্ষেত্রে হোক বা অন্য ক্ষেত্রেই হোক–দেশের উন্নতি নির্ভর করছে শিক্ষাদীক্ষায় হিন্দু–মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের সম-উন্নতি সাধনের উপর, সরকার যে সুযোগ-সুবিধা দিচ্ছেন বা দেবেন, তা উভয় সম্প্রদায়ের সদৃশ গ্রহণের উপর। ভারত সরকার উদ্বেগসহকারে প্রত্যাশা করছেন যে, মুসলিম শিক্ষার জন্য যথোপযুক্ত সুযোগ–সুবিধা দেয়া হোক। বাংলা সরকারও মনে করেন যে, বিভিন্ন চেষ্টা সত্ত্বেও মুসলমানরা যে সুবিধাদি হারিয়েছে, তা তারা পুনরায় গ্রহণ করুক, বিশেষ সুবিধাদি দ্বারা উপকৃত হোক, সরকারী ও আধা সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রদত্ত সুযোগ হিন্দুদের সাথে সমভাবে মুসলমানরাও ভোগ করুক– এতে জনগণেরও স্বার্থ রয়েছে, সরকারেরও স্বার্থ রয়েছে। এবার বাংলা সরকারের হুবহু ভাষায় শোনা যাক ঃ

The development of the country, in political as well as in other directions, is dependent on the uniform educational progress of the two main constituents of the population and on their equal capacity to take advantage both of the opportunities now open to them and of the fuller opportunities which may be available hereafter. The Government of India were anxious that all reasonable facilities should be provided for the education of Moslems, and the Governor in Council is convinced that it is in the interests both of the Government and the people as a whole that the Moslems who, in spite of recent efforts, have still much lost ground to make up, should receive such special facilities as may be necessary to enable them to benefit, as fully as the Hindus, from the educational institutions which are maintained wholly or partially, out of public funds.

Dhaka University Institutional Repository

১৯১৪-এর মোহামেডান এডুকেশন কমিটি (হর্নেল কমিটি) প্রদত্ত মুখ্য সুপারিশসমূহের একটি বিশ্লেষণঃ

মুসলমানদের জন্য অবশ্য স্বতন্ত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করার প্রয়োজন রয়েছে, কিন্তু পৃথক শিক্ষা পদ্ধতির আর অধিক বিকাশ ঘটানো বাঞ্ছনীয় হবে না; তবে বর্তমান পরিস্থিতির মুকাবিলা করার জন্য সতর্কতার সাথে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থাটির সামঞ্জস্য বিধান করতে হবে।

ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডসমূহের শিক্ষা কমিটি এবং অর্থ কমিটিতে মুসলমান সদস্যের সংখ্যা যথোচিত নয়; এই উভয় কমিটিতেই মুসলমান সদস্য-সংখ্যা বর্ধিত করতে হবে; ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডসমূহে মুসলমান সদস্যের সংখ্যা তাদের জনশক্তির সমানুপাতিক হওয়া উচিত।

মক্তবের শিক্ষণীয় বিষয়াবলীকে অবশ্য আরো ধর্মনিরপেক্ষ করতে হবে; তবে সেখানে ইসলামের বিধান অনুযায়ী ধর্মীয় এবং নৈতিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা রাখা উচিত-বিশেষজ্ঞ শিক্ষক এই শিক্ষা প্রদান করবেন কিংবা স্থানীয় মোল্লাদের এই শিক্ষাদান কার্যে নিয়োগ করা অধিকতর বাঞ্ছনীয় হবে। সাধারণ প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে শুক্রবার এক ঘণ্টা এবং অন্যান্য দিন আধ ঘণ্টার জন্য বিশ্রামের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

টেক্স্টবুক কমিটিতে যথোচিত মুসলিম প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করতে হবে; মুসলমান লেখকরা যাতে তাদের রচিত পুস্তকাবলী পাণ্ডুলিপির আকারে উপস্থাপিত করতে পারেন, সে জন্য অনুমতি প্রদান করতে হবে; ইসলামী বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পুস্তক প্রকাশের জন্য সরকার লেখকদের উৎসাহিত করবেন। মক্তব-পাঠ্য সংকলন গ্রন্থসমূহ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিকল্প পাঠ্য হিসাবে গ্রহণ করতে হবে।

মুসলমান ছাত্রদের জন্য আরো অধিক সংখ্যায় প্রাথমিক ছাত্রবৃত্তি সংরক্ষিত করা উচিত। বৃত্তি বিতরণের পদ্ধতি সতর্কতার সাথে পরীক্ষা করে দেখা দরকার। কলকাতা, ঢাকা, মুর্শিদাবাদ এবং অপরাপর যে সকল অঞ্চলে মুসলমানদের মাতৃভাষা উর্দু, সে সকল স্থান ব্যতীত সর্বত্র প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষার বাহন হবে সেখানকার ছাত্রদের মাতৃভাষা অর্থাৎ বাংলা।

মক্তবের জন্য জেলাবোর্ডের অর্থ সাহায্য জেলাবোর্ড বাজেটে স্বতন্ত্র খাতে প্রদর্শন করতে হবে।

বিভিন্ন স্কুলের পরিচালনা কমিটিতে মুসলমান সদস্যের সংখ্যা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। সরকারি স্কুলগুলোর পরিচালনা কমিটিতে অন্তত দু'জন সদস্য থাকবেন মুসলমান, পূর্ববংগীয় জেলার স্কুলে দশজন সদস্যের মধ্যে ছ'জন হবেন মুসলমান, পশ্চিম বংগীয় জেলার স্কুলে দশজন সদস্যের চারজন হবেন মুসলমান-সরকারি সাহায্য প্রাপ্তির এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন লাভের এটি হবে অন্যতম শর্ত।

Dhaka University Institutional Repository

সরকারি স্কুলগুলোতে অধিক সংখ্যায় মুসলমান শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে এবং মুসলমান শিক্ষকদের উচ্চতর প্রারম্ভিক বেতন প্রদান করতে হবে। সরকারি অর্থ সাহায্য মঞ্জুর করার সময় সরকার শর্ত করিয়ে নেবেন যে, স্কুলে পর্যাপ্ত সংখ্যক মুসলমান শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে।

যাদের মাতৃভাষা উর্দু নয়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাদের জন্য উর্দুকে দ্বিতীয় পাঠ্য ভাষা হিসাবে অনুমোদিত করবেন।

বর্তমানে মুহসিন তহবিলের যে আয় কতিপয় মাদ্রাসার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নির্ধারিত রাখা হয়েছে, তা থেকে উক্ত অর্থকে মুক্ত করতে হবে এবং সে অর্থ ছাত্রবৃত্তি প্রদানে ও বিভিন্ন কলেজে স্বল্প পরিমাণ বেতন প্রদানে নিয়োজিত করতে হবে। ছাত্রাবাসসমূহে মুসলমান স্কুল-ছাত্রদের জন্য উন্নত আবাসিক ব্যবস্থা করতে হবে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটে অধিকতর সংখ্যায় মুসলমান সদস্য গ্রহণ করা উচিত; মুসলমান জনসংখ্যা সমগ্র জনসংখ্যার যে আনুপাতিক অংশ, তদনুযায়ী সিনেটে মুসলমান সদস্যের সংখ্যা সর্বমোট ভারতীয় সদস্যের সমানুপাতিক হওয়া উচিত। মুসলমান ফেলোরা যাতে সিন্ডিকেটে তাঁদের মধ্য থেকে একজন প্রতিনিধি মনোনীত করতে পারেন, তার ব্যবস্থা করা বাঞ্ছনীয় এবং অধ্যয়ন সংক্রান্ত প্রতিটি বোর্ডেই অন্তত একজন মুসলমান সদস্য গ্রহণ করতে হবে।[২৪]

হর্নেল কমিটির সুপারিশমালার আলোকে বাংলা সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহ ছিল এই ঃ

১. সকল সরকারী কলেজ ও সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত কলেজে ছাত্র ভর্তির জন্য যতগুলো সীট শূন্য হবে, তন্মধ্যে ২৫% সীট মুসলমান ছাত্রের জন্য সংরক্ষিত রাখা হবে।

২. সকল সরকারী স্কুলে প্রত্যেক বছর ও প্রত্যেক ক্লাসে ভর্তির জন্য যতগুলো সীট শূন্য হবে, তন্মধ্যে শতকরা কয়েকটি সীট মুসলমান ছাত্রের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

৩. ঢাকা মাদ্রাসা, চট্টগ্রাম মাদ্রাসা, হুগলী মাদ্রাসা ও রাজশাহী মাদ্রাসার ব্যয়ভার মুহসিন ফান্ড হতে নির্বাহ না করে রাজস্ব তহবিল থেকে দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়। এ ব্যবস্থাধীনে যে অর্থ বেচে গিয়েছিল, তদ্দ্বারা কলেজ, হাইস্কুল ও মাদ্রাসার মুসলমান ছাত্রদেরকে বিশেষ বৃত্তি দেয়া হয়।

৪. সাধারণ স্কুল ও সাধারণ কলেজের মুসলমান ছাত্রের এই অভিযোগ ছিল যে, এসব প্রতিষ্ঠানে মুসলিম শিক্ষক নিয়োগ করা হচ্ছে না। এই অভিযোগ নিরসনের জন্য আরবী-ফার্সীর শিক্ষক ছাড়া সাধারণ বিষয়ের মুসলমান শিক্ষক নিয়োগেরও ব্যবস্থা করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

৫. মুসলিম শিক্ষার জন্য একজন মুসলমান সহকারী জনশিক্ষা–পরিচালক নিয়োগ করা হয়।

৬. সরকারী স্কুল–কলেজে শুক্রবারে জুমা নামাযের জন্য কিছুক্ষণ শিক্ষা কার্যক্রমের বিরতির ব্যবস্থা করা হয়।

৭. কলকাতার মুসলমান ছাত্রদের আবাসিক সমস্যা লাঘব করার জন্য ১৯১৫ সালে ওয়েলিংটন স্ট্রীটে টেলর হোস্টেল স্থাপন করা হয়।

৮. বেকার-মাদ্রাসা হোস্টেলে অতিরিক্ত ৭০টি সীটের ব্যবস্থা করা হয়।

৯. সংস্কারকৃত মাদ্রাসাসমূহের ছাত্রদের জন্য অধিকতর বৃত্তির ব্যবস্থা করা হয়।

১০. ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ও মেডিক্যাল কলেজের মুসলমান ছাত্রদের জন্য অধিক হারে বৃত্তির ব্যবস্থা করা হয়।

১৯৩১ সালে খানবাহাদুর আবদুল মোমেনের নেতৃত্বে 'মুসলিম এডুকেশন অ্যাড্‌ভাইজারি কমিটি' গঠিত হয়। এটি মোমেন কমিটি' নামে পরিচিত। এ কমিটির উদ্দেশ্য ছিল বাংলার মুসলমানদের সাধারণ শিক্ষা তথা আধুনিক শিক্ষার উন্নতির জন্য পরামর্শ দেয়া। এ কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হয় ১৯৩৪ সালে। এই রিপোর্টের আলোকে গভর্নমেন্ট মুসলিম শিক্ষার উন্নতির জন্য বেশ কয়েকটি পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।[২৫] অন্যান্য কমিটিগুলো বিশেষত মাদ্রাসা শিক্ষার সংস্কারের উদ্দেশ্যে গঠিত হয়েছিল। সেগুলোতে আধুনিক শিক্ষার বিষয়টি ছিল গৌণ। তাই সেগুলোর আলোচনার প্রয়োজন এখানে আছে বলে মনে করি না।

মোমেন কমিটির মুখ্য কয়েকটি সুপারিশ ঃ

প্রাইমারি স্কুল সংক্রান্ত–

১. প্রাইমারি এডুকেশন এ্যাক্ট মোতাবেক বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তিত না হওয়া পর্যন্ত মক্তবসমূহকে স্বতন্ত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বলে বিবেচনা করতে হবে।

২. মক্তবের ছাত্রদেরকে মাতৃভাষার মাধ্যমে কুরআন ও ধর্মীয় শিক্ষা দিতে হবে।

৩. হিন্দু–মুসলিম মিশ্রিত প্রাথমিক স্কুলে উভয় সম্প্রদায়ের শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে। যে স্কুলে দু'জন শিক্ষক থাকবে, সেখানে একজন অবশ্যই মুসলমান থাকবে।

৪. যে কোন সম্প্রদায়ের ধর্মীয় অনুভূতি ক্ষুণ্ন হতে পারে, এমন কোন ধর্মীয় প্রতীকের প্রদর্শন বা ধ্বনির ব্যবহার বন্ধের জন্য বিধি প্রণয়ন করা উচিত।

Dhaka University Institutional Repository

৫. প্রত্যেক প্রাইমারি স্কুলে মুসলমান ছাত্রদের জুমা নামায সম্পাদন করার জন্য শুক্রবার এক ঘণ্টা এবং অন্যান্য দিন যোহরের নামায পড়ার জন্য অর্দ্ধ ঘণ্টা কর্মবিরতি পালন করতে হবে।

৬. স্থানীয় সংস্থার শিক্ষা-কমিটিসমূহে এবং প্রাথমিক শিক্ষা আইনের আওতাভুক্ত স্কুলসমূহে মুসলিম সম্প্রদায়ের যথাযথ প্রতিনিধিত্ব থাকা উচিত।

৭. দেশের আর্থিক সংকট থাকা সত্ত্বেও অত্র প্রদেশে প্রাথমিক শিক্ষা আইন বাস্তবায়িত করতে হবে। কারণ কমিটির মতে মুসলিম জনসাধারণের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের সব চাইতে নিশ্চিত উপায় হলো– প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করা।

৮. পৌরসভাগুলোকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য উৎসাহিত করতে হবে এবং এ উদ্দেশ্যে পাঁচ বছরের মধ্যে পৌরসভাগুলোকে অপরিহার্যভাবে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য গভর্নমেন্টকে আইন প্রণয়ন করতে হবে।

৯. প্রাথমিক শিক্ষালাভের পর মেধাবী ও উদীয়মান মুসলমান ছাত্ররা যাতে মাধ্যমিক স্কুলে ও মাদ্রাসায় উচ্চতর শিক্ষালাভ করতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে দুই বছর মেয়াদী বেশকিছু সংখ্যক বৃত্তির ব্যবস্থা করতে হবে, যা তারা প্রাথমিক স্কুল হতে মাধ্যমিক স্কুলে গিয়ে ভোগ করতে পারে।

১০. স্কুল–বোর্ডের অন্তত অর্দ্ধেক সদস্য মুসলমান থাকা উচিত।[২৬]

মাধ্যমিক স্কুল সম্পর্কিত–

১. সরকারী হাইস্কুলে মুসলিম শিক্ষকের সংখ্যা দেশের মুসলমান জনসংখ্যার অনুপাতে হওয়া উচিত।

২. সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত বেসরকারী মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষক নিয়োগের বেলায় মুসলিম প্রতিনিধিত্বের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত। শিক্ষকবর্গের মোটসংখ্যার মধ্যে ৪৫% মুসলমান হতে হবে এবং সরকারী সাহায্য প্রাপ্তির জন্য এই শর্তকে অবশ্য পালনীয় করতে হবে।

৩. সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলের ম্যানেজিং কমিটিতে মুসলিম সম্প্রদায়ের যথাযথ প্রতিনিধিত্ব থাকতে হবে এবং কোনভাবেই তা মোট সদস্য সংখ্যার ৩৩%-এর কম হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়।

৪. সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত নয়, এমন সব হাইস্কুলের ম্যানেজিং কমিটি ও শিক্ষক স্টাফে যাতে মুসলমানদের নিশ্চিত ও সক্রিয় প্রতিনিধিত্ব থাকে, তদ্‌রূপ পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়কে অনুরোধ করা হোক।

৫. মাধ্যমিক স্কুলের কারিকুলামে ধর্মীয় শিক্ষার ব্যবস্থা রাখতে হবে এবং মধ্যস্তর পর্যন্ত তা বাধ্যতামূলক করতে হবে।

৬. স্কুলের ২০% ফ্রী–স্টুডেন্টশিপ মুসলমান ছাত্রদের দিতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

৭. মুসলিম ছাত্রসংখ্যা যা-ই হোক না কেন, প্রত্যেক ইংলিশ হাইস্কুলে দ্বিতীয় ভাষারূপে আরবী–ফার্সী শিক্ষাদানের ব্যবস্থা রাখতে হবে।

৮. মুসলিম-প্রধান অঞ্চলে অবস্থিত স্কুলে যথেষ্ট পরিমাণে সরকারী সাহায্য দিতে হবে। এই ব্যবস্থা বিদ্যমান তহবিলের পুনর্বণ্টনের মাধ্যমে করতে হবে, অথবা অতিরিক্ত তহবিলের ব্যবস্থা করতে হবে।

৯. মুসলিম প্রধান অঞ্চলে যাতে নতুন হাইস্কুল খোলা যেতে পারে, সে জন্য যথাযথ সুবিধাদি দিতে হবে।

১০. কলিকাতা মাদ্রাসার অ্যাংলো–পার্সিয়ান হাইস্কুল, ঢাকার মুসলিম হাইস্কুল, চট্টগ্রামের মুসলিম হাইস্কুল এবং কলকাতার দু'টি সরকারী মিডল ইংলিশ হাইস্কুল বহাল রাখতে হবে। শিক্ষকদের আবাসিক ব্যবস্থা এবং স্কুলের শিক্ষা উপকরণের উন্নতি বিধান করতে হবে।

১১। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার জন্য ইসলামের ইতিহাসকে ঐচ্ছিক বিষয়রূপে নির্বাচিত করার ব্যবস্থা রাখতে হবে।[২৭]

কলেজ সংক্রান্ত–

১. কলেজে এখন ৫% ছাত্রকে ফ্রী-স্টুডেন্টশিপ দেয়া হয়। এই পরিমাণকে বাড়িয়ে ৮% করা হোক এবং মুসলমান ছাত্রদের জন্য ৬% ফ্রী-স্টুডেন্টশিপ সংরক্ষিত রাখা হোক।

২. সরকারী কলেজে শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে মুসলিম স্বার্থ ও প্রতিনিধিত্বের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। প্রভাষক নিয়োগের ক্ষেত্রে নির্বাচনের ব্যাপারটি কলেজের গভর্নিং বডিতে প্রেরণ না করে শুধু জনশিক্ষা পরিচালক-কেই তা সম্পন্ন করা উচিত।

৩. মেডিক্যাল, ইঞ্জিনিয়ারিং, বেটেরিনারি ও ট্রেনিং কলেজে নির্দিষ্ট সংখ্যক আসন মুসলমান ছাত্রদের জন্য সংরক্ষিত রাখা হোক এবং চাহিদা অনুসারে সেই পরিমাণ বাড়ানো হোক।

৪. ইসলামিয়া কলেজে বি. কম. ক্লাস প্রবর্তন করা হোক এবং ঢাকা ও চট্টগ্রাম ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজে যথাশীঘ্র বিজ্ঞান শাখা খোলা হোক। ইসলামিয়া কলেজে ভূগোল, উদ্ভিদ বিজ্ঞান, পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন ও ফিজিওলজি বিষয় খোলার ব্যবস্থা করা হোক।

৫. অফিসার নিয়োগ সংক্রান্ত সিলেকশন–বোর্ডে, বিশেষত বেংগল এডুকেশন সার্ভিসের জন্য গঠিত কমিটিতে মুসলিম প্রতিনিধি নিয়োগ করা উচিত।

Dhaka University Institutional Repository

৬. সাবর্ডিনেট এডুকেশন্যাল সার্ভিস থেকে বেংগল এডুকেশন্যাল সার্ভিসে যে পদোন্নতি দেয়া হয়, তা সিলেকশন-বোর্ডে না পাঠিয়ে শুধু গভর্নমেন্টকেই তা করা উচিত।

৭. বৃত্তিমূলক ও কারিগরি কলেজে ভর্তির ক্ষেত্রে মুসলমান ছাত্রের বেলায় বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদিত নিম্নতম যোগ্যতার অধিকারী প্রার্থীকে ভর্তি হওয়ার সুযোগ দেওয়া হোক।[২৮]

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত-

১. রেজিস্টার্ড গ্রেজুয়েটদের ভোটে সিনেট সদস্যদের যে নির্বাচন হয়ে থাকে, তা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদ্ধতি অনুসারে হওয়া উচিত। অর্থাৎ মুসলিম গ্রেজুয়েটগণ মুসলিম সদস্য এবং অমুসলিম সদস্যগণ অমুসলিম সদস্য নির্বাচন করবেন। মুসলিম গ্রেজুয়েটদের একটি স্বতন্ত্র নির্বাচকমন্ডলী থাকবে। তাঁরা সিনেটের জন্য নির্বাচিতব্য অর্দ্ধেক সদস্য নির্বাচিত করবেন।

২. বাংলার মোট জনসংখ্যার মধ্যে মুসলিম জনসংখ্যার যে অনুপাত রয়েছে, ভারতীয় সিনেট সদস্যদের মধ্যে মুসলিম সদস্যসংখ্যার অনুপাত তদরূপই হবে।

৩. বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটে কিছুসংখ্যক আসন মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত থাকা উচিত।

৪. অফিস কর্মচারী ও কর্মকর্তার পদসমূহের মধ্যে নির্দিষ্ট সংখ্যক পদ মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত রাখা হোক।

৫. বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামী শিক্ষার জন্য স্বতন্ত্র একটি অনুষদ গঠিত হোক।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কিত-

১. সকল সিলেকশন কমিটিতে ৫০% প্রতিনিধিত্ব মুসলমানদের থাকা উচিত।

২. একাডেমিক কাউন্সিলে ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট প্রতিষ্ঠান থেকে অন্তত দুইজন প্রতিনিধি থাকা উচিত।[২৯]

এক কথায় তিনি সমাজের সকল স্তরের জনমানুষের জন্য জীবন উৎসর্গ করে গেছেন। সকল সেক্টরে তিনি কাজ করেছেন। সকল সেক্টরের জন্য তিনি সভা সমাবেশে বক্তৃতা দিয়ে মানুষকে সচেতন করতে চেয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য নির্দেশ

তৃতীয় অধ্যায়

১. ১৯১৪ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত 'বংগীয় মুসলমান শিক্ষা সমিতি'র উদ্বোধনী অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে নওয়াব আলী চৌধুরী বলেছিলেন ঃ Education and Education alone is our Salvation and Progress.

২. Nawab Ali Chowdhury, Presidential Address at the 1st Session of the Bengal Presidency Muhammadan Educational Conference, 1914, P. 7.

৩. ঢাকা প্রকাশ, ৩রা ভাদ্র, ১২১৮/২০শে আগস্ট, ১৯১১।

৪. The Calcutta Gazette, Pt. IVA, May 3, 1916, P. 291.

৫. Proceedings of the Imperial Legislative Council, Sept, 11, 1919, Pp. 116 - 17.

৬. Ibid, Feb. 11,1920, P.678.

৭. The Calcutta Gazette, Pt. IVA, March 26, 1913, P. 335.

৮. Ibid, P. 332.

৯. Ibid, P. 337.

১০. Enamul Haque, Nawab Bahadur Abdul Latif, His Writings and Related Documents, Pp. 224.

১১. Ibid. P. 227.

১২ Report of the Moslem Education Advisory Committee, 1934, Pp. 73-74.

১৩. Journal of the Moslem Institute, Vol. 1, No. 4, April-June, 1906, P. 517.

১৪. Proceedings of the First Provincial Mahamedan Educational Conference of Eastern Bengal and Assam, 1906.

১৫. Journal of the Moslem Institute, Vol, I, No. 4, April-June, 1906, P. 519.

১৬. Proceedings of the Provincial Mahomedan Educational Conference of Eastern Bengal and Assam, 1906. Pp. 13-26.

১৭. Report of the Proceedings of the Second Provincial Educational Conference held at Mymensingh on the 18th and 19th of April, 1908, Pp. 67-110.

১৮. নওয়াব আলী চৌধুরী, পূর্ববংগ ও আসাম প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতির কার্যবিবরণী ও সমালোচনা (১৯০৬-১২), কলিকাতা, এপ্রিল, ১৯১৪, পৃ ৩০-৩১।

Dhaka University Institutional Repository

১৯. Report of the Proceedings of the Third Provincial Muhammadan Educational Conference, Eastern Bengal & Assam held at Bogra on the 26th and 27th March 1910, Pp. 62-131.

২০. Ibid. P. 60.

২১. নওয়াব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী, পূর্ববংগ ও আসাম প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতির কার্যবিবরণী ও সমালোচনা (১৯০৬-১৯১২), কলকাতা, এপ্রিল, ১৯১৪, পৃ ১-৩।

২২ Ali Azam, Life of Maulavi Abdul Karim, Part II, P. 97.

২৩. আবদুল হক ফরিদী, মাদ্রাসা শিক্ষাঃ বাংলাদেশ, পৃ ৬৭।

২৪. Report of Moslem Education Advisory Committee, 1934, P. 16.

২৫. M. A. Rahim, The History of the University of Dacca, P. 174.

২৬. মোহাম্মদ আজিজুল হক, বাংলাদেশে মুসলিম শিক্ষার ইতিহাস এবং সমস্যা (মুস্তাফা নূরউল ইসলাম অনূদিত) পৃ ১১৩-১১৫।

২৭. আবদুস সাত্তার, মওলানা, তারীখ-এ-মাদ্রাসা-এ-আলিয়া, পৃ ৯২-৯৩।

২৮. Sikandar Ali Ibrahimy, Reports on Islamic Education and Madrasah Education, Bengal, Vol. III, Pp. 95-98.

২৯. Sekandar Ali Ibrahimy, Op. cit., Pp. 121-123.

৩০. Sekandar Ali Ibrahimy, Pp. 127-129.

৩১. Sekandar Ali Ibrahimy, Pp. 185-186.

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় নবাব নওয়াব আলী চৌধুরীর ভূমিকা

উনিশ শতকে কলকাতাকে কেন্দ্র করে পশ্চিম বাংলায় সমাজের মাঝে যে ভূমিকা দেখা যায়, ঢাকাকে কেন্দ্র করে পূর্ব বাংলায় সেদিন তা ঘটে নি। পূর্ববাংলার রাজনীতিবিদগণ রাজধানী ঢাকাকে এই বঙ্গের জনসাধারণের শিক্ষা-সংস্কৃতি, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও রাজনীতি চর্চার কেন্দ্রে পরিণত করার জন্য দীর্ঘদিন থেকে একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন অনুভব করছিল। সেই প্রেক্ষিতে বিংশ শতাব্দীর শুরুতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আন্দোলন শুরু হয়। ১৯০৬ সালের ১ অক্টোবর আগা খানের নেতৃত্বে ভারতের ৩৪ জন মুলিম নেতা সিমলায় বড়লাট লর্ড মিন্টোর সাথে সাক্ষাৎ করেন। তারা মুসলমানদের পক্ষ থেকে কতিপয় সুনির্দিষ্ট দাবি পেশ করেন। এতে ঢাকায় একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবিও ছিল। ১৯১১ সালের ১৯ আগস্ট কার্জন হলে ছোটলাট ল্যান্সলট হেয়ারের বিদায় ও চার্লস বেইলির আগমন উপলক্ষে সংবর্ধনা সভায় নবাব সলীমুল্লাহ ও নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী পৃথক ২টি মানপত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবি উথাপন করেন। ১৯১২ সালের ৩১ জানুয়ারি বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ ঢাকা সফরে আসেন। এ সময় নবাব সলীমুল্লাহ ও নওয়াব আলী চৌধুরীসহ ১৯ সদস্যের প্রতিনিধি দল লর্ড হার্ডিঞ্জের কাছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আবেদন করেন। লর্ড হার্ডিঞ্জ কর্তৃক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি প্রদানের পর নবাব সলীমুল্লাহ ও নওয়াব আলী চৌধুরী ঐ প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে প্রাণপন চেষ্টা করতে থাকেন। নবাব সলীমুল্লাহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দেখে যেতে পারেননি তবে নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী তাঁর চেষ্টার ফসল স্বচক্ষে দেখে গেছেন এবং মনের আনন্দ উপভোগ করেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পেছনে অনেকের অবদান থাকলেও নবাব নওয়াব আলী চৌধুরীর মত এত বেশী অবদান আর কারোর আছে বলে মনে হয় না। সেই ১৯১১ সালের ৩১ জানুয়ারী অর্থাৎ যেদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতষ্ঠার প্রতিশ্রুতি ঘোষিত হয়, সেদিন থেকে ১৯২০ সালের ২৩ মার্চ অর্থাৎ যে দিন বড় লাটের আইন সভায় 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এ্যাক্ট' পাশ হয় সেদিন পর্যন্ত নওয়াব আলী চৌধুরীর চেষ্টার বিরাম ছিল না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কমিটির সদস্যরূপে বিশ্ববিদ্যালয়ের নীল নকশা অংকনে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি বেঙ্গল প্রেসিডেন্সী আইনসভায়, অল-ইণ্ডিয়া মুসলিম লীগ-এর অধিবেশনে, বেঙ্গল প্রেসিডেন্সী মুসলমান শিক্ষা সমিতির কর্মকাণ্ডে ও ইম্পিরিয়্যাল লেজিসলেটিভ্ কাউন্সিলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য বেঙ্গল গভর্নমেন্ট ও ইণ্ডিয়া গভর্নমেন্টের উপর চাপ দিতে থাকেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি প্রণীত রূপরেখা বাস্ত-

Dhaka University Institutional Repository

বাড়িত করার জন্য তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করেন; বড়লাট ব্যবস্থাপক পরিষদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এ্যাক্ট পাসের জন্য গভর্নমেন্টের উপর চাপ সৃষ্টি করেন। গভর্নমেন্ট থেকে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার নিশ্চয়তা পাওয়ার পরেই তিনি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেন এবং সর্বশেষ বিশ্ববিদ্যালয় এ্যাক্ট প্রণয়নের সময় মুসলিম স্বার্থ সংশ্লিষ্ট নীতিমালা নির্ধারণের আলোচনায় বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন।

যদিও পূর্ব বাংলার বিভিন্ন জেলায় এই সময় বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তবে সারা বাংলা প্রদেশের তুলনায় তা ছিল নিতান্তই কম। একমাত্র কলকাতা এবং কলকাতার পার্শ্ববর্তী এলাকাতেই কলেজ ছিল ১৩টি, এ ছাড়া পেশাগত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেমন, মেডিকেল ও প্রকৌশল কলেজ ছিল আরো ৭টি। অথচ সমগ্র পূর্ব বাংলার বিভিন্ন জেলাতেই সব মিলিয়ে কলেজ ছিল মাত্র ৯টি। এগুলো ছিল ঢাকা কলেজ (১৮৪১), চট্টগ্রাম কলেজ (১৮৬৯), রাজশাহী কলেজ (১৮৭৩), জগন্নাথ কলেজ (ঢাকা: ১৮৮৪), ব্রজমোহন (বিএম) কলেজ (বরিশাল: ১৮৮৯), ভিক্টোরিয়া কলেজ (নড়াইল: ১৮৯৬), হিন্দু একাডেমী (দৌলতপুর: ১৮৯৬), এডওয়ার্ড কলেজ (পাবনা: ১৮৯৮), ভিক্টোরিয়া কলেজ (কুমিল্লা: ১৮৯৯)।

ঢাকায় অবশ্য একটি আইন কলেজ এবং একটি ট্রেনিং কলেজও ছিল। সিলেটের মুরারী চাঁদ (এম.সি) কলেজ আসামের ছাত্রদের জন্যে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ময়মনসিংহের আনন্দমোহন কলেজ ১৯০৯ সালে এবং সিরাজগঞ্জের ইসলামিয়া কলেজ ১৯২০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। সমগ্র বাংলায় সব মিলিয়ে ৪৫টি কলেজের ৩০টি ছিল পশ্চিম বাংলায় এবং মাত্র ১৫টি ছিল পূর্ব বাংলা ও আসাম প্রদেশের ছাত্রদের জন্যে। বোঝা যায়, হিন্দু বা মুসলমান নয়, প্রকৃতপক্ষে সমগ্র পূর্ব বাংলার মানুষের জন্যেই কলেজ পর্যায়ে এবং উচ্চশিক্ষা পর্যায়ে প্রতিষ্ঠানের অভাব ছিল।

এই সময় পূর্ব বাংলার মুসলমানদের অবস্থা ছিল আরো দুর্বল। নিম্নবিত্ত ও গরিব পরিবারের ছাত্রদের কলেজ পর্যায়ে অবস্থান ছিল খুবই স্বল্প এবং তা এতই সীমিত পর্যায়ের ছিল, তাকে একটা গণনার পর্যায়ে আনা সম্ভব হয়নি। তবে ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর থেকে পূর্ব বাংলার উচ্চশিক্ষা পর্যায়ে ছাত্রসংখ্যা, বিশেষ করে মুসলমান ছাত্রসংখ্যা বাড়তে থাকে। তবে এই মুসলমান ছাত্রদের অধিকাংশই ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি-ফার্সি বিভাগের ছাত্র। পূর্ব বাংলার বাঙালি মুসলমান ছাত্ররা তখনো বিজ্ঞান ও অন্যান্য সাধারণ বিষয়ে পড়তে শুরু করে নি।

Dhaka University Institutional Repository

ব্রিটিশ সরকার যে পূর্ব বাংলার মানুষের জন্যে এত দরদি হয়ে একটি বিশ্ববিদ্যালয় করে দিচ্ছিল, তা থেকে বড় একটা ফাঁক বেরিয়ে আসে। ব্রিটিশদের নিয়োজিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন ঠিক করে যে, এই অঞ্চলের মুসলমান ছাত্ররা শুধু আরবি-ফার্সি অধ্যয়নের জন্যেই এই বিশ্ববিদ্যালয়ে আসবে। খুব সুচতুরভাবে পূর্ব বাংলার মুসলমান ছাত্র-সমাজকে জ্ঞান-বিজ্ঞান থেকে দূরে রাখার এ ছিল এক ঘৃণ্য প্রচেষ্টা। এই অপচেষ্টার অংশ হিসেবেই আরবি বিভাগের প্রধান হিসাবে প্রথম নিয়োগ করা হয় একজন ইউরোপীয়কে, যিনি ধর্মবিশ্বাসে ছিলেন এক খ্রিস্টান।

বস্তুত এই নিয়োগের মধ্যেই ইংরেজ সরকারের পূর্ব বাংলার ছাত্রসমাজের প্রতি তথাকথিত প্রীতির স্বরূপ উদঘাটিত হয়। কারণ দেখা যায় মুসলমান ছাত্রদের আরবি ও ইসলামি জ্ঞান দিতে এসেছেন একজন ইসলামি পণ্ডিত নন, একজন ইউরোপীয় খ্রিস্টান পণ্ডিত। এর থেকেই পূর্ব বাংলার শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে ব্রিটিশদের তখনকার রাজনীতির স্বরূপ ভালোভাবেই ধরা পড়ে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য লর্ড লিটন বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েটদের প্রথম ব্যাচের উদ্দেশ্যে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে বলেছিলেন:

Dacca will naturally become the chief centre of Muhammadan Learning and devote special attention to higher Islamic Studies (Convocation address of the Chancellor for the conferment of Degrees on the Graduates of the year 1922, held in Curzon Hall on February 22, 1923)

এভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে ইসলাম চর্চার কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন ইংরেজদের সাথে একদল মুসলমান নেতাও। অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাক এই সম্পর্কে স্মৃতিচারণ করে বলেছেন:

'তখন মুসলিম প্রধানদের মধ্যে কিছু লোক বললেন মুসলিম উইল নট এ্যাক্সেপ্ট ইংলিশ এডুকেশন আনলেস এ টিউন অব রিলিজিয়াস ইনস্ট্রাকশন ওয়াজ দেয়ার। এ জন্য এ্যারাবিক, পারসিয়ান গুড বি গিভেন এ মোর ইমপোরট্যান্ট প্লেস। এই ধারণা নিয়েই নিউ স্কিম দাঁড় করানো হয়েছিল: নাইদার মাদরাসা, নর ইংলিশ হাইস্কুল। মুসলিম নেতাদের ইচ্ছা ছিল: এই নিউ স্কিম-এর কোপিং স্টোন হবে ঢাকা ইউনিভার্সিটির ইসলামিক স্টাডিজ-এর ফ্যাকাল্টি। এখানে ইয়ংমেন উইল হ্যাভ বিন ট্রেইনড ইন এ্যারাবিক, পারসিয়ান, উর্দু, উইথ সাম রিলিজিয়াস ভিউ। তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে ইসলামিক স্টাডিজ-এ জয়েন করে উইল এ্যাক্ট এ্যাজ লিডারস অব দি মুসলিমস।'[১]

Dhaka University Institutional Repository

তবে সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল স্বতন্ত্র ধারার এক আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়, যার গুণে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও ম্লান হয়ে গিয়েছিল এবং সেই বিশ্ববিদ্যালয়কে ইংরেজ শাসকরা মুসলমানদের প্রাণকেন্দ্র হিসেবে দেখতে কেন আগ্রহী ছিল তা নিয়ে খুব একটা গবেষণার দরকার পড়ে না। যে কারণে ইংরেজরা বাংলা ভাগ করেছিল, সেই একই কারণে উপমহাদেশ ও বাংলায় হিন্দু-মুসলমানের দ্বন্দ্ব তাদের শাসনব্যবস্থা দীর্ঘায়িত করার জন্যে অপরিহার্য ছিল। ইংরেজ কর্মকর্তা রিজলি একবার মন্তব্য করেছিলেন: 'ঐক্যবদ্ধ বাংলা ইংরেজদের জন্যে একটি বিপজ্জনক শক্তি, বিভক্ত হলে বাংলাদেশ আর আমাদের তেমন বিপদে ফেলতে পারবে না'। ইংরেজরা বাংলা ভাগ করেছিল তাই নিজেদের স্বার্থেই আর এইবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে 'মোহামেডানদের কেন্দ্র' বলার মধ্যে এই একই ধরনের চাতুরীর আশ্রয় নেওয়া হয়েছিল, যাতে মুসলমান প্রধান পশ্চিম বাংলা খানিকটা জেগে ওঠে এবং হিন্দু-প্রধান পশ্চিমবাংলাকে একটু চাপে রাখতে পারে। কিন্তু এই পরিকল্পনা শাপে বর হয়েছিল পূর্ব বাংলার মানুষের জন্যে। যে কারণেই বাংলা ভাগ হোক, আর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পেছনে যে উদ্দেশ্যই কাজ করুক, পূর্ব বাংলার মানুষের জন্যে তা আশীর্বাদ হিসেবে অচিরেই প্রতিভাত হয়। এই বিশ্ববিদ্যালয় সৃষ্টি করেছিল এমন একটি ছাত্রসমাজকে, যারা দশক থেকে দশকে একটি বিপ্লবী শক্তিতে পরিণত হয় এবং মাত্র পঞ্চাশ বছরের ব্যবধানে একটি নতুন জাতির স্বপ্নকে বাস্তবে রূপদান করে।[২]

অবশ্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনও ১৯১৭ সালে তাদের প্রতিবেদন পূর্ব বাংলার মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার যৌক্তিকতাকে তুলে ধরে বলেছিল:

....was doubtless, the desire to accede to the demand for further liabilities for the Muslim Population who form a vast majority in Eastern Bengal.[৩]

যদিও ড. রাসবিহারী ঘোষের মতো এক শ্রেণীর উচ্চবিত্ত সম্প্রদায়ের হিন্দুনেতারা যতটা সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে, তার চেয়ে বেশি শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করেছিলেন। তাঁরা বলেছিলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা মানেই বাংলা ভাগ হয়ে যাওয়া। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকেই অবিভক্ত বাংলার দরদী' হিসেবে তাঁরা একথা বলেছেন। কিন্তু এরপরই উচ্চবিত্ত হিন্দু নেতৃবৃন্দ বলতে শুরু করলেন, পূর্ব বাংলার বেশিরভাগ মানুষ হচ্ছে কৃষক; বিশ্ববিদ্যালয় আবার তাদের কী কাজে লাগবে:

They (The Hindu Leaders-Dr. Hannan) also contended that the

Dhaka University Institutional Repository

Muslims of Estern Bengal were in large majority cultivators and they would benefit in no way by the foundation of a University. [৪]

এই কৃষকের ছেলে ছাত্র হয়ে উচ্চ শিক্ষা লাভ করতে পারে এবং শিক্ষা লাভ করার অধিকার তাদের আছে, একথা এসব হিন্দুনেতার মাথায় যে আসে নি এমন নয় বরং তারা খুব সচেতনভাবেই পূর্ব বাংলার সাধারণ নিম্নবিত্ত ও গরিব ঘরের ছাত্রদের, হিন্দু কি মুসলমান, সকলের উচ্চশিক্ষার দ্বারকে রুদ্ধ করে দেওয়ার অপচেষ্টায় লিপ্ত হন।

পূর্ব বাংলার কৃষক-মজুরদের সম্পর্কে শুধু উচ্চবিত্ত ছিল, এমন নয়, উচ্চশ্রেণীর মুসলমানরাও পূর্ববাংলার এই মুসলমান কৃষকশ্রেণীর স্বার্থ বিরোধী। ১৮৮২ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি লর্ড রিপন কর্তৃক ভারতীয় শিক্ষা কমিশনে হান্টার কমিশনে ভারতীয় শিক্ষা ও তার ভাষা সম্পর্কে তৎকালীন উচ্চশ্রেণীর মুসলমান নেতা নবাব আবদুল লতিফ বাংলাদেশ ও ভারতের মুসলমানদের জন্যে ইংরেজী ও উর্দু ভাষায় লেখাপড়ার ব্যবস্থা কারার জন্যে কমিশনে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন, তিনি অবশ্য খুব করুণা করে বলেছিলেন, বাংলাদেশের যারা নিম্নশ্রেণীর মুসলমান, জাতিগতভাবে যারা হিন্দুদের থেকে পৃথক নয়, তাদের জন্যে বাংলা ভাষায় শিক্ষা ব্যবস্থা করা যেতে পারে। বস্তুত এটা ছিল বাঙালি সাধারণ মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুগপৎ একটা ষড়যন্ত্র এবং ধৃষ্টতাও।

বাংলা ভাষা সম্পর্কে উচ্চবিত্ত মুসলমানদের এরকম কটাক্ষ এবং অবজ্ঞার বিষয়টি খ্রিস্টান পাদ্রীরাও লক্ষ্য করেছিলেন। ফলে পূর্ব বাংলার মুসলমান ও বাংলা ভাষা সম্পর্কে অবজ্ঞা ও কটাক্ষের সাথে অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাক জানাচ্ছেন:

'বাংলা ভাষার সঙ্গে মুসলমানদের সম্পর্ক ছিল কাস্ট হিন্দুদের চেয়ে অনেক নিকটতর। পাদ্রীদের উপর আমার একটা রাগ এজন্য যে এর জন্য পাদ্রীরা অনেকখানি দায়ী, বাঙালি মুসলমানকে বাংলা থেকে দূরে ঠেলে দেওয়ার জন্য এদের দায়িত্ব কম নয়। পাদ্রীরা বললো বাংলা সংস্কৃতের দুহিতা। সমাচারদর্পণ-এর সম্পাদকীয় ছিল: আমরা কি জন্য বাংলা ভাষার সমর্থন করি ? কারণ মুসলমানরা ইহা পছন্দ করে না। ইহারা কখনো বাংলা লিখিতে শিখিতে পারিবে না।'[৫]

এভাবে গোড়া থেকেই উচ্চশ্রেণীর হিন্দু, মুসলমান এবং খ্রিস্টানদের বৈরিতা ও বিরোধিতা থাকায় পূর্ব বাংলার গরিব ঘরের মুসলমান ছাত্ররা ওপরের দিকে এসে আর উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে পারে নি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের লেখক ড. এম. এ. রহিম অবশ্য এই পশ্চাৎপদতার আরো একটি কারণ নির্দেশ করেছেন এই বলে:

Dhaka University Institutional Repository

Most of the colleges in Eastern bengal were dominated by the Hindus directly or indirectly and the poor Muslim Students failed to get the benefit of higher education.[৬]

অতি উৎসাহী মুসলমান নেতারা অবশ্য ইতোমধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে মক্কা বিশ্ববিদ্যালয় বলা শুরু করে দিয়েছিলেন (নিঃসন্দেহে এতে ইংরেজদের প্ররোচনা ছিল)। আর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিরোধিতাকারী হিন্দু নেতারাও পাল্টা বলতে থাকেন যে, একটা ভালো কলেজ শেষ করে দেওয়া হয়েছে একটা বাজে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে। ভালো কলেজ বলতে তাঁরা তৎকালীন ঢাকা কলেজ'কে ইঙ্গিত করেছিলেন।

কলকাতাবাসীদের চোখে ঢাকা ছিল মফস্বল

ঢাকা তথা পূর্ব বাংলার মানুষ ও ছাত্র সমাজ সম্পর্কে এহেন অবমূল্যায়ন করার ভেতরেই সবকিছু সীমিত ছিল এমন নয়, পাশাপাশি কলকাতাবাসীদের চোখে ঢাকা তখনো একটা মফস্বল হিসেবেই স্বীকৃত। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের প্রতিবেদনে রয়েছে এর সাক্ষ্য। কমিশন মন্তব্য করেছিল, ঢাকা কলেজ হচ্ছে মফস্বলের মধ্যে সবচেয়ে ভালো কলেজ। এর থেকেই বোঝা যায়, তাদের চোখে মফস্বল শহর হিসেবেই বিবেচিত হত। কিন্তু এরপরেও ঢাকা তখন ছিল প্রায় দেড় লক্ষ নগরবাসীর এক সমৃদ্ধ শহর। মোগল আমলে একবার ঢাকা বাংলার রাজধানীও হয়েছিল। এমনকি ব্রিটিশ আমলে প্রশাসনিক অঞ্চল বাংলা প্রেসিডেন্সিতে ঢাকা ছিল তখন কলকাতার পরেই শহর, যা ঐতিহাসিক এবং প্রাচীন ঐতিহ্য সমৃদ্ধ। একই সাথে ঢাকা ছিল তখন এক সম্ভাবনাময় অঞ্চল, যা সেই আমলেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে ২৭,২৯০ ছাত্রের মধ্যে ৭,০৮৭ জন ছাত্র সরবরাহ করতে সমর্থ হয়েছিল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনে প্রতিবেদন খুব আনন্দের সাথে অতঃপর যে মন্তব্য করেছে, তা ছিল নিম্নরূপ :

Dacca is therefore, already in the centre of a great Student Population.[৭]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রথম আচার্য বাংলার গর্ভনর লর্ড লিটন সর্বোচ্চ এই বিদ্যাপীঠের প্রথম বছরের এই অঞ্চলের নব শিক্ষায় শিক্ষিত ও ভবিষ্যত আলোকপ্রাপ্ত শ্রেণীর জাগরণের সম্ভবনাকে দেখতে পেয়েছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ব্যাচের গ্রাজুয়েটদের উদ্দেশ্যে ভাষণ

Dhaka University Institutional Repository

দিতে এসে আচার্য বলেন:

...it would be bound that the Dacca trained student is a Superior Man (Convocation address of the Chancellor for the conferment of Degrees on the Graduates of the near 1922. held in Carzon Hall on February 22. 1923.)

প্রথম আচার্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে এই অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন সম্ভবত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে তুলনা করেই। কারণ একই বক্তৃতায় তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে একটি আদর্শ আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় অভিধায় অভিহিত করে আরো বলেছিলেন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যা কোনো দিনই হয়ে উঠতে পারবে না।

ইংল্যান্ডে অবস্থানকালে (১৮৬৯-৭০) স্যার সৈয়দ আহমেদ কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুসরণে আলীগড়ে একটি মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনা করেন। দেশে ফিরে তিনি ১৮৭০ সালে 'শিক্ষা উন্নয়ন কমিটি' গঠন করেন এবং এর মাধ্যমে আধুনিক শিক্ষার প্রতি মুসলমানদের অনাগ্রহের কারণ খুঁজে বের করার চেষ্টা করেন। এ কমিটির পাশাপাশি তিনি পরিকল্পিত আলীগড়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য একটি 'তহবিল সংগ্রহ কমিটি' গঠন করেন। ১৮৭৩ সালে স্যার সৈয়দের পুত্র সৈয়দ মাহমুদ, প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ স্কীম প্রস্তুত করে তা শিক্ষা উন্নয়ন কমিটির কাছে পেশ করেন। কমিটি তা অনুমোদন করে আর্থিক সাহায্যের জন্য সরকারের নিকট আবেদন করেন। কিন্তু গভর্নমেন্ট পরিকল্পিত আর্থিক সাহায্য দিতে অস্বীকার করেন। তখন স্যার সৈয়দ বাধ্য হয়ে বিশ্ববিদ্যলয়ের আশা ত্যাগ করে আলীগড় কলেজ প্রতিষ্ঠায় মনোনিবেশ করেন। ১৮৭৫ সালে আলীগড় স্কুল ও ১৮৭৭ সালে আলীগড় কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। স্যার সৈয়দ তাঁর জীবদ্দশায় আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় দেখে যেতে পারেন নি। তাঁর মৃত্যুর পর মুসলিম উপমহাদেশীয়, বিশেষত আলীগড়ের নেতৃবৃন্দের অবিরাম চেষ্টায় পরিকল্পনার দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর পর ১৯২০ সালে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং ১৯২১ সাল থেকে সেই বিশ্ববিদ্যালয়ে যথারীতি পড়াশোনা আরম্ভ হয়।

আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় বাঙ্গালী মুসলমানদের অবদান অসামান্য। পূর্ববঙ্গের মুসলিম নেতৃবৃন্দ আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়কে জাতীয় ও সর্বভারতীয় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় বলে মনে করতেন। সেজন্যই বোধ হয় তাঁরা ১৯১২ সালের ৩১ জানুয়ারী লর্ড হার্ডিঞ্জ কর্তৃক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করার পূর্বক্ষণ পর্যন্ত নিজ প্রদেশে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ততটা চেষ্টা না করে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কাজ তরান্বিত করার আন্দোলনে মনোনিবেশ করেছিলেন। তাঁরা সেই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকে নতুন প্রদেশে জোড়ালো করে

Dhaka University Institutional Repository

তোলেন এবং বিশ্ববিদ্যালয় তহবিলের জন্য প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ চাঁদা সংগ্রহ করেন। ১৯১১ সালের মার্চের পর, বিশেষত জুলাই-আগস্টের দিকে নওয়াব আলী চৌধুরী ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, পাবনা, রংপুর, দিনাজপুর এবং ফরিদপুর জনসভায় বক্তৃতা করে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়-আন্দোলনকে সক্রিয় করে তোলেন। পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ থেকে নগদ চাঁদা ও প্রতিশ্রুত চাঁদা বাবদ যে অংক পাওয়া যায়, তার পরিমাণ ছিল ১,৫০,০০০/- টাকা।

১৯০৮ সালের ১৮-১৯ এপ্রিল ময়মনসিংহে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক শিক্ষা সমিতির দ্বিতীয় অধিবেশনে নওয়াব আলী চৌধুরী সমিতির বার্ষিক কার্যবিবরণীতে প্রস্তাবিত আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়কে মুসলিম ভারতের একমাত্র জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বলে আখ্যায়িত করেন এবং পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য উপযোগী নয় বলে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, অত্র প্রদেশের মুসলমানদের মধ্যে উচ্চ শিক্ষা বিস্তারের জন্য, আমি যতটুকু বিবেচনা করে দেখেছি, প্রদেশে একটি স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হওয়া কর্তব্য; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এ প্রদেশ এখনো যে উপযুক্ত হয় নি; কারণ এ প্রদেশে কলেজের সংখ্যা অতি অল্প। বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের চেষ্টা করার পূর্বে কলেজ ও স্কুলের সংখ্যাবৃদ্ধির চেষ্টা করা একান্ত কর্তব্য; তদবিষয়ে প্রত্যেক সভা মহোদয়কে যত্নবান হতে আমি বিশেষ অনুরোধ করি। মুসলমানদের জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বলতে একমাত্র আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়কেই বোঝায়।'

১৯১১ সালের ১৬ই এপ্রিল নওয়াব আলী চৌধুরী শিক্ষা সমিতির বার্ষিক কার্যবিবরণীতে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্ব তুলে ধরেন এবং এর জন্য প্রদেশবাসীকে যথাসাধ্য চাঁদা সংগ্রহ করার অনুরোধ করেন। তিনি এ কার্যবিবরণীতে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়কে আবারও সর্বভারতীয় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় বলে অভিহিত করেন। তিনি ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের চাঁদা সংগ্রহ সম্পর্কে বলেনঃ 'আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের আবশ্যকতা সম্বন্ধে আমাদের বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করতে চাই না। এই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আবশ্যকতা চিন্তাশীল মুসলমানদের বহু পূর্ব হতেই উপলব্ধি করেছেন।...দুঃখের বিষয়, আমাদের প্রদেশে সেরূপ চেষ্টা বা উদ্যোগ পরিলক্ষিত হচ্ছে না। আমাদের সাধ্যমত চেষ্টা আমরা অবশ্যই করবো। এ সম্বন্ধে অত্র শিক্ষা সমিতির মনোযোগ আকর্ষণ করতে আমি ইচ্ছা করি। আমাদের বিভাগে বিভাগে, জেলায় জেলায় এবং পল্লীতে পল্লীতে কমিটি স্থাপন করে যে যা পারেন, সেই পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করা উচিত। এ বিশ্ববিদ্যালয়টি সমগ্র ভারতীয় মুসলমানদের জন্য হবে।'

১৯০৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর 'অল-ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ' প্রতিষ্ঠা সভায় নওয়াব সলীমুল্লাহ আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা কামনা করেন এবং এ আশা ব্যক্ত করেন যে, আলীগড়

Dhaka University Institutional Repository

নেতৃবৃন্দের প্রচেষ্টায় ভবিষ্যতে এমন একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হবে, যা হবে আলীগড় কলেজ থেকে উৎকৃষ্ট এবং উপমহাদেশের একটি অনুপম প্রতিষ্ঠানরূপে পরিগণিত। তিনি বলেনঃ I am afriad the danger of our neglecting the best means of advancing our political rights and interests, namely by education, still exists; but we can safely leave the renowned leader of our community, Nawab Mohsin-ul-Mulk Bahadur, and his Colleagues and the old students of the Aligarh College, to combat that danger as they have hitherto been doing, and to work on with a will in order to found our future University, which will be an even more unique and splendid constructive work than the Aligarh College which has no equal in India.

১৯০৮ সালের ২৭ ডিসেম্বর অমৃতসরে অনুষ্ঠিত 'মোহামেডান এডুকেশন্যাল কনফারেন্সে' তিনি সভাপতির ভাষণে একইভাবে আলীগড়ের নেতাদের সুরে একটি মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কথা উচ্চারণ করেন। ১৯১১ সালের ১৫ই ও ১৭ মার্চ নবাব সলীমুল্লাহর সভাপতিত্বে তাঁর বাসভবনে অনুষ্ঠিত 'প্রাদেশিক মুসলিম লীগ' এর অধিবেশনেও তিনি আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন এবং অন্যান্য প্রদেশের মুসলমানদের সাথে সহযোগিতা করে সেই বিশ্বদ্যিালয় প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের প্রতি সায় দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। ঐ সভায় 'অল-ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ'-এর সেক্রেটারী আযীয মির্যাও উপস্থিত ছিলেন। তিনি প্রস্তাবিত আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্যাবলী ব্যাখা করেন। তিনি নিশ্চয়তা দিয়ে বলেন যে, সমগ্র ভারতের মুসলিম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রস্তাবিত আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন থাকবে। অধিবেশনে নবাব সলীমুল্লাহ ঘোষণা করেন যে, আলীগড়ের দু'জন সম্ভ্রান্ত মুসলমান ১৫০০/- টাকা করে প্রস্তাবিত ঢাকা মোহামেডান হলের জন্য দান করেছেন। সভায় নওয়াব সলীমুল্লাহকে প্রেসিডেন্ট এবং রেভিনিউ বোর্ডের জুনিয়ার সেক্রেটারী মুহীবুদ্দীনকে সেক্রেটারী করে প্রস্তাবিত আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের চাঁদা সংগ্রহের জন্য 'পূর্ব-বঙ্গ-আসাম প্রাদেশিক চাঁদা সংগ্রহ কমিটি' গঠিত হয়। সলীমুল্লাহ ইতি-পূর্বেই তাঁর প্রস্তাবিত 'ঢাকা মোহামেডান হল' প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আর্থিক সাহায্যের জন্য উদগ্রীব ছিলেন। এমতাবস্থায় আলীগড়ী দু'জন নেতা (সম্ভবত আগা খান ও মাহমুদাবাদের রাজা) মোহামেডান হলে দান করায় এবং ভারতের সকল মুসলিম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকবে বলে আযীয মির্যা কর্তৃক নিশ্চয়তা দেওয়ায় সলীমুল্লাহ আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্দোলনের প্রতি বেশী ঝুঁকে থাকবেন।

Dhaka University Institutional Repository

বঙ্গ-বিভাগ রদ ঘোষণার পর তিনি ১৯১১ সালের ২০ ডিসেম্বর বড়লাট হার্ডিঞ্জের কাছে আটটি দাবি সংবলিত যে পত্র দেন, তাতে অবশ্য পূর্ব বঙ্গের শিক্ষোন্নতি সংক্রান্ত কয়েকটি কথা ছিল, কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কোন উল্লেখ ছিল না। পূর্ববাংলার সকল অভাব-অভিযোগ পেশ করার উদ্দেশ্যে এখানকার নেতৃবৃন্দকে তাঁর সাথে সাক্ষাতের সুযোগ দেওয়ার দাবি ছিল পত্রের অন্যতম দিক। হার্ডিঞ্জ এ আবেদনের সুযোগ নিয়ে পূর্ববঙ্গবাসীর কিছু ঘোষণা শুনিয়ে সান্ত্বনা দেওয়ার উদ্দেশ্যে ঢাকা সফর করেন। ১৯১২ সালের ২৯ জানুয়ারী তিনি ঢাকায় আগমন করে তিন দিন অবস্থান করেন। ৩১ জানুয়ারী নবাব সলীমুল্লাহর নেতৃত্বে ১৯ সদস্যের একটি মুসলিম প্রতিনিধি দল বড়লাটের সঙ্গে দেখা করে একটি মানপত্র প্রদান করেন এবং কয়েকটি প্রস্তাব পেশ করে পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণের প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এ প্রতিনিধি দলে নওয়াব আলী চৌধুরী এবং এ.কে. ফজলুল হকও ছিলেন। তাঁরা মানপত্রে উল্লেখ করেন যে, হিন্দুদের তুলনায় মুসলমানরা সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দ্বারা উপকৃত হয় নি বললেই চলে। তাঁরা আশংকা প্রকাশ করেন যে, বঙ্গভঙ্গ রদের ফলে তাদের শিক্ষার উন্নতির ধারাবাহিকতা হয়তো বিঘ্নিত হবে। তাঁরা আরো বলেনঃ We also pray that till such time as the Muhammadans do not come up to the level of the Hindus in the matter of education, a large separate allotment be made for Muhammadan education and be utilised in giving special scholarships to deserving Muhammadan boys, in providing free seats in hostels in remission of tuition fees to poor students, and in such other directions in which special facilities for Muhammadans may be considered necessary.

মুসলিম প্রতিনিধি দল বড়লাটের কাছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য জোর দাবি উত্থাপন করেন বলে মরহুম ডক্টর মুহম্মদ আবদুর রহীম উল্লেখ করেন। ডক্টর সুফিয়া আহমদ বলেন, নওয়াব সলীমুল্লাহ ১৯০৫ সাল থেকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য সরকারের উপর চাপ দিচ্ছিলেন। কিন্তু এরা নিজ নিজ দাবির সমর্থনে কোন সূত্রের উল্লেখ করেন নি এবং অন্য কোন নির্ভরযোগ্য লেখকের সূত্র থেকেও তাঁদের দাবির সমর্থন মেলে না। মুসলিম প্রতিনিধি দলের প্রত্যুত্তরে বড়লাট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন এবং পূর্ববঙ্গের জন্য একজন স্পেশাল শিক্ষা-অফিসার নিয়োগের কথা ঘোষণা করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে আহমদ হাসান দানী বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবটি ছিল খুব সম্ভব গভর্নমেন্ট প্রণোদিত। বড়লাটের সাথে সাক্ষাৎকারী মুসলিম প্রতিনিধি দলের অন্যতম সদস্য এ. কে. ফজলুল হক ১৯৫৭ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে যে ভাষণ দেন, তাতেই প্রতীয়মান হয় যে, বড়লাটকে দেয়া তাঁদের মানপত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কথা স্থান

Dhaka University Institutional Repository

লাভ করে নি। নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী ১৯১৬ সালের ডিসেম্বর লখনৌতে অধিষ্ঠিত 'মুসলিম লীগ'-এর নবম অধিবেশনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে বলেন: The proposal of a University for Eastern Bengal at first originated from no less a personage Lord Harding (Pirzada, 386).

In January 1992 we presented an address to Lord Harding, the then Viceroy, and submitted our proposal for the improvement of the condition of Muslims in East Bengal.

Dacca Review' –To his Excelleney Lord Harding is due the inception of the whole idea of the University and to him are, therefore, due in a very special degree our grateful thanks. লর্ড হার্ডিঞ্জের ঢাকা আগমনের পূর্বে ঢাকার সাংবাদিকরাও বোধ হয় জানতেন না যে, মুসলিম প্রতিনিধি দল বড়লাটের সঙ্গে দেখা করবেন; সাক্ষাৎকারের কথা জানা থাকলেও এটা বোধ হয় তাঁরা জানতেন না যে, সাক্ষাৎকারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আলোচনা স্থান পাবে কিনা? Dacca Review' বলেনঃ We have in Dacca the beginnings of a great educational organisation. In many ways our city is peculiarly well-suited to become an Oxford or a Cambridge, whether with or without a University of its own. We have the colleges and schools of the present and we have great possibility for the future. It is these possibilities which we hope that Lord Harding whose fate like that of his grand-father has been to make great and far-reaching changes, will appreciate.

পূর্ববঙ্গে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের আওয়াজ তোলেন সর্বপ্রথম 'মোহামেডান এডুকেশন্যাল কনফারেন্স'-এর অনারারী জয়েন্ট সেক্রেটারি ব্যারিস্টার সাহেবযাদা আফতাব আহমদ খাঁ। ১৯০৬ সালের ২৭-২৯শে ডিসেম্বর ঢাকায় 'কনফারেন্স'এ যে বিংশতি অধিবেশন হয়, তাতে ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি দেশের এ অঞ্চলের অশিক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করেন। পূর্ববাংলার মুসলমানদের শিক্ষার প্রতি তিনি বিশেষ আগ্রহী ছিলেন। ১৯০৮ সালে 'মোহামেডান এডুকেশন্যাল কনফারেন্স'র এক অধিবেশন হয়। কনফারেন্সের বার্ষিক রিপোর্টে তিনি পূর্ব-বাঙলার মুসলিম শিক্ষার বিস্তারিত আলোচনা করে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব রাখেন-

Dhaka University Institutional Repository

তিনি বলেন: 'মুসলিম প্রধান পূর্ব বাংলার উচ্চ শিক্ষার জন্য আমার প্রথম প্রস্তাব হলো, এ প্রদেশে একটি স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত (রিপোর্ট, 'অল ইন্ডিয়া মোহামেডান এডুকেশন্যাল কনফারেন্স' ১৯০৬, পৃঃ ৯২)। তাঁর বক্তব্য ছিল এই যে, সারা ভারতে যত মুসলমান বাস করে, প্রায় তার এক-তৃতীয়াংশই পূর্ববাংলায় রয়েছে। তাই আদমশুমারী-ভিত্তিক নির্বাচনের মাধ্যমে যদি উপমহাদেশের ইম্পিরিয়াল কাউন্সিল, ব্যবস্থাপক সভা, ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটিতে মুসলমান সদস্য সংখ্যা বাড়াতে হয়, তবে অবশ্যই পূর্বাংলার মুসলমানদেরকে শিক্ষা-দীক্ষার দিক থেকে যোগ্য করে তুলতে হবে। ঐ অমৃতসর-শিক্ষা কনফারেন্সের সভাপতি ছিলেন নবাব সলীমুল্লাহ। তিনি তাঁর প্রতিষ্ঠিত প্রাদেশিক মোহামেডান এডুকেশন্যাল কনফারেন্সের (১৯০৬) মাধ্যমে পূর্ববাঙলা ও আসামের মুসলমানদের যেসব উন্নতি বিধান করেন, সাহেবযাদা আফতাব আহমদ সেগুলোর প্রশংসা করেন।

তিনি বলেনঃ 'আমাদের সভাপতির (সলীমুল্লাহ) বদান্যতা ও প্রগতিশীলতার দৌলতে ঢাকায় যে প্রাদেশিক কনফারেন্স' স্থাপিত হয়েছে এবং তাতে মুসলিম শিক্ষান্নয়নের জন্য যেসব প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে, গভর্নমেন্ট তার অধিকাংশই গ্রহণ করেছেন এবং সেগুলোর বাস্তবায়নের কাজও আরম্ভ হয়ে গেছে।'

সাহেবযাদা আফতাব আহমেদের প্রস্তাবের দীর্ঘদিন পর ১৯১০ সালের ৫ এপ্রিলে অনুষ্ঠিত পূর্ববাংলা ও আসাম প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক পরিষদে পরিষদ-সদস্য বাবু অনঙ্গ মোহন নাহা ঢাকায় একটি পৃথক বিশ্ববিদ্যালয় ও স্বতন্ত্র একটি হাইকোর্ট স্থাপনের প্রস্তাব করেন। উত্তরে জনশিক্ষা পরিচালক শার্প বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন সম্পর্কে তাঁর সম্পূর্ণ সহানুভূতি রয়েছে, কিন্তু ঢাকা স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের উপযোগী হয়েছে বলে তিনি মনে করেন না। অনঙ্গ মোহন নাহার প্রস্তাবের উত্তরে শার্প আরো বলেছিলেন যে, পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশে ১১টি আর্টস্ কলেজ আছে, অথচ বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে মাত্র ৭-টি এবং পাঞ্জাবে ১২টি ঐ শ্রেণীর কলেজ রয়েছে। এতদসত্ত্বেও তিনি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবটি নাকচ করে দেন। পূর্ববঙ্গ-আসাম প্রাদেশিক মুসলমান সমিতি ও 'প্রাদেশিক মুসলিম লীগ' হেয়ারকে বিদায় সম্ভাষণ ও বেইলীকে স্বাগত জানাতে গিয়ে ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবি করেছিলেন (১৯-৮-১৯১১)। হেয়ার যদিও তাঁদের দাবির যথার্থতা স্বীকার করেন, কিন্তু তিনি এ কথাও বলেন যে, অর্থের অভাবে সত্বর বিশ্ববিদ্যালয় পাওয়ার আশা করা যায় না।[৮]

লর্ড হার্ডিঞ্জ এর নিকট ১৯১১ সালের ২৮ অক্টোবর পূর্ববাংলা ও আসাম প্রদেশের লেফটেন্যান্ট গভর্নর সি. বেইলী ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় ও একটি হাইকোর্ট স্থাপনের প্রস্তাব করেছিলেন। তখন লর্ড হার্ডিঞ্জ সেই প্রস্তাবে সাড়া দেন নি। বঙ্গ-বিভাগ রদ হওয়ার পর ১৯১২

Dhaka University Institutional Repository

সালের ৩১ জানুয়ারী মুসলিম প্রতিনিধি দলের নিকট ঢাকায় তিনি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করেন এবং এমনি করে ঐ ঘোষণাকে বঙ্গ-বিভাগ প্রত্যাহারের ক্ষতিপূরণ এবং পূর্ববঙ্গবাসীদের প্রতি তাঁর নিজস্ব একটি নতুন অনুদানরূপে উপস্থাপিত করেন।

লর্ড হার্ডিঞ্জের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ঘোষণাকে মুসলমানরা বঙ্গ-বিভাগ প্রত্যাহারের ক্ষতিপূরণ মনে করে না, বরং উচ্চশিক্ষা লাভের সোপান বিবেচনা করেই স্বাগত জানান। এ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে মুসলিম নেতৃবৃন্দের অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয় এবং দীর্ঘ ৯/১০ বছর তাঁদেরকে অপেক্ষা করতে হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ঘোষণা শুনেই হিন্দু বুদ্ধিজীবী ও হিন্দু নেতৃবৃন্দ এর বিরোধিতায় উঠে পড়ে লাগেন।

এ.কে. ফজলুল হক বলেনঃ I was very closely and activity associated with all the plans and schemes and I know the difficulties which we Muslims had to face and the obstinate opposition we had to overcome at the time in pushing the scheme for the establishment of Dacca University.

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধিপত্য ও গুরুত্ব হ্রাস পাবে-এ ধারণার বশবর্তী হয়ে পশ্চিম বঙ্গের বুদ্ধিজীবীরা এর বিরোধিতা করেন, যদিও তাঁরা জনসমক্ষে বিরুদ্ধাচরণের ভিন্ন কারণ তুলে ধরেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মধ্যে হিন্দু, মুসলিম নির্বিশেষে পূর্ববাংলার সকল মানুষের উচ্চ শিক্ষার আশা-আকাঙ্ক্ষা নিহিত থাকা সত্ত্বেও স্থানীয় হিন্দু বুদ্ধিজীবীরা খুব সম্ভব সাম্প্রদায়িক মানসিকতার দরুণ এর বিরোধিতা থেকে বিরত করেন। বিরুদ্ধবাদীদের অজুহাত ছিল দু'প্রকারেরঃ কোন কোন সভার প্রতিবাদ-প্রস্তাবে পূর্ববঙ্গবাসীদের দরিদ্র ও চাষা-ভূষা হওয়ার অজুহাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা অনাবশ্যক বলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, কোন কোন প্রস্তাবে বলা হয় যে, এর ফলে শিক্ষার উন্নতি ব্যহত হবে, আর কখনো কখনো এ বলেও ক্ষোভ প্রকাশ করা হয় যে, এতে বাংলা বিভক্ত হয়ে যাবে। ১৯১২ সালের ২রা ফেব্রুয়ারী লর্ড হার্ডিঞ্জের প্রতিশ্রুতি সরকারীভাবে সমর্থিত হওয়ার সাথে সাথেই বাঙালী হিন্দু বুদ্ধিজীবি ও কিছু সংখ্যক কংগ্রেসী মুসলমানের বিরোধিতা দানা বেঁধে উঠতে থাকে। তাঁরা পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে, বক্তৃতা মঞ্চে দাঁড়িয়ে এবং ভাইসরয়ের নিকট প্রতিনিধি দল পাঠিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অপ্রয়োজনীয়তা প্রমাণের ব্যর্থ প্রচেষ্টা চালান। ঢাকা (৫ ও ১০ ফেব্রুয়ারী), কলকাতা (১১ ফেব্রুয়ারী), ফরিদপুর (১১ই ফেব্রুয়ারী), নারায়ণগঞ্জ (১০ ফেব্রুয়ারী), ময়মনসিংহ (১১ ফেব্রুয়ারী), দিনাজপুর (২৩ মার্চ), রাজশাহী (২৬ মার্চ), রাজশাহী (২৬ মার্চ), কুমিল্লা, পটিয়া, মেদিনীপুর প্রভৃতি স্থানে প্রতিবাদ

Dhaka University Institutional Repository

সভা অনুষ্ঠিত হয়। ৫ ও ১০ ফেব্রুয়ারী ঢাকা বার লাইব্রেরীতে 'ঢাকা উকিল সমিতি'র দু'টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাদ্বয়ের সভাপতি ছিলেন বাবু ত্রৈলোক্যনাথ বসু। উভয় সভার গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয় যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে শিক্ষার অবনিত হবে; তাই প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন আবশ্যকতা নেই। ১১ ফেব্রুয়ারী বিহারের মৌলবী লিয়াকত হোসেনের উদ্যোগে ও সুরেন্দ্রনাথ সমাজপতির সভাপতিত্বে কলকাতার বিডন স্কোয়ারে এক প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সমাজপতি তাঁর সভাপতির ভাষণে বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে বাংলা সাহিত্য বিভক্ত হবে; আর সাহিত্য এক না হলে একতার আশা করা যায় না; এরূপ ব্যবস্থার ফলে বাঙালী জাতির অবস্থা পূর্বকার বঙ্গ বিভাগ অপেক্ষা বেশি শোচনীয় ও ক্ষতিকর হবে; এতে বাঙালী জাতি বিভক্ত হয়ে পড়বে। সিলেটের বিপিন চন্দ্র পাল (১৮৫৮-১৯৩২) বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে অশিক্ষিত ও কৃষক বহুল পূর্ববঙ্গের শিক্ষাদান কার্যে ব্যাপৃত থাকতে হবে; পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিম বঙ্গের জনসাধারণের শিক্ষা, নীতি ও মেধার মধ্যে সামঞ্জস্য থাকবে না। ২৬ মার্চ কলিকাতা টাউন হলে ব্যারিস্টার ব্যোমকেশ চক্রবর্তীর সভাপতিত্বে এক বিরাট প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে বলা হয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যেন শিক্ষাদানমূলক ও ছাত্রাবাসযুক্ত হয় এবং ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটি বহির্ভূত কোন স্কুল কলেজের উপর যেন এর কোন অধিকার না থাকে; পূর্ববঙ্গে যেন 'বিশেষ শিক্ষা কর্মচারীও না থাকে; কারণ এরূপ শিক্ষা কর্মচারী নিয়োগ করলে বাংলাদেশে দু'প্রকারের শিক্ষানীতি প্রচলিত হবে। মিঃ আবদুর রসুল বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন প্রয়োজন নেই। 'মোহাম্মদী' পত্রিকার সম্পাদক মওলানা আকরাম খাঁ বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হলে গরীব মুসলমান আর কলেজে পড়তে পারবে না; অধিকাংশ মুসলমান ছাত্র পরের বাড়ীতে খেয়েই পড়ে; ছাত্রদেরকে যদি কলেজে বাস করতে হয়, তবে অধিকাংশ মুসলমান ছাত্র অর্থাভাবে কলেজে বাস করতে পারবে না। মৌলবী আবুল কাসেম বলেন, যদিও মুসলিম লীগ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা সমর্থন করেছেন, তবু মুসলমানগণ এর ঘোর বিরোধী।

১৯১২ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারী বর্ধমানের স্যার রাসবিহারী ঘোষ (১৮৪৫-১৯২১) এর নেতৃত্বে এক প্রতিনিধিদল ভাইসরয়ের সঙ্গে দেখা করে বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হবে 'অভ্যন্তরীণ বঙ্গ-বিভাগ' এর সমর্থক; তাছাড়া পূর্ববঙ্গের মুসলমানরা প্রধানত কৃষক; তাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় তারা কোন মতেই উপকৃত হবে না।

ভাইসরয় তাঁর প্রতিশ্রুতিতে অনড় থাকেন এবং উত্তরে বলেনঃ The constitution of a University at Dacca and the appointment of a special education and local.. I am hopeful that large issues of educational policy, on which the future of India so greatly depends, will be viwed with a wide

Dhaka University Institutional Repository

outlook, and apart from personal or political interests. ভারত সরকার হিন্দু বিরোধিতার প্রতি কর্ণপাত না করে ১৯১২ সালের ৪ এপ্রিল বেঙ্গল গভর্নমেন্টের নিকট এক পত্রে প্রস্তাবিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের আনুমানিক হিসাবসহ একটি পূর্ণাঙ্গ স্কীম দাখিল করার নির্দেশ দেন। ১৯১২ সালের ২৭ মে বেঙ্গল গভর্নমেন্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কীম রচনার জন্য রবার্ট ন্যাথানের কর্তৃত্বাধীনে ১৩ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করেন। এই কমিটি ন্যাথানের-কমিটি নামে পরিচিত। অন্যান্য সদস্য ছিলেনঃ (১) বঙ্গদেশের জনশিক্ষা পরিচালক জি. ডব্লিউ. কাচ্‌লার (২) কলিকাতা হাইকোর্টের এডভোকেট ডক্‌টর রাসবিহারী ঘোষ (৩) ধনবাড়ীর নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী (৪) কলিকাতা হাইকোর্টের এডভোকেট নওয়াব সিরাজুল ইসলাম খানবাহাদুর (৫) ঢাকার জমিদার ও উকিল বাবু আনন্দ চন্দ্র রায় (৬) আলীগড় কলেজের ট্রাস্টী ও সিন্ডিকেট সদস্য মুহম্মদ আলী বি.এ. (৭) কলকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যক্ষ এইচ. আর. জেমস্ (৮) ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ এ.জে. আর্চবোল্ড (৯) ঢাকা জগন্নাথ কলেজের অধ্যক্ষ বাবু ললিত মোহন চ্যাটার্জি (১০) কলকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক সি. ডব্লিউ. পিকে (১১) ঢাকা মাদরাসার সুপারিন্টেনডেন্ট শামসুল উলামা আবু নসর মুহম্মদ ওহীদ (১২) ডি.এস. ফ্রেজার বি.এ. (সেক্রেটারী)। ন্যাথান কমিটির সুপারিশে বলা হয় যে, ভারত সরকারের অভিপ্রায় অনুসারে প্রস্তাবিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হবে শিক্ষাদায়ক ও আবাসিক; ফেডারেল ধরনের নয়। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকবে শুধু ঢাকা শহরের কলেজগুলো; শহর-বহির্ভূত কোন কলেজের উপর এর নিয়ন্ত্রণ থাকবে না। ন্যাথান কমিটি ২৪টি সাব স্পেশাল সাব-কমিটির সহায়তায় প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য সদস্য ছিলেন রবার্ট ন্যাথান, নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী, ডব্লিউ. এ. জে. আর্চবোল্ড, মওলানা মুহম্মদ আলী, শামসুল উলামা আবু নসর মুহম্মদ ওহীদ, সুপারিনটেনডেন্ট, ঢাকা মাদরাসা, নওয়াব খাজা সলীমুল্লাহ, শামসুল উলামা শিবলী নুমানী (লখনৌ), মওলানা শাহ্ সুলায়মান ফলুওয়ারী (পাটনা), শামসুল মুহাম্মদ ইরফান, অধ্যাপক, ঢাকা কলেজ, মওলানা মুহম্মদ মুসা, সুপারিনটেনডেন্ট, হুগলী মাদরাসা ও মৌলবী ফিদা আলী খান, অধ্যাপক চট্টগ্রাম কলেজ। আরবী ফার্সীর সাব-কমিটিতে সদস্য ছিলেন নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী, মিঃ ডব্লিউ. এ. জে. আর্চবোল্ড, শামসুল উলামা আবু নসর ওহীদ, শামসুল উলামা কামালুদ্দীন আহমদ, মৌলবী মুহম্মদ ইরফান, মৌলবী ফিদা আলী খান ও মওলানা মুহম্মদ মুসা। আরবীর সাব-কমিটি আই.এ. থেকে বি. এ. পাস. অনার্স ও এম. এ. পর্যন্ত আরবীর পাঠ্যসূচী ও কর্মসূচী রচনা করেন। ইসলামিক স্টাডিজ এর সাব-কমিটি স্কুল ও মাদরাসা থেকে আরম্ভ করে আই. এ. বি. এ. পাস অনার্স ও এম. এ. পাঠ্যসূচী ও কর্মসূচী প্রস্তুত করেন। ন্যাথান-কমিটি ১৯১২ সালের শরৎকালে বেঙ্গল গভর্নমেন্টের নিকট প্রস্তাবিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত রিপোর্ট দাখিল করেন।

Dhaka University Institutional Repository

নবাব সলীমুল্লাহ ছিলেন পূর্ববাংলার শিক্ষার উন্নতির জন্য নিবেদিত প্রাণ। ভাইসরয় লর্ড হার্ডিঞ্জ কর্তৃক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ঘোষিত হওয়ায় তিনি বঙ্গবিভাগ রদজনিত নিরাশার অন্ধকারে তাঁর স্বপ্নে দেখা উজ্জ্বল পূর্ববাংলার অনেকটা আভা দেখতে পান এবং সেই ঘোষণাকে স্বাগত জানান। কিন্তু হিন্দু বুদ্ধিজীবীদের তুমুল বিরোধিতায় তিনি খুবই ব্যথিত হন। ১৯১২ সালের ৩ ও ৪ মার্চ কলকাতায় তাঁর সভাপতিত্বে 'নিখিল ভারত মুসলিম লীগ'-এর ৫ম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতির ভাষণে তিনি হিন্দু বুদ্ধিজীবী ও কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দের সমালোচনা করে বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ফলে যদি মুসলিম প্রধান পূর্ববাংলার মুসলমানরা বেশি উপকৃত হয়, তাতে হিন্দু বুদ্ধিজীবীদের মনোপীড়ার কী কারণ থাকতে পারে? তিনি আরো বলেনঃ গুটিকতক রাজনীতিকের মনস্কাম চরিতার্থ করার জন্য আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ার অপরাধে দেশ ত্যাগ করে যেতে পারি না। এবার তার ভাষায় শোনা যাকঃ One distinguished leader calls this University the apple of discord and the opponents of the scheme pretend to see in its inaugaration a clever Linguistic partition of the Bengalis, quite as percious as the administrative partition. Now I am very sorry that our Bengali friends should scent danger where none exists, and oppose the scheme in a way which is sure to set the two communities against each other..... No doubt, any benefit to East Bengal necessarily means a benefit to that section of the population numbering 20 millions, who happen to be musalmans, but this is a contingency which can not be avoid. We can not cease to be a part and parcel of the population of that part of the country simply to please the fancy of a set of politicians who would eternally penalize the whole of Eastern Bengal for the sin of having harboured so large a Musalman majority.

বঙ্গ-বিভাগের প্রতি হিন্দুদের বিরোধিতার ফলে এক দফা হিন্দু-মুসলিম সৌহার্দ্য বিনষ্ট হয়, আবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রতি তাদের ঈর্ষান্বিত হওয়ার দরুন উভয় জাতি পরস্পর আরো দূরে সরে যেতে থাকে। ন্যাথান কমিটির রিপোর্ট যথাসময় দাখিল করা হলেও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা বিলম্বিত হয়। এতে মুসলিম নেতৃবৃন্দের মনে গভর্নমেন্টের আসল মনস্কাম সম্পর্কে সন্দেহ জাগতে শুরু করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আন্দোলন শুরু হয় বিংশ শতাব্দীর শুরুতে। ১৯০৬ সালের ১ অক্টোবর আগা খানের নেতৃত্বে ভারতের ৩৪ জন মুসলিম নেতা সিমলায় বড়লাট লর্ড মিন্টোর সাথে সাক্ষাৎ করেন। তারা

Dhaka University Institutional Repository

মুসলমানদের পক্ষ থেকে কতিপয় সুনির্দিষ্ট দাবি পেশ করেন। এতে ঢাকায় একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবিও ছিল। ১৯১১ সালের ১৯ আগস্ট কার্জন হলে ছোটলাট ল্যান্সলট হেয়ারের বিদায় ও চার্লস বেইলির আগমন উপলক্ষে সংবর্ধনা সভায় নবাব সলিমুল্লাহ ও নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী পৃথক ২টি মানপত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবি উত্থাপন করেন। ১৯১২ সালের ৩১ জানুয়ারি বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ ঢাকা সফরে আসেন। এ সময় নবাব সলিমুল্লাহ ও নওয়াব আলী চৌধুরীসহ ১৯ সদস্যের প্রতিনিধি দল লর্ড হার্ডিঞ্জের কাছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আবেদন করেন। তিনি এ ব্যাপারে আশ্বাস দেন। কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি স্যার আশুতোষ মুখার্জি, ড. রাসবিহারী ঘোষ, সিলেটের বিপিন পালসহ কতিপয় বুদ্ধিজীবি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। ১৯১২ সালের ২৮ মার্চ কলকাতার গড়ের মাঠে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে তারা প্রতিবাদ সভা ডাকেন। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৯১২ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি ড. রাসবিহারী ঘোষের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল ভাইসরয়ের সাথে সাক্ষাৎ করে বলেন, যেহেতু পূর্ব বাংলার অধিকাংশ অধিবাসী মুসলিম কৃষক, এই বিশ্ববিদ্যালয় তাদের কোন কাজে আসবে না। তারা প্রস্তাবিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে 'মক্কা বিশ্ববিদ্যালয়' বলে ব্যঙ্গ করেন। এই বিশ্ববিদ্যালয় যাতে প্রতিষ্ঠিত না হয়, সেজন্য ১৮ বার স্মারকলিপি পেশ করা হয়েছিল লর্ড হার্ডিঞ্জের কাছে।

প্রবল প্রতিরোধ সত্ত্বেও ১৯১২ সালের ১২ এপ্রিল ভারত সরকার বঙ্গের প্রাদেশিক সরকারকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তাব পাঠানোর নির্দেশ দেয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য গঠিত ন্যাথান কমিটির অন্যতম সদস্য ছিলেন নওয়াব আলী চৌধুরী। এর অধীনে ২৫টি সাব-কমিটির মধ্যে তিনি ৬টির সদস্য নিযুক্ত হয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এরপর ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে এবং ১৯১৫ সালে নবাব সলিমুল্লাহর ইন্তেকালে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কাজে অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। নওয়াব আলী চৌধুরী তখন ইমপেরিয়াল কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন। তিনি ১৯১৭ সালের ৭ মার্চ ইমপেরিয়াল কাউন্সিলে পুনরায় এ ব্যাপারে দাবি উত্থাপন করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কাজ বিলম্বিত হতে দেখে নওয়াব আলী চৌধুরী ২০ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা বিল অতি সত্ত্বর উত্থাপনের জন্য ভারতীয় আইন সভায় প্রস্তাব পেশ করেন। গভর্মেন্টের পক্ষে শিক্ষা সচিব শঙ্করণ নায়ার বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা বিলের খসড়া প্রস্তুত রয়েছে এবং যুদ্ধাবসানে তা যথাসময় প্রতিষ্ঠিত হবে-গভর্নমেন্টের দিক থেকে এই নিশ্চয়তা দেওয়ায় তিনি তাঁর প্রস্তাব প্রত্যাহার করেন। ১৯১৭ সালের ২৬ নভেম্বর বেঙ্গল গভর্নমেন্ট এক ঘোষণায় মুসলমানদের এ নিশ্চয়তা প্রদান করেন যে, ন্যাথান-কমিটির রিপোর্ট সম্পর্কে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের অনুমোদন পাওয়ার পর যথাসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হবে। ১৯১৭ সালে কলিকাতা

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন গঠিত হয় এবং ন্যাথান-কমিটির রিপোর্ট সেই কমিশনের নিকট অনুমোদনের জন্য পাঠানো হয়। কমিশনের অনুমোদন লাভের পর ১৯২০ সালের ২৩ মার্চ ভাইসরয়ের ব্যবস্থাপক পরিষদে 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এ্যাক্ট' পাস করা হয়। এখানেও ভাইসরয়-কাউন্সিলের হিন্দু সদস্যগণ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করেন। এজন্য খানসাহেব খাজা মুহম্মদ আযম দুঃখ করে বলেনঃ We have been sorry to see that a number of Hindu members of the Viceregal Council ventedtheir malice against the Musalmans and showed unkindness to them during the passage of the Bill. We never expected such treatment from them. It has been pointed out in bold relief that the dispute between the two communities remained dispute yet. ১৯২১ সালের জুলাই মাসে যথারীতি এ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা আরম্ভ হয়। নবাব সলীমুল্লাহ বাহাদুর তাঁর স্বপ্নে দেখা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দেখে যেতে পারেন নি। তাঁর শিক্ষা-অবদানকে স্মরণীয় করার উদ্দেশ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর ১৯৩৯ সালের আগস্ট মাসে এর প্রথম নির্মিত হলের নামকরণ করা হয় 'সলীমুল্লাহ মুসলিম হল' । বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম কোর্টসভায় এ.কে. ফজলুল হক পূর্ববাংলার মুসলমানদের শিক্ষা আন্দোলনে নবাব সলীমুল্লাহর অবদানের জন্য তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের আহ্বান করে একটি প্রস্তাব পেশ করেন। প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। প্রস্তাবটি এ.কে. ফজলুল হকের ভাষায় বিবৃত করা হলোঃ In the first meeting of the University Court I moved the resolution recording, the appreciation and gratefulness of the Muslims of East Bengal to the late Nawab Salimullah who was a true lover of his country and people, and a courageous and unselfish fighter for their progress and prosperity.

নবাব সলীমুল্লাহর সাথে নওয়াব আলী চৌধুরীর সম্পর্ক

স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁয়ের প্রতি যেমন নবাব সলীমুল্লাহ ও নওয়াব আলী চৌধুরীর প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। নবাব সলীমুল্লাহ ও নওয়াব আলী চৌধুরীর মধ্যেও তেমনই ভালবাসা ছিল। তাঁরা বিভিন্ন ভাষণে স্যার সৈয়দের নাম সম্ভ্রমে উচ্চারণ করতেন। তাঁরা মনে করতেন, স্যার সৈয়দ ছিলেন উপমহাদেশের যাবতীয় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের আদি পিতা। তাঁদের এ ধারণাকে ভিত্তিহীন বলা যায় না। বস্তুত ১৮৫৯ সালে রচিত স্যার সৈয়দের 'আসবাব-এ-বাগাবয়াত-এ-হিন্দু' নামক পুস্তিকা থেকেই উপমহাদেশে রাজনীতির গোড়াপত্তন হয়।

Dhaka University Institutional Repository

রাজনৈতিক ও সামাজিক চিন্তাধারার দিক থেকে সলীমুল্লাহ্ ও নওয়াব আলী চৌধুরী ছিলেন এপিঠ আর ওপিঠ। তাঁরা ছিলেন পরস্পর আন্তরিক বন্ধু ও সহযোগী। পরিষ্কার ভাষায় বলতে গেলে, নওয়াব আলী ছিলেন সলীমুল্লাহর দোসর ও দক্ষিণ হস্ত। ১৯০৫ সাল থেকে ১৯১৪ সাল পর্যন্ত উভয়কে শিক্ষাবিষয়ক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকতে দেখা যায়। তাঁরা উভয়ই জোরালোভাবে বঙ্গ-বিভাগ সমর্থন করেন এবং তা টিকিয়ে রাখার জন্য কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চেষ্টা করেন। নবাব সলীমুল্লাহ্ ছিলেন 'প্রাদেশিক মোহামেডান এডুকেশন্যাল কনফারেন্সের সভাপতি, আর নওয়াব আলী ছিলেন সেক্রেটারী। সমিতির কোন কোন অধিবেশনে নওয়াব আলী চৌধুরী সভাপতিত্ব করেন। তিনি সমিতির বার্ষিক রিপোর্টগুলোতে পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের শিক্ষার উন্নতি অনুন্নতির পরিসংখ্যান পেশ করে মুসলিম শিক্ষার রূপরেখা অংকন করতেন। ১৯১৪ সালে নওয়াব আলী চৌধুরীর সভাপতিত্বে ঢাকায় অনুষ্ঠিত 'প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতি'র যে অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়, তাতে তিনি দীর্ঘ ভাষণ দেন। এ ভাষণ-পাঠে প্রতীয়মান হয় যে, উপমহাদেশীয় আধুনিক শিক্ষার ইতিহাস সম্পর্কে তাঁর গভীর জ্ঞান ছিল এবং বিভিন্নমুখী শিক্ষাপ্রণালী সম্বন্ধেও তাঁর ধারণা ছিল স্বচ্ছ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় নওয়াব আলী চৌধুরী সলীমুল্লাহর সহযোগী ছিলেন। সলীমুল্লাহর মৃত্যুর (১৯১৫) পর প্রধানত নওয়াব আলী চৌধুরীর প্রচেষ্টার ফলেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কাজ তরান্বিত হয়। ১৯১৪ সালে ১ম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হলে আর্থিক সংকটের কারণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রশ্নটি চাপা পড়ে যায়। সে সময় নওয়াব আলী চৌধুরী ছিলেন ইম্পিরিয়াল কাউন্সিলের সদস্য। তিনি ১৯১৭ সালের ৭ ও ২০ মার্চ ইম্পিরিয়াল কাউন্সিলে বিষয়টি উত্থাপন করে এদিকে গভর্নমেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কাজ অনেকটা ত্বরান্বিত হয়। ১৯২০ সালের ১১ এপ্রিল 'ঢাকা ডিস্ট্রিক্ট মুসলিম এসোসিয়েশনের এক অধিবেশনে খান সাহেব খাজা মুহম্মদ আযম সভাপতির ভাষণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় নওয়াব আলী চৌধুরীর ভূমিকা বর্ণনা করে বলেনঃ This University came into being at the utmost exertion of the Hon'ble Nawab Syed Nawab Ali Chowdhury; who had taken up this cause after the death of Sir Salimullah. Had he not agitated over the question ceaselessly, probably this Dacca University would not have come into being. The promise of the Viceroy would have remained a promise for all time to come.

Dhaka University Institutional Repository

নওয়াব আলী চৌধুরী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে গঠিত ন্যাথান কমিটির সদস্য এবং এর অধীন ২৫টি সাব-কমিটির মধ্যে ৬টিরই সদস্য ছিলেন। সলীমুল্লাহ্ ন্যাথান-কমিটির সদস্য ছিলেন না। তিনি এর ইসলামিক স্টাডিজ এর সাব কমিটিতে সদস্য ছিলেন।

বঙ্গ-বিভাগের সময় থেকে সলীমুল্লাহর মৃত্যু পর্যন্ত বাংলার নেতা রূপে সলীমুল্লাহর পরেই ছিল নওয়াব আলী চৌধুরীর স্থান। এর পর তাঁদের স্থলাভিষিক্ত হন এ.কে.ফজলুল হক। নওয়াব সলীমুল্লাহর রাজনীতির ধারাবাহিকতা বজায় রাখার চেষ্টা করতে গিয়েই ১৯১৬ সালে কংগ্রেস-লীগের লখনৌ-চুক্তির সময় নওয়ার আলী চৌধুরীকে নিজ হাতে গড়া 'মুসলিম লীগ' ত্যাগ করতে হয়। কংগ্রেস তথা হিন্দুদের সাথে একত্রে রাজনীতি করার পক্ষপাতী এরা কেউ ছিলেন না। সলীমুল্লাহর মৃত্যুর পরেও নওয়াব আলী চৌধুরী দীর্ঘকাল দেশ ও সমাজের সেবা করেন। তাঁর কর্মজীবন আরম্ভ হয় সলীমুল্লাহর পূর্বে এবং তার মৃত্যুর পরেও তা অব্যাহত থাকে। তাঁর কর্মক্ষেত্র সলীমুল্লাহ'র চাইতেও বেশি বিস্তৃত ছিল। এরা উভয়ই জমিদার ছিলেন। তবে সলীমুল্লাহ ছিলেন নওয়াব আলী চৌধুরীর চাইতেও বড় জমিদার। সলীমুল্লাহ নিজ ঘরেই পড়া-শোনা সমাপ্ত করেন। নওয়াব আলী চৌধুরী কলেজ পর্যন্ত গিয়ে ক্ষান্ত হন। ইংরেজী ও উর্দু ভাষায় সলীমুল্লাহর বেশ দক্ষতা ছিল। নওয়াব আলী চৌধুরী ইংরেজীতে নিপুণ ছিলেন। তিনি মুসলমানী বাংলার উন্নতি সাধনের পরামর্শ দেন এবং নিজেও এ ভাষায় কয়েকটি বই রচনা করেন। বাংলা ভাষার প্রতি তাঁর বিশেষ মমত্ববোধ ছিল, যা সলীমুল্লাহর ছিল না। শিক্ষা বিষয়ে সলীমুল্লাহর চাইতে নওয়াব আলী চৌধুরীর জ্ঞান অনেক বেশি ছিল। তারা উভয়ই ধর্মভীরু ছিলেন এবং পাঠ্যপুস্তকে ইসলামী ভাবধারা প্রবর্তনের পক্ষপাতী ছিলেন। উভয়ই ছিলেন নিছক লোকায়ত শিক্ষার বিরোধী। ইসলামী ছাচেঁ শিক্ষার্থীদের চরিত্র গড়ে উঠুক এটাই ছিল উভয়ের কামনা। সলীমুল্লাহর চাইতেও নওয়াব আলী চৌধুরী ভাল পার্লামেন্টেরিয়ান ও বক্তা ছিলেন।

সলীমুল্লাহর ন্যায় নওয়াব আলী চৌধুরীও মুসলীম উপমহাদেশের অন্যতম প্রধান নেতা ছিলেন। রাজনীতি-ক্ষেত্রে এরা উভয়ই ছিলেন বৃটিশ গভর্নমেন্টের অনুগত। এরা নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির পক্ষপাতী ছিলেন। বঙ্গ-বিভাগ রদের পরেও এরা সনাতন রাজনীতি ত্যাগ করে স্বায়ত্তশাসন অর্জনের দিকে পা বাড়াতে চান নি। এরা উভয়ই ছিলেন গণতান্ত্রিক ভাবাপন্ন। উচ্চশ্রেণীর জমিদার হয়েও এরা জনসাধারণের সঙ্গে মেলামেশা করতেন এবং জনসাধারণের উন্নতিকল্পে যারপর নাই চেষ্টা করতেন। জাতি এঁদের কাছে চিরঋণী।

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবী

১৯১১ সালের ১২ ডিসেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে বঙ্গভঙ্গ রদ ঘোষণায় পূর্ব-বাংলার মুসলমান জনগোষ্ঠীর মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হলো। শিক্ষা-দীক্ষা সর্বক্ষেত্রে ত্বরিৎ উন্নতি হচ্ছিল, তা বন্ধ হয়ে গেল। মুসলমান যে তিমিরে, সেই তিমিরেই আবার নিক্ষিপ্ত হলো। মুসলমান নেতৃবৃন্দ ইংরেজ সরকারের তীব্র সমালোচনা করতে শুরু করেন। বঙ্গভঙ্গ রদের প্রতিবাদে নওয়াব সলীমুল্লাহ বৃটিশ সরকারের কে.সি.আই উপাধি অর্জন করেন। এটাকে তিনি সরকারের ঘুষ বলে মনে করেন। মুসলমান নেতৃবৃন্দের মধ্যে অনেকেই বিদ্রোহাত্মক মনোভাব গ্রহণ করেন। কেউ কেউ বৃটিশ সরকারের নিকট তার ক্ষতিপূরণ দাবী করেন। কলকাতা মোহামেডান এসোসিয়েশনের এক সভায় ক্ষতিপূরণ দাবী করে একটি প্রস্তাবও পাশ হয়। মুসলমান যুব সম্প্রদায়ের মধ্যেও তীব্র অসন্তোষ দেখা যায়। বিক্ষুব্ধ যুব সমাজের নেতৃত্ব দেন-শের-ই বাংলা এ.কে. ফজলুল হক। পূর্ব বাংলার অবস্থা সরেজমিনে দেখার জন্য বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ ১৯১২ সালের ৩১ জানুয়ারী ঢাকায় আসেন। নবাব সলীমুল্লাহ্, নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী, জনাব এ. কে. ফজলুল হক প্রমুখ বড়লাটের সঙ্গে দেখা করেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবী পেশ করেন। লর্ড হার্ডিঞ্জ এই দাবী মেনে নেন এবং ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দেয়।

হিন্দু সম্প্রদায়ের বিরোধিতা

১৯১২ সালের ২ ফেব্রুয়ারী ভারত সরকার ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দিলেন। এই ঘোষণা হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার করে। শিক্ষা জাতির মেরুদন্ড। মুসলমানরা শিক্ষিত হয়ে উঠলে মেরুদন্ড সোজা করে দাঁড়াবে, তখন আর তাদেরকে সেবাদাস করে রাখা যাবেনা। এই ভয়ে রবীন্দ্রনাথের মত মনীষী পর্যন্ত এর বিরোধিতা করেন। ১৯১২ সালের ২৮ মার্চ কলকাতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্তে প্রতিবাদ করে তারা সভা করলো। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন স্বয়ং বিশ্বকবি। পূর্ববঙ্গের শিলাইদহ জমিদারীর আয়ে তিনি পশ্চিমবঙ্গে বোলপুরে শান্তিনিকেতন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেন। অথচ পূর্ববঙ্গে সামান্য একটি পাঠশালা পর্যন্ত স্থাপন করেননি। তার মুসলমান প্রজারা শিক্ষিত হয়ে উঠলে জমিদার শাসন ও শোষণ চালানো হয়ত বাধাগ্রস্ত হবে, এই ভয়ে তিনি চাননি মুসলমানরা শিক্ষিত হয়ে উঠুক। এই চরম মুসলিম বিদ্বেষী কবির 'সোনার বাংলা' আমাদের জাতীয় সঙ্গীত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে হিন্দু সংবাদপত্রগুলো বিষোদগার করতে থাকে। হিন্দু বুদ্ধিজীবী ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ বিভিন্ন শহরে মিটিং করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার

Dhaka University Institutional Repository

বিরুদ্ধে প্রস্তাব পাস করে পাঠাতে লাগলেন বৃটিশ সরকারের কাছে। Calcutta University Commision Report Vol. IV তে দেখা যায় বাবু গিরীশচন্দ্র ব্যানার্জী, ডঃ স্যার রাম বিহারী ঘোষ এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর স্যার আশুতোশ মুখার্জীর নেতৃত্বে বাংলার এলিটগণ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে ১৮ বার স্মারকলিপি সহকারে তদানীন্তন ভাইসরয় লর্ড হার্ডিঞ্জের উপর চাপ সৃষ্টি করেছিলেন। ডঃ স্যার রাম বিহারী ঘোষের নেতৃত্বে হিন্দু প্রতিনিধিগণ বড়লাটের কাছে এই বলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে যুক্তি প্রদর্শন করলেন যে, পূর্ব বাংলার মুসলমানগণ অধিকাংশই কৃষক। অতএব, বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করলে তাদের কোন উপকার হবে না।

ঢাকায় হিন্দুরা পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরোধিতা করতে লাগলেন। 'এ হিস্ট্রি অব ফ্রীডম মুভমেন্ট' গ্রন্থে উল্লেখ আছে:

The controversy that started on the Proposal for founding a university at Dacca throws interesting light on the attitude of the Hindus and Muslims. About two hundred prominent Hindus of West Bengal, Headed by Babu Ananda Chandra Roy.' The pleading pleader of Dacca submitted a memorial to the viceroy vehement by against the establishment of a university as Macca University.[১]

অনুবাদ: 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়' স্থাপন প্রস্তাবকে কেন্দ্র করে যে বিতর্কের সূচনা হলো তাতে হিন্দু ও মুসলিম দৃষ্টিভঙ্গির স্বরূপ প্রকাশ পেল। ঢাকার নামকরা উকিল বাবু আনন্দ চন্দ্র রায়ের নেতৃত্বে পূর্ববঙ্গের প্রায় ২০০ (দুইশত) নেতৃত্বস্থানীয় হিন্দু বড়লাটের নিকট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের বিরুদ্ধে কড়া প্রতিবাদ জানায়। তারা বিদ্রুপ করে এই বিশ্ববিদ্যালয়কে 'মক্কা বিশ্ববিদ্যালয়' আখ্যায়িত করলেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পরও হিন্দুদের বিদ্বেষ প্রশমিত হয়নি; বরং পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতির অধ্যাপক শ্রী দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভান্ডার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দেয়া এক বক্তব্যে বলেন "কলিযুগে বৃদ্ধগঙ্গা নদীর তীরে হরতনা নামক একজন অসূর জন্মগ্রহণ করবে। মূল গঙ্গার তীরে একটি পবিত্র আশ্রম আছে। সেখানে অনেক মুনি-ঋষি এবং তাদের শিষ্যগণ বাস করেন। এই অসূর সেই আশ্রমটি নষ্ট করার জন্য নানা প্রলোভন দেখিয়ে একে একে অনেক শিষ্যকে নিজ আশ্রমে নিয়ে যাবে। যারা অর্থলোভে পূর্বের আশ্রম ত্যাগ করে ঐ অসূরের আকর্ষণে বৃদ্ধ গঙ্গার তীরে যাবে, তারাও ক্রমে অসূরত্ব প্রাপ্ত হবে এবং তারা অশেষ দূর্দশাগ্রস্ত হবে।"

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভাইস চ্যান্সেলর স্যার ফিলিফ জে. হার্টস (১-১২-'২০ থেকে ৩১-১২-'২৫) কে হরতনা করেছেন, শ্রী ভান্ডার করের বক্তব্যে 'আশ্রম' বলতে বোঝানো হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে। আমাদের 'বুড়িগঙ্গা' হয়েছে শ্রী ভান্ডার করের বক্তব্যে 'বৃদ্ধগঙ্গা' আর মূল গঙ্গা-তীরের পবিত্র আশ্রম বলতে শ্রী ভান্ডার কর বুঝিয়েছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে। শ্রী ভান্ডার করের কথা ঢাকা অর্থাৎ পূর্ব বাংলা অসূরদের স্থান। পবিত্র স্থান কলকাতা থেকে যেসব ঋষি শিষ্য ঢাকায় চাকরি করতে আসবেন তারাও অসূর হয়ে যাবে। এ থেকেই বোঝা যায় তৎকালীন হিন্দুদের তীব্র মুসলিম বিদ্বেষ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি

৪ এপ্রিল, ১৯১২ তারিখে ভারত সরকার চূড়ান্তভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রস্তাব অনুমোদন করে। ২৭ মে ১৯১২ তারিখে বাংলা সরকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি যা ন্যাথান কমিটি নামে সর্বাধিক পরিচিত নিয়োগ করেন। মিঃ রিচার্ড নাথন ও মিঃ ডিঃ এম. ফ্রেজার যথাক্রমে কমিটির সভাপতি ও সেক্রেটারী নিযুক্ত হন। কমিটির অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে ছিলেনঃ

১. ডি. ডব্লিউ. ভোটান
২. ডঃ রামবিহারী ঘোষ
৩. নওয়াব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী, ধনবাড়ি, ময়মনসিংহ
৪. নওয়াব সিরাজুল ইসলাম উকিল, কলকাতা হাইকোর্ট
৫. বাবু অনন্দ চন্দ্র রায়, জমিদার, ঢাকা।
৬. শেখ মোহাম্মদ আলী
৭. মিঃ এম. আর ম্যাস
৮. ডব্লিউ. এ. জে. আর্চবলড, প্রিন্সিপাল, ঢাকা কলেজ
৯. মহামহোপাধ্যায় সতীস চন্দ্র আচার্য বিদ্যাভূষণ
১০.বাবু ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়, প্রিন্সিপ্যাল, জগন্নাথ কলেজ, ঢাকা
১১.সি. ডব্লিউ. ন্যাক, অধ্যাপক, প্রেসিডেন্সী কলেজ, কলকাতা
১২.জনাব শামসুল উলামা আবু নছর মোহাম্মদ ওয়াহেদ।

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্ট পেশঃ

নাথন কমিটি যথারীতি ২৪ অধ্যায় বিস্তৃত রিপোর্ট পেশ করে। ঐ রিপোর্টে প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়ের খুঁটিনাটি সবদিক সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়। রিপোর্টটিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাথমিকভাবে ইসলামী শিক্ষা, কলা, বিজ্ঞান, আইন, প্রকৌশল, চিকিৎসা ও শিক্ষক প্রশিক্ষণ বিভাগ খোলার সুপারিশ করা হয়। আরও সুপারিশ করা হয় যে প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হবে। একজন শিক্ষা পরিচালক স্বয়ং এর সরকারী পরিদর্শকের দায়িত্ব পালন করবেন। ন্যাথান কমিটির রিপোর্টে বিশ্ববিদ্যালয়ের ১ম বছরের জন্য ১২,৯৮,৯১৬ টাকা ব্যয় বরাদ্দের সুপারিশ করা হয়।

কমিটির সদস্য নবাব সিরাজ-উল-ইসলাম, নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী, শেখ মোহাম্মদ আলী ও জনাব আবু নছর মোহাম্মদ ওয়াহেদ রিপোর্টে মুসলমান ছাত্রদের বিনা বেতনে অধ্যয়ন ও বৃত্তির সুযোগ বৃদ্ধি করার জন্য সুপারিশ করেন এবং তারা প্রস্তাবিত বৃত্তি যে অপর্যাপ্ত সে কথাও উল্লেখ করেন। অন্যদিকে রামবিহারী ঘোষতার মন্তব্যে এ বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করেন। ১৯১৪ সালের আগস্ট মাসে বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। যুদ্ধের অজুহাতে সরকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিকল্পনা স্থগিত রাখে।

কিন্তু বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পরও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রস্তাব বাস্তবায়নে তেমন কোন কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। সরকারের অনাগ্রহ মুসলিম নেতৃবৃন্দের মনে সন্দেহের সৃষ্টি করে। নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী নেতৃত্বে তারা এ ব্যাপারে ক্রমাগত সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে থাকেন। তখন সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয় যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মত একটি ব্যয়বহুল প্রকল্প বাস্তবায়ন অনতিবিলম্বে সম্ভব নয়।

উত্তরে-শের-ই-বাংলা এ.কে. ফজলুল হক বঙ্গীয় আইন পরিষদে ৩ এপ্রিল ১৯১৬ তারিখে বলেন যে, যখন ব্যয় বহুলতার অজুহাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয় তখন কি করে নতুন হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠিত হতে পারলো? সেটা কি ব্যয়বহুল নয়? বস্তুতঃ ভারত সরকারকে অভিযুক্ত করে তিনি বঙ্গীয় আইন পরিষদে বলেন-" With a view to prevent a setback in the education all progress of eastern Bengal, we are promised a University at Dacca. Even since 1912 provions were being made in every budget for this proposed University, and each year we were told to live on the hope that the university would soon be an accomplished fact. We are now to that a costly project like a university at Dacca is out of the bounds of possibilities in the near

Dhaka University Institutional Repository

future. I can understand that a big scheme like this can not be developed in a day: but does it really take years and years for the scheme to matter and develop it only the will to carry the work through be not wanting?"

বাংলায় পূর্ববঙ্গে শিক্ষার অনগ্রসরতা দূরীকরণে ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের আশ্বাস আমাদের দেয়া হয়েছিল। ১৯১২ সাল থেকে প্রতি বছর বাজেটে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য বরাদ্দ রাখা হয় এবং প্রতি বছর আমাদের বলা হয় সেই আশায় অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের মত এত বিপুল ব্যয় বহুল প্রজেক্ট অদূর ভবিষ্যতে হাতে নেয়া সম্ভব নয়। আমি জানি এতবড় উন্নয়ন কার্যক্রম রাতারাতি করা সম্ভব নয়, কিন্তু তাই বলে বছরের পর বছর তো লাগার কথা নয়! বাস্তবায়নের ইচ্ছা থাকলে হয়।"

সেডলার কমিশন

এতদসত্বেও সরকারের মনোভাবের উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্তন দেখা যায়নি। পূর্ব বাংলার মুসলিম নেতৃবৃন্দের পরামর্শ অনুযায়ী কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক পরিষদের তৎকালীন সদস্য নওয়াব আলী চৌধুরী ১৯১৭ সালের মার্চ মাসে বিষয়টি পুনরায় পরিষদে উত্থাপন করেন এবং অনতিবিলম্বে 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রস্তাব' বাস্তবায়নের দাবী করেন। তখন ভারত সরকারের শিক্ষা বিভাগ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবিষ্যত উন্নয়ন সম্পর্কে সুপারিশ করার জন্য ডঃ নরেণ (স্যার) মাইকেল সেডলারকে সভাপতি করে যে কমিশন গঠন করেন, ঐ কমিশনের উপর প্রস্তাবিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকল্পনা ও গঠনতন্ত্র প্রণয়নের অতিরিক্ত দায়িত্ব অর্পণ করা হয় এবং ২৬ নভেম্বর তারিখে আশ্বাস প্রদান করা হয় যে সেডলার কমিশনের সুপারিশ পাওয়ার পরই 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রস্তাব' বাস্তবায়ন করা হবে।

'মক্কা' বিশ্ববিদ্যালয়

২৬ নভেম্বরের ঘোষণা হিন্দুদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার করে। তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে 'মক্কা' বিশ্ববিদ্যালয় বলে নিন্দাজ্ঞাপন করতে থাকেন। তাদের অভিমত ছিল এই যে, যেহেতু বাংলাদেশের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ মুসলমান সেহেতু এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রমে মুসলমানের এবং ইসলামী বিষয়াবলী প্রাধান্য লাভ করবে। তাদের অনেকেই মত প্রকাশ করেন

Dhaka University Institutional Repository

যে একান্তই যদি ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে হয় তাহলে সেটা হবে আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়। এমতাবস্থায় সেডলার কমিশন একটি প্রশ্নমালা তৈরি করে জনসাধারণের মতামত আহ্বান করেন। এ প্রশ্নমালার জবাব দিতে গিয়ে নওয়াব আবদুল লতিফের পুত্র ও এ.এম আবদুল আলী বলেন, "The juries diction of Dacca University should be extened asmuch aspossible." তিনি আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার তীব্র বিরোধিতা করে আরও বলেন যে, এধরনের কোন বিশ্ববিদ্যালয় এতদ্দেশীয় দরিদ্র মুসলিম জনসাধারণের জন্যে কোন ক্রমেই উপযুক্ত হতে পারে না কেননা আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় বিলাসবহুল ও ব্যয়বহুল হতে বাধ্য। এ ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমাজের নাগালের বাইরেই থেকে যাবে। সুতরাং "In my opinion, the Dacca University should be both residential as well as alhiliation university. All the Colleges of East Begal may even those of Assam may be allied alhiliation to the university. বাংলায়-'আমার মতে ঢাকা বিশ্বদ্যিালয় আবাসিক ও অনাবাসিক উভয়ই হবে। পূর্ব বাংলা আসামের সব কলেজ এর আওতাধীন হবে।'

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিল

সেডলার কমিশন তখন ঢাকায় আবাসিক ও অনাবাসিক উভয় ধরণের বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করেন। রিপোর্টে আরো বলা হয় যে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর থেকে চাপ কমানোর জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা অত্যাবশ্যক। এই রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে ১৯১৯ সালের ১১ সেপ্টেম্বর তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিল কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক পরিষদে পেশ করা হয়। ১৯২০ সালে পরিষদ কর্তৃক বিল অনুমোদিত হয়। ঢাকা কলেজ এবং স্বল্পকালের জন্যে গঠিত বাংলা আসাম প্রদেশের প্রাদেশিক সরকারের পরিত্যক্ত দালানসমূহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়। মিঃ ফিলিপ জে. হার্টস (নরে স্যার উপাধিপ্রাপ্ত) প্রথম ভাইস চ্যান্সেলর নিযুক্ত হন। তিনি ইতিপূর্বে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার হিসেবে ১৭ বছরকাল যোগ্যতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও তিনি সেডলার কমিশনের সদস্য ছিলেন। এরপরের বছর অর্থাৎ ১৯২১ সালের ১ জুলাই তারিখে ৮৭৭জন ছাত্র, ৬০ জন শিক্ষক, ৩টি অনুষদ ও ১২টি বিভাগ নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়।

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাতিষ্ঠানিক রুপ

১৯২১ সালের ১ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ৩টি অনুষদ, ১২টি বিভাগ, ৬০ জন শিক্ষক, ৮৪৭ জন শিক্ষার্থী ও ৩টি আবাসিক হল নিয়ে যাত্রা শুরু করে। ১৯৪৭ সালের পূর্ব পর্যন্ত বর্তমান বাংলাদেশে এটিই ছিল একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্বের সেরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অন্যতম। বর্তমানে ছাত্র-ছাত্রী প্রায় ৩১ হাজার, শিক্ষক সংখ্যা প্রায় ১ হাজার ৪শ', অনুষদ ১০টি, বিভাগ ৪৮টি, ইন্সটিটিউট ৯টি, গবেষণা কেন্দ্র ২৬টি। লাইব্রেরীতে বইয়ের সংখ্যা প্রায় ৬ লাখ। আর পান্ডুলিপি আছে ৩০ হাজার। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভি.সি. পি.জি. হার্টজ। বিগত ৮৪ বছরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যলয় থেকে ৩৭ জনকে অনারারি ডক্টরেট ডিগ্রি দেয়া হয়েছে। সর্বপ্রথম ১৯২২ সালে আর্ল অব রোনাল্ডকে ডক্টর অব ল' ডিগ্রি দেওয়া হয়। সর্বশেষ ডক্টর অব ল' ডিগ্রি পান মালয়েশিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী মাহাথির মোহাম্মদ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আন্দোলন শুরু হয় বিংশ শতাব্দীর শুরুতে। ১৯০৬ সালের ১ অক্টোবর আগা খানের নেতৃত্বে ভারতের ৩৪ জন মুসলিম নেতা সিমলায় বড়লাট লর্ড মিন্টোর সাথে সাক্ষাৎ করেন। তারা মুসলমানদের পক্ষ থেকে কতিপয় সুনির্দিষ্ট দাবি পেশ করেন। এতে ঢাকায় একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবিও ছিল। ১৯১১ সালের ১৯ আগস্ট কার্জন হলে ছোটলাট ল্যান্সলট হেয়ারের বিদায় ও চার্লস বেইলির আগমন উপলক্ষে সংবর্ধনা সভায় নবাব সলিমুল্লাহ ও নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী পৃথক ২টি মানপত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবি উত্থাপন করেন। ১৯১২ সালের ৩১ জানুয়ারি বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ ঢাকা সফরে আসেন। এ সময় নবাব সলিমুল্লাহ ও নওয়াব আলী চৌধুরীসহ ১৯ সদস্যের প্রতিনিধি দল লর্ড হার্ডিঞ্জের কাছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আবেদন করেন। তিনি এ ব্যাপারে আশ্বাস দেন। কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি স্যার আশুতোষ মুখার্জি, ড. রাসবিহারী ঘোষ, সিলেটের বিপিন পালসহ কতিপয় বুদ্ধিজীবি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। ১৯১২ সালের ২৮ মার্চ কলকাতার গড়ের মাঠে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে তারা প্রতিবাদ সভা ডাকেন। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৯১২ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি ড. রাসবিহারী ঘোষের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল ভাইসরয়ের সাথে সাক্ষাৎ করে বলেন, যেহেতু পূর্ব বাংলার অধিকাংশ অধিবাসী মুসলিম কৃষক, এই বিশ্ববিদ্যালয় তাদের কোন কাজে আসবে না। তারা প্রস্তাবিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে 'মক্কা বিশ্ববিদ্যালয়' বলে ব্যঙ্গ করেন। এই বিশ্ববিদ্যালয় যাতে প্রতিষ্ঠিত না হয়, সেজন্য ১৮ বার স্মারকলিপি পেশ করা হয়েছিল লর্ড হার্ডিঞ্জের কাছে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রবল প্রতিরোধ সত্ত্বেও ১৯১২ সালের ১২ এপ্রিল ভারত সরকার বঙ্গের প্রাদেশিক সরকারকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তাব পাঠানোর নির্দেশ দেয়। এরপর ২৭/১৩ সদস্য বিশিষ্ট ন্যাথান কমিটি গঠিত হয়। নওয়াব আলী চৌধুরী এর অন্যতম সদস্য ছিলেন। এর অধীনে ২৫টি সাব-কমিটি গঠিত হলে তিনি এগুলোর ৬টির সদস্য নিযুক্ত হয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এরপর ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে এবং ১৯১৫ সালে নবাব সলিমুল্লাহর ইন্তেকালে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কাজে অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। নওয়াব আলী চৌধুরী তখন ইমপেরিয়াল কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন। তিনি ১৯১৭ সালের ৭ মার্চ ইমপেরিয়াল কাউন্সিলে পুনরায় এ ব্যাপারে দাবি উত্থাপন করেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে ১৯২০ সালের ১৮ মার্চ ভারতীয় আইন সভায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যাক্ট পাস হয়। ২৩ মার্চ গভর্নর জেনারেল তা অনুমোদন করেন। ১৯২১ সালের ২১ জুলাই আনুষ্ঠানিকভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস শুরু হয়।

নওয়াব আলী চৌধুরী ছাত্র বৃত্তি বাবদ ১৬ হাজার টাকার তহবিল দান করেন। এছাড়া তাঁর জমিদারির একাংশ বন্ধক রেখে ৩৫ হাজার টাকা বিশ্ববিদ্যালয় ফান্ডে দান করেছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর তিনি মন্তব্য করেন, আপনাদের ও আমার সেই চিরাচরিত স্বপ্ন বাস্তবায়ন হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এর আইন প্রস্তুত হয়েছে, একথা মনে করেও আমি আত্মপ্রসাদ লাভ করছি। নবাব সলিমুল্লাহ ও নওয়াব আলী চৌধুরী ছাড়াও শেরে বাংলা একে ফজলুল হক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে উল্লেখ্যযোগ্য ভূমিকা রাখেন। অথচ প্রতিষ্ঠাতাদের নাম এর ইতিহাস থেকে মুছে ফেলার অপপ্রয়াস অব্যাহত রয়েছে। শিক্ষার্থীদের প্রকৃত ইতিহাস না জানানোর ফলে নতুন বংশধারা জাতিসত্তার মূলধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে। নবাব সলিমুল্লাহ ও একে ফজলুল হকের নামে হলের নাম করণ করা হয়েছে কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় যে কয়জন অক্লান্ত পরিশ্রম করেন তাদের মধ্যে বেশি ভূমিকা রাখেন নওয়াব আলী চৌধুরী কিন্তু তার নামে এখন পর্যন্ত ৮৪ বছর পরও কোন হলের নামকরণ পর্যন্ত করা হয়নি।

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকা বিশ্ববিদ্যলয়ের ইতিহাস ঃ অভিজ্ঞ জনের দৃষ্টিতে

প্রবীন নাট্য ব্যাক্তিত্ব ও বিশিষ্ট কলামিস্ট ওবায়দুল হক সরকার তাঁর নিজ অভিজ্ঞতা থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে বলেনঃ '১৯৫০ সালে আমি সলীমুল্লাহ্ মুসলিম হলের আবাসিক ছাত্র হয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হই। আমার বিষয় ছিল ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি। ২ ফেব্রুয়ারী ১৯৫১ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 'শহীদ নজির দিবস' পালন করে। তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এখনকার মত বড় ছিল না, অত বিষয়ও ছিল না, বর্তমান অবস্থানেও ছিল না। তখন কলা বিভাগ ছিল ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে জরুরী বিভাগে। দোতলা বিরাট একটা হল ঘরে বহু ছাত্র-ছাত্রী একত্র হয়ে শহীদ নজির দিবস পালন করলাম। বহু শিক্ষক বহু কথা বললেন। শহীদ নজিরের আত্মত্যাগে অবিভূত হলাম, অনুপ্রাণিতও হলাম। ১৯৫২ থেকে এই দিবসটি আর পালন করা হয়নি। বর্তমানে ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট শহীদ নজির একেবারেই অজানা।'

বাংলাদেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ জাতীয় অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসান শহীদ নজির সম্পর্কে দৈনিক ইনকিলাব, ২ ফেব্রুয়ারী ১৯৯২ সংখ্যায় লিখেছেনঃ 'সম্ভবতঃ এটা ছিল মেয়েদের হোস্টেলে অভিষেক অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানটি হয়েছিল সম্ভবতঃ লিটন হলে। বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন মুসলমান মেয়েদের সংখ্যা ছিল খুবই কম। আনুষ্ঠানিক কর্মে ও পরিচর্যায় যারা নিযুক্ত ছিল তারা সকলেই ছিল হিন্দু। গেট সাজানো থেকে আরম্ভ করে প্রবেশ পথ, সভাকক্ষ এবং মঞ্চ সাজানো সবই হিন্দু মেয়েরা করেছিল। তাদের আল্পনার মধ্যে স্বস্তিকার চিহ্ন ছিল। প্রবেশ পথের দু'পাশে মাটির হাঁড়ির উপর সিঁদুর চর্চিত নারকেল ছিল। মঞ্চটি হিন্দু দেবীর পূজার ঘরের মত সাজানো হয়েছিল। অনুষ্ঠান যখন আরম্ভ হবে তখন দুটি মুসলমান ছাত্রী প্রবেশ তোরণ এবং মঞ্চ দেখে হল থেকে প্রতিবাদ করে বেড়িয়ে আসে। এদের দুজনের একজন হলেন আছিয়া খাতুন আর একজন হচ্ছে নারায়ণগঞ্জের (নাম অজানা)। এই প্রতিবাদের ফলে বাইরে অবস্থানরত মুসলমান ছেলেরা অভিষেক অনুষ্ঠান ভণ্ডুল করে দেবার চেষ্টা করে। অভিষেক অনুষ্ঠান শেষ পর্যন্ত হতে পেরেছিল কিনা আজ আমার মনে নেই, কিন্তু প্রতিবাদ যে প্রবল এবং সুস্পষ্ট ছিল তা আমার মনে আছে। ঢাকার চতুর্দিকে এ খবর ছড়িয়ে যায় এবং মুসলমান ছাত্রদের মধ্যে একটি প্রবল প্রতিক্রিয়া ঘটে। রাতে বিভিন্ন হলে আলোচনা হতে থাকে যে, পরবর্তী পদক্ষেপ কি হতে পারে। নজির আহম্মদ সলীমুল্লাহ্ মুসলিম হলের ছাত্র ছিলেন। তিনি পরবর্তী ব্যবস্থার নেতৃত্ব দেবেন এটাই ঠিক হয়। ছাত্রদের বুদ্ধি পরামর্শ দেবার ক্ষেত্রে কবি জসিম উদ্দিনের সহযোগিতা স্মরণযোগ্য। সিদ্ধান্ত হয় যে পরের দিন মুসলমান ছেলেরা ক্লাসে যাবে এবং শান্তিপূর্ণভাবে সভা ও মিছিল করবে। আমরা ধারণাও করতে পারিনি যে,

Dhaka University Institutional Repository

হিন্দু ছেলেরাও বিকল্প ব্যবস্থা নিতে পারে। তবে শুনেছিলাম পরবর্তী পদক্ষেপ কি হবে তা নিয়ে আলোচনা করবার জন্য ইংরেজির অধ্যাপক পিকে গুহর বাসভবনে নেতৃস্থানীয় ক'জন হিন্দু ছাত্র মিলিত হয়েছিল। পি.কে গুহ আমার শিক্ষক ছিলেন। তার বাসভবনে যে সভা হয়েছিল তা আমি স্পষ্ট জানতাম না। আমি শুনেছিলাম কবি জীমউদ্দিনের কাছ থেকে। যাই হোক, দুর্ঘটনা এলো পরের দিন এবং এলো প্রচণ্ডভাবে। সভা এবং মিছিল শান্তিপূর্ণভাবে চলছিল। কিন্তু আকস্মাৎ হিন্দু ছেলেদের আক্রমণে সংঘর্ষ বাধে এতে নজির আহম্মেদ মারাত্মকভাবে আহত হন। তিনি ছুরিকাহত হন। প্রথম এই আঘাতটি কেউ গুরুতর ভাবেননি। অভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণে ক্রমশ নজির আহম্মদ দুর্বল হতে থাকেন এবং তখন মিটফোর্ড হাসপাতালে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয়। কবি জসীম উদ্দিন হাসপাতালে সর্বক্ষণ তাঁর শয্যাপাশে ছিলেন। সন্ধ্যার দিকে নজির আহম্মদ মারা যান। তাঁর মৃত্যুতে কবি জসীমউদ্দিনের হাহাকার ও আকুল কান্নাকে আমি কখনও ভুলবো না।"

জাতীয় অধ্যাপক সৈয়দ আলী আহসানের উপোরোক্ত বক্তব্য থেকে প্রমাণিত হয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষ্ঠানকে হিন্দু ধর্মীয় অনুষ্ঠানে রূপান্তরিত করার প্রবণতা থেকেই ছাত্রদের হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার সৃষ্টি। পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। বঙ্গভঙ্গ রদের পর বিক্ষুব্ধ মুসলমানদের শান্ত করার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। স্বভাবতই মুসলমান ছাত্রই বেশী ছিল। সাধারণতঃ সংখ্যাধিক্য সম্প্রদায়ের ভয়ে শঙ্কিত থাকে সংখ্যালঘুরা। কিন্তু এ ক্ষেত্রে ঘটলো তার উল্টোটা। মুসলমান ছাত্র নিহত হলো হিন্দু ছাত্রের হাতে, নজির আহম্মদ সাধারণ ছাত্র ছিলেন না।

বাংলাদেশের বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবি অধ্যাপক আবদুল গফুর দৈনিক ইনকিলাব ২ ফেব্রুয়ারী ১৯৯২ সংখ্যায় লিখেছেন-"শহীদ নজির একজন ছাত্র নেতা ছিলেন। কিন্তু ছাত্রনেতা বলতে আজকাল অনেক সময়ই যা বুঝায় তার বহু উর্ধ্বে ছিলেন। তিনি ছিলেন আদর্শের সৈনিক, তার সমগ্র জীবন ছিল মানবতার সেবায় নিবেদিত। ফেনী জেলার দক্ষিণ আলিপুর গ্রামের এক দরিদ্র পরিবারে ১৩২৪ সালের ৩ চৈত্র তারিখে জন্মগ্রহণ করে নজির। পিতার দারিদ্যের কারণে প্রাইমারী স্কুলের পাঠ্য থেকে নজিরকে নিজ চেষ্টায় পড়াশুনা চালাতে হয়। এই অবস্থায় ১৯৩৭ সালে নজির বৃত্তি নিয়ে ম্যাট্রিক পাস করেন। ১৯৩৯ সালে ফেনী কলেজ থেকে আইএ পাশের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। অল্পদিনের মধ্যেই নজির ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সমাজের অন্যতম কেন্দ্রীয় আকর্ষণে পরিণত হন। নজির দুস্থ মানবতার সেবায় তথা সাহিত্য সংস্কৃতি অঙ্গনের ক্রিয়াকর্মে তিনি নিজেকে উৎসর্গ করেন। ১৮৪৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সম্মেলনে হিন্দু ছাত্রদের বন্দে মাতরম গান গাওয়া নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় পরিবেশ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। টেনিস মাঠে দুপক্ষের মধ্যে ইট ছোড়াছুঁড়ি চলছিল। একদল হিন্দু ছেলে কাছে দাঁড়িয়ে

Dhaka University Institutional Repository

উৎসাহ দিচ্ছিল। ব্যাপারটি যাতে সহজে মিটমাট হয়ে যায় সে জন্য তিনি তাদের কাছে এগিয়ে গেলেন। নজিরের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল তারাও অন্তর থেকে অশান্তি চায় না। শান্তির প্রস্তাব ব্যর্থ হবে না। কিন্তু তা হলো না। অতর্কিতে তার পিঠে ছুরি বসিয়ে দেয়া হলো। ওঃ করে ওঠে নজির মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পর হাসপাতালে পাঠানো হলো। তার পর হাসপাতালে তাকে মৃত্যু ঘোষণা করা হয়। মাত্র একদিন পূর্বে ছাত্রদের এক সংঘর্ষে কিছু ছাত্র আহত হয়। আহত যারা হাসপাতালে ভর্তি হয় নজির তাদের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। কি হিন্দু কি মুসলমান সকল ছাত্রই তার সেবা পেয়েছিল। মানবতার এমন এক উৎসর্গীকৃত সেবককে এভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠায় প্রাণ দিতে হবে, এটা ছিল কল্পনার বাইরে।" হিন্দু ছাত্ররা ছিল বরাবরই হিংস্র। ধর্মনিরপেক্ষ ভারতেও তার কোন ব্যতিক্রম নেই।"

১৯৫০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইএ সার্টিফিকেট পেলাম। মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্টিফিকেট দেখে নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। দেখলাম সার্টিফিকেটের মনোগ্রামে হিন্দু ধর্মের ছাপ। আমার ম্যাট্রিক সার্টিফিকেট কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের। হিন্দু প্রধান পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত কলকাতায় হিন্দুদের আধিপত্য থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু মুসলিম প্রধান, পূর্ববঙ্গের ঢাকায় মুসলমানদের আধিপত্য থাকার কথা। বিশেষতঃ মুসলমানদের ঐতিহ্যের প্রাধান্য বিস্তার করে থাকবার কথা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্টিফিকেট পেয়ে মনটা একেবারে দমে গেল।

এই সময়ে মহামান্য আগা খান ঢাকায় এলেন। আগা খান সম্পর্কে বহু কথা শুনেছি। তাঁকে দেখার খুব ইচ্ছে ছিল। আমার এক বন্ধুর বদৌলতে সে সুযোগ পেয়ে গেলাম। যেই শুনলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, অমনি কাছে ডেকে নিলেন। পরদিন তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়ার কথা। কুশলাদি জিজ্ঞাসা করলেন। আমি সুযোগ বুঝে সার্টিফিকেটটা তাঁর হাতে দিয়ে মনোগ্রামটা দেখিয়ে বললাম, 'আমরা কি হিন্দুস্তানে না পাকিস্তানে আছি।' তাঁর হাসি মাখা মুখখানি লৌহকঠিন হয়ে গেল। এরপর যা ঘটল তা নিয়ে কলকাতার পত্র-পত্রিকা প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠলো। প্রসঙ্গতঃ কলকাতার দৈনিক যুগান্তর, কলকাতা। ২৭ মাঘ, ১৩৫৭, ১০ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫১ সংখ্যায় প্রকাশিত সংবাদটি তুলে ধরা হলো–

ঢাকা ফেব্রুয়ারী, মহামান্য আগা খাঁনের বক্তৃতার অংশবিশেষ সূত্র অবলম্বন করে স্থানীয় হিন্দু এবং বাঙ্গালী বিদ্বেষী ইংরেজি দৈনিক 'মর্নিং নিউজ' সাংবাদিক সততাকে কিভাবে পদলিত করছে, তাই দেখুন। মহামান্য আগা খাঁ নাকি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর উপাধি উপলক্ষে বক্তৃতা দান প্রসঙ্গে তিনবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে A Muslim University বলে গৌরববোধ করেন। অথচ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতীকে হিন্দু ধর্মের ছাপ রয়েছে। 'মর্নিং নিউজ'

Dhaka University Institutional Repository

সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশ করতে গিয়ে ন্যাক্কারজনক হিন্দু বিদ্বেষ প্রচার করেছেন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সপ্তাহে। মর্নিং নিউজে প্রকাশিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তথাকথিত হিন্দু সংস্কৃতি ও হিন্দু ধর্মের চিহ্নবাহী এই প্রতীকের ছবিও প্রকাশিত হয়েছে। মর্নিং নিউজ বলছেন, A Lotus, the Hindu symbol of learning. An Asoka Chakra (wheel) and of course to appease Muslims, a crescent. The crest first adopted in 1921, when the Dacca University was founded still continues to be emblem for the advancement of learning in the Muslim state of Pakistan.

স্বস্তিকা হিন্দু সংস্কৃতির প্রতীক। স্বস্তিকা মঙ্গল চিহ্ন। বিশ্বজয়ের কল্যাণ কামনায় দ্যোতক 'স্বস্তিকা'। যা হোক 'মর্নিং নিউজ' এর মতো মোহাজের এতিম বালকের হিন্দু বিদ্বেষ যেভাবে গগনস্পর্শী হতে চলেছে তাতে ওর কাছে 'সুবুদ্ধি' কেউ প্রত্যাশা করেন না।

একথা আজ সকলেই স্বীকার করবেন যে শিক্ষিত বাঙ্গালী মুসলমানদের মনে ক্রমে সুস্থ দেশত্ববোধ সঞ্চার হচ্ছে। হিন্দু বিদ্বেষ লোপ পেয়ে প্রবল হচ্ছে সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি সমষ্টির মানুষের সমস্যা বিচারের আগ্রহ। ঠিক এমনি মুহূর্তে 'মর্নিং নিউজ' এর মতো প্রতিক্রিয়াশীল কাগজ তার হিন্দু বিদ্বেষের ম্রীয়মান পুঁজি দিয়ে বাণিজ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠা লাভ করতে চাইলেও প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবে, শিক্ষিত মুসলমানদের অনেকে তা এক বাক্যে স্বীকার করেন।

মহামান্য আগা খাঁর বক্তৃতা ও তৎকালীন পত্র-পত্রিকায় তা নিয়ে হৈ চৈ-এর ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতীক থেকে হিন্দু ধর্মের স্থান মুছে ফেলে তার স্থলে ইসলাম ধর্মের স্থান তুলে ধরা হলো। 'স্বস্তিকা'র স্থলে এলো 'রাব্বি জিদনী ইলমা' সম্বলিত আল-কুরআনের প্রতীক। 'স্বস্তিকা'র স্থলে 'আল-কুরআনের' অবস্থান হিন্দুরা মেনে নিতে পারেনি। তাই বাংলাদেশ হবার সাথে সাথে 'আল-কুরআনের' প্রতীক সরিয়ে ফেলা হয়। আল-কুরআনের এত বড় অবমাননা একটি মুসলিম দেশে (বাংলাদেশের শতকরা ৯০ ভাগ মুসলমান) অবিশ্বাস্য হলেও সত্য। আজও বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রামে আল-কুরআনের হৃত মর্যাদা পুনরুদ্ধার হয়নি। বাংলাদেশের মুসলমান কি আদতেই মুসলমান! তাহলে বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রামে আল-কুরআনের মান নেই কেন?

Dhaka University Institutional Repository

গবেষকের অনুভূতিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

আজ, ১ জুলাই, ২০০৫ শুক্রবার। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮৪তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী। ১৯২১ সালের এই ১ জুলাই তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ৩টি অনুষদ, ১২টি বিভাগ, ৬০ জন শিক্ষক, ৮৪৭ জন শিক্ষার্থী ও ৩টি আবাসিক হল নিয়ে যাত্রা শুরু করে। ১৯৪৭ সালের পূর্ব পর্যন্ত বর্তমান বাংলাদেশে এটিই ছিল একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্বের সেরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অন্যতম। বর্তমানে ছাত্র-ছাত্রী প্রায় ২৫ হাজার, শিক্ষক সংখ্যা প্রায় ১ হাজার ৪শ', অনুষদ ১০টি, বিভাগ ৫১টি, ইন্সটিটিউট ৯টি, গবেষণা কেন্দ্র ২৬টি। লাইব্রেরীতে বইয়ের সংখ্যা প্রায় ৬ লাখ। আর পান্ডুলিপি আছে ৩০ হাজার। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভি.সি. পি.জি. হার্টজ। বিগত ৮৪ বছরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যলয় থেকে ৩৭ জনকে অনারারি ডক্টরেট ডিগ্রি দেয়া হয়েছে। সর্বপ্রথম ১৯২২ সালে আর্ল অব রোনাল্ডকে ডক্টর অব ল' ডিগ্রি দেওয়া হয়। সর্বশেষ ডক্টর অব ল' ডিগ্রি পান মালয়েশিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী মাহাথির মোহাম্মদ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আন্দোলন শুরু হয় বিংশ শতাব্দীর শুরুতে। ১৯০৬ সালের ১ অক্টোবর আগা খানের নেতৃত্বে ভারতের ৩৪ জন মুলিম নেতা সিমলায় বড়লাট লর্ড মিন্টোর সাথে সাক্ষাৎ করেন। তারা মুসলমানদের পক্ষ থেকে কতিপয় সুনির্দষ্ট দাবি পেশ করেন। এতে ঢাকায় একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবিও ছিল। ১৯১১ সালের ১৯ আগস্ট কার্জন হলে ছোটলাট ল্যান্সলট হেয়ারের বিদায় ও চার্লস বেইলির আগমন উপলক্ষে সংবর্ধনা সভায় নবাব সলিমুল্লাহ ও নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী পৃথক ২টি মানপত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবি উত্থাপন করেন। ১৯১২ সালের ৩১ জানুয়ারি বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ ঢাকা সফরে আসেন। এ সময় নবাব সলিমুল্লাহ ও নওয়াব আলী চৌধুরীসহ ১৯ সদস্যের প্রতিনিধি দল লর্ড হার্ডিঞ্জের কাছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আবেদন করেন। তিনি এ ব্যাপারে আশ্বাস দেন। কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি স্যার আশুতোষ মুখার্জি, ড. রাসবিহারী ঘোষ, সিলেটের বিপিন পালসহ কতিপয় বুদ্ধিজীবি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। ১৯১২ সালের ২৮ মার্চ কলকাতার গড়ের মাঠে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে তারা প্রতিবাদ সভা ডাকেন। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৯১২ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি ড. রাহবিহারী ঘোষের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল ভাইসরয়ের সাথে সাক্ষাৎ করে বলেন, যেহেতু পূর্ব বাংলার অধিকাংশ অধিবাসী মুসলিম কৃষক, এই বিশ্ববিদ্যালয় তাদের কোন কাজে আসবে না। তারা প্রস্তাবিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে 'মক্কা

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্ববিদ্যালয়' বলে ব্যঙ্গ করেন। এই বিশ্ববিদ্যালয় যাতে প্রতিষ্ঠিত না হয়, সেজন্য ১৮ বার স্মারকলিপি পেশ করা হয়েছিল লর্ড হার্ডিঞ্জের কাছে।

প্রবল প্রতিরোধ সত্ত্বেও ১৯১২ সালের ১২ এপ্রিল ভারত সরকার বঙ্গের প্রাদেশিক সরকারকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তাব পাঠানোর নির্দেশ দেয়। এরপর ২৭মে ১৩ সদস্য বিশিষ্ট ন্যাথান কমিটি গঠিত হয়। নওয়াব আলী চৌধুরী এর অন্যতম সদস্য ছিলেন। এর অধীনে ২৫টি সাব-কমিটি গঠিত হলে তিনি এগুলোর ৬টির সদস্য নিযুক্ত হয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এরপর ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে এবং ১৯১৫ সালে নবাব সলিমুল্লাহর ইন্তেকালে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কাজে অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। নওয়াব আলী চৌধুরী তখন ইমপেরিয়াল কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন। তিনি ১৯১৭ সালের ৭ মার্চ ইমপেরিয়াল কাউন্সিলে পুনরায় এ ব্যাপারে দাবি উত্থাপন করেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে ১৯২০ সালের ১৮ মার্চ ভারতীয় আইন সভায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যাক্ট পাস হয়। ২৩ মার্চ গভর্নর জেনারেল তা অনুমোদন করেন। ১৯২১ সালের ২১ জুলাই আনুষ্ঠানিকভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস শুরু হয়।

নওয়াব আলী চৌধুরী ছাত্র বৃত্তি বাবদ ১৬ হাজার টাকার তহবিল দান করেন। এছাড়া তাঁর জমিদারির একাংশ বন্ধক রেখে ৩৫ হাজার টাকা বিশ্ববিদ্যালয় ফান্ডে দান করেছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর তিনি মন্তব্য করেন, আপনাদের ও আমার সেই চিরাচোরিত স্বপ্ন বাস্তবায়ন হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এর আইন প্রস্তুত হয়েছে, একথা মনে করেও আমি আত্মপ্রসাদ লাভ করছি। নবাব সলিমুল্লাহ ও নওয়াব আলী চৌধুরী ছাড়াও শেরে বাংলা একে ফজলুল হক ও জমিদার ওয়াজেদ আলী খান পন্নীও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে উল্লেখ্যযোগ্য ভুমিকা রাখেন। অথচ প্রতিষ্ঠাতাদের নাম এর ইতিহাস থেকে মুছে ফেলার অপপ্রয়াস অব্যাহত রয়েছে। শিক্ষার্থীদের প্রকৃত ইতিহাস না জানানোর ফলে নতুন বংশধারা জাতিসত্তার মূলধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে।

Dhaka University Institutional Repository

একনজরে বর্তমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

অবস্থান	:	রমনা, ঢাকা-১০০০
প্রতিষ্ঠাকাল	:	১ জুলাই ১৯২১
প্রথম ভিসি	:	স্যার পি. জে. হার্টস
প্রথম মুসলিম ভিসি	:	স্যার এ.এফ. রহমান
বর্তমান চ্যান্সেলর	:	অধ্যাপক ড. ইয়াজ উদ্দিন আহমেদ রাষ্ট্রপতি,গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভাইস চ্যান্সেলর	:	অধ্যাপক এস. এম. এ ফায়েজ
প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর	:	অধ্যাপক আ.ফ.ম ইফসুফ হায়দার
রেজিস্ট্রার	:	মোঃ আনোয়ার হোসেন (ভারপ্রাপ্ত)
মোট শিক্ষক-শিক্ষিকা	:	প্রায় ১,৪০০
ছাত্র-ছাত্রী	:	প্রায় ৩১,০০০
হল	:	১৮টি (ছাত্রদের ১৩টি, ছাত্রীদের ৫টি)
হোস্টেল	:	২টি
অনুষদ	:	৭টি
ইনস্টিটিউট	:	৯টি
বিভাগ	:	৫১টি
উপাদানকল্প ও অধিভূক্ত কলেজ	:	৩১টি
প্রদত্ত এমফিল ডিগ্রী	:	৫৩৭
প্রদত্ত পিএইচডি ডিগ্রী	:	৭২১
প্রকাশিত গ্রন্থ	:	১৪৪
গ্রন্থাগারে পুস্তক সংখ্যা	:	৬ লক্ষাধিক
ক্যাম্পাসের মোট আয়তন	:	২৫৬ একর
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদের নাম	:	ডাকসু

Dhaka University Institutional Repository

সংক্ষেপে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস

১৯১২ সালের ৩১ জানুয়ারী ভাইসরয় লর্ড হার্ডিঞ্জ ঢাকায় এলে ঢাকার নবাব স্যার সলীমুল্লাহ, নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী, শের-এ বাংলা এ.কে ফজলুল হক পূর্ববঙ্গের মুসলমাদের উচ্চশিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির জন্য ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবী জানান। ১৯১২ সালের ২ ফেব্রুয়ারী ভাইসরয় ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ঘোষনা দেন। একই বছরে ২৭ মে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যারিস্টার রবার্ট ন্যাথানকে সভাপতি করে একটি কমিটি গঠিত হয়। ১৯১৩ সালে ন্যাথান কমিটি ইতিবাচক সুপারিশ পেশ করে। পরবর্তীতে বড়লাট চেমসফিল্ড ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কর্মসূচী নির্ধারণের জন্য ১৯১৭ সালের ৬ জানুয়ারী লিডস বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সলর ড. এম.ই. স্যাডলারের নেতৃত্বে কলিকাতা

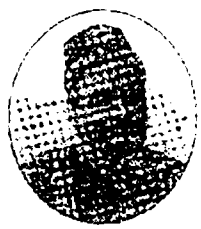

স্যার সলিমুল্লাহ

নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী

এ কে ফজলুল হক

কমিশন গঠন করেন। এই কমিটির সুপারিশের একটি ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হবে স্বায়ত্বশাসিত একটি প্রতিষ্ঠান। কমিটির সুপারিশটি ১৯২০ সালের ১২ ফেব্রুয়ারী ভারতীয় আইন সভায় উপস্থাপনের প্রেক্ষিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিলটি সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানোর সিদ্ধান্ত হয়। ১৮ মার্চ বিলটি সর্বসম্মতিক্রমে এ্যাক্ট-এ পরিণত হয়।

১৯২১ সালের ১ জুলাই আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম শুরু হয়। তৎকালীন ঢাকার সবচেয়ে অভিজাত এলাকা রমনা সিভিল লাইন ৬০০ একর জমি আর ভেতরের শতাধিক মনোরম ভবন নিয়ে চালু হয় বিশ্ববিদ্যালয়। প্রাথমিক অবকাঠামোর বড় অংশটি গঠিত হয়েছিলো তৎকালীন ঢাকা কলেজের শিক্ষকমন্ডলী আর কলেজ ভবনের (বর্তমান কার্জন হল) ভিত্তিতে। এতে ছিলো ৩টি অনুষদ (কলা, বিজ্ঞান ও আইন), ১২ টি বিভাগ (ইংরেজি, দর্শন, সংস্কৃত, আরবী, ফার্সী ও উর্দু, ইসলামি শিক্ষা, ইতহাস, অর্থনীতি ও রাজনীতি, গণিত, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, আইন এবং শিক্ষক), ৬০ জন শিক্ষক, ৮৭৭ জন ছাত্র-ছাত্রী আর ৩টি আবাসিক হল (সলিমুল্লাহ মুসলিম হল, জগন্নাথ হল এবং ঢাকা হল বা আজকের শহীদুল্লাহ হল) বর্তমানের ঢাকা মেডিকেল কলেজটি ছিল তৎকালীন কলাভবন।

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য ছিলেন পি.জে হার্টজ, যিনি লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৭ বছর একডেমিক রেজিষ্ট্রার ছিলেন। ১৯২১-৪৭ সময়কাল উল্লেখযোগ্য শিক্ষকদের মধ্যে ছিলেন মহামহোপধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, এফ.সি.টার্নার, জি.এইচ, এ.এফ. রহমান, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, ফিদা আলী খান, পদার্থবিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসু, ইতিহাসবিদ রমেশচন্দ্র মজুমদার, ড. মহাম্মদ শহীদুল্লাহ প্রমূখ। ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ সময়ের খ্যাতিমান শিক্ষকের মধ্যে এম,এ.হাই, মুনির চৌধুরী, জ্যোতির্ময় গুহ ঠাকুরতা, সিরাজুল হক, জি. ডস দেব, জে.সি.ঘোষ, এ.বি.এম. হাবিবুল্লাহ, মোকাররম হোসেন খন্দকার, কাজী মোতাহার হোসেন, এ.কে. নাজমুল করিম প্রমূখ। ১৯৭১ পরবর্তী সময়ে কৃতি ও গুণী শিক্ষকের মধ্যে কবীর চৌধুরী, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, সালাহউদ্দিন আহমদ, মোঃ মনিরুজ্জামান, আনিসুজ্জামান, মোঃ আমিনুল ইসলাম, মোঃ হাবিবুল্লাহ, আবদুল্লাহ ফারুক, কাজী যাকের হোসেন, এ.কে.এম নূরুল ইসলাম, কি.এ.আই.এম নুরুদ্দীন আহমদ প্রমূখ। এখনো বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় রয়ে গেছে সেকালের বহু নিদর্শন তার মধ্যে টি.এস.সির ভেতরের ঢাকার একমাত্র গ্রীক নিদর্শন আর পুরনো মন্দিরের চূড়া, পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান ইনস্টিটিউটের উল্টোদিকে মোগল যুগের তিন গম্বুজ বিশিষ্ট শাহবাজ খাঁ মসজিদ, ডাকসু ভবনের সামনে নবাবের বাগান বাড়ি খ্যাত মধুর বিরল গাছ ক্যাম্পাসের শোভাবৃদ্ধি করেছে।

প্রথম রেজিষ্ট্রার (১৯২১-১৯৪৪) ছিলেন খান বাহাদুর নাজিরউদ্দিন আহমেদ। শিক্ষক সমিতির প্রথম সম্পাদক ছিলেন এস.ডি.আয়ার। ছাত্র সংসদের প্রথম সভাপতি ও সম্পাদক (১৯২৪-২৫) ছিলেন অধ্যাপক ডাব্লিউ এ. জেনকিনস এবং জনাব যোগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত)

পরবর্তীকালে এই ছাত্র সংসদ তথা ডাকসু থেকে বেরিয়ে এসেছেন বহু দেশবরেণ্য নেতা। ১৯২৫ সালে এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম পিএইচ.ডি অর্জন করে বিনয় ঘোষ। বিভিন্ন সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সফর করেছেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল থকে শুরু করে মেঘনাদ সাহা, আবদুস সালাম আর অর্মত্যসেনের মতো বহু মনীষী যাদের বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ভূষিত করেছে সম্মানসূচক পিএইচ.ডি. ডি.লিট ডিগ্রি দিয়ে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গঠিত হয়েছিল অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের আদলে। প্রাচ্যের অক্সফোর্ড খ্যাত এই বিশ্ববিদ্যালয়েই বোস আইনস্টাইন তত্ত্বের জন্ম দিয়েছেন সত্যেন বসু। ক্যাম্পাসে রয়েছে বেশ কয়েকটি জ্ঞাত/অজ্ঞাত মাজার। আছে তিন নেতার শের-ই-বাংলা ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও খাজা নাজিমুদ্দিনের মাজার। ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটার পর ১৯৪৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের প্রতিবাদ জানানোর মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে ভাষা আন্দোলন শুরু হয়েছিল। ১৯৫২ সাল কলাভবনের (বর্তমান ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল) সামনে পুলিশের গুলিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র জনতা শহীদ হওয়ায় সে আন্দোলনই চূড়ান্ত রূপ ধারণ করেছিলো। ১৯৬৯-এ আসাদুজ্জামান শহীদ হবার ফলে ১১ দফার আন্দোলন চূড়ান্ত পরিনতির দিকে এগিয়ে যায়।

Dhaka University Institutional Repository

ছাত্র নেতারাই ১৯৭১ এ কলাভবনে প্রথম উড়িয়েছিলেন স্বাধীন বাংলার পতাকা। সে বছরের ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানী সেনাবাহিনী সবার আগে বিশ্ববিদ্যালয়েই হামলা চালিয়েছিলো। ৯ মাস যুদ্ধের পর আত্মসমর্পণের ঠিক আগে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক তথা বুদ্ধিজীবি নিধনের ঘৃন্যকাজে লিপ্ত হয় পাকিস্তানী সেনারা। শহীদ হয়েছিলেন বহু শিক্ষক, ছাত্র ও কর্মচারী।

দেশের সর্বপ্রাচীন, সর্ববৃহৎ আর আন্তর্জাতিক ভাবে পরিচিত এই বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে রয়েছে ১০ টি অনুষদ আর ৫০টি বিভাগ, আছে ১০টি ইনস্টিটিউট এবং উচ্চতর গবেষনার জন্য ৩১ টি গবেষনা কেন্দ্র। বর্তমানে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা প্রায় ৩১ হাজার জন, শিক্ষক সংখ্যা ১৩১৯, কর্মকর্তা ৪৭৪ জন এবং কর্মচারী ৩১৬৮ জন। এছাড়াও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০২ টি ট্রাস্ট ফান্ড রয়েছে।

বিশ্ববিদালয় প্রতিষ্ঠার পর ১৯২৫ সাল থেকে ২০/১২/০৫ তারিখ পর্যন্ত পিএইচ-ডি ডিগ্রী অর্জন করেছেন ৭২১ জন এবং এম.ফিল ডিগ্রীধারীর সংখ্যা ৫৩৭ জন।

বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয় (১) মূল ক্যাম্পাস (কলাভবন, কার্জন হল ভবন) (২) সমাজকল্যাণ ইনস্টিটিউট মৈত্রী হল, বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হল ক্যাম্পাস, (৩) আই.বি.এ হোস্টেল ক্যাম্পাস, এবং (৪) আজিমপুর কোয়াটার্স ক্যাম্পাস। এছাড়াও ক্যাম্পাসে রয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মেডিকেল সেন্টার,

নিজস্ব পানির পাম্প স্টেশন, ৩টি সরকারী ব্যাংকের বিশ্ববিদ্যালয় শাখা (প্রশাসনিক ভবনে সোনালী ব্যাংক, টি.এস.সিতে জনতা ব্যাংক ও কার্জন হলে অগ্রণী ব্যাংক)। পাশেই রয়েছে বিদ্যুতের স্থানীয় স্টেশন।[১০]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর থেকে ব্যবহৃত লগোর ক্রমবিকাশ

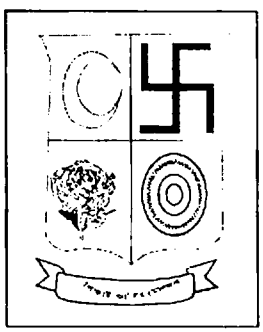

১৯২১-১৯৫২

১৯৫২-১৯৭২

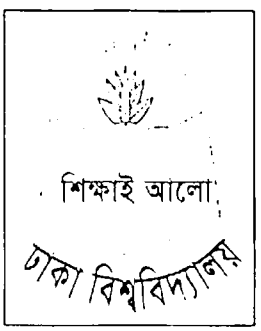

১৯৭২-১৯৭৩

১৯৭৩ থেকে চলছে

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান চার পুরোধা

অধ্যাপক ড. ইয়াজউদ্দিন আহমেদ

এম.এস.সি: এম.এস (উইসকর্নাসিন) পিএইডি (উইসকর্নাসিন) যুক্তরাষ্ট্র

রাষ্ট্রপতি, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

চ্যান্সেলর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

অধ্যাপক এস.এম.এ ফায়েজ

এম.এ, পিএইচ.ডি (এবার্রডিন)

উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

অধ্যাপক আ.ফ.ম ইউসুফ হায়দার

এম.এসসি, পিএইচডি (অস্ট্রেলিয়া)

প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

অধ্যাপক সৈয়দ রাশিদুল হাসান

এম.কম, পিএইচ.ডি (এগেন্স)

কোষাধ্যক্ষ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর থেকে সম্মানসূচক ডিগ্রীপ্রাপ্তদের তালিকা [১১]

বৎসর	নাম	ডিগ্রী
১৯২২	দি রাইট অনারেবল দি আর্ল অব রোনাল্ডসে জি সি আই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম চ্যান্সেলর	ডক্টর অব লজ
১৯২৫	ফিলিপ জোসেফ হার্টস বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভাইস-চ্যান্সেলর	ডক্টর অব লজ
১৯২৭	দি রাইট অনারেবল দি আর্ল অব লিটন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব চ্যান্সেলর	ডক্টর অব লজ
১৯২৭	মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি আই সি সংস্কৃতি ও বাংলা বিভাগের প্রথম অধ্যক্ষ	ডক্টর অব লিটারেচার
১৯৩২	দি রাইট অনারেবল স্যার ফ্যান্সিস স্ট্যানলি জ্যাকসন পি সি, জি সি এস আই, জিসি আই ই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব চ্যান্সেলর	ডক্টর অব লজ
১৯৩২	স্যার চন্দ্রশেখর ভেনকট রমন কেট-টি এম, এ, পিএইচ ডি, ডি এস-সি এল ডি, এফ আর এস, এন এল	ডক্টর অব সায়েন্স
১৯৩৬	দি রাইট অনারেবল স্যার জন এন্ডারসন পি সি, জি সি এস আই, জিসি আই ই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব চ্যান্সেলর	ডক্টর অব লজ
১৯৩৬	স্যার আবদুর রহিম কে সি এস আই কে-টি	ডক্টর অব লজ

Dhaka University Institutional Repository

১৯৩৬	**স্যার জগদীশচন্দ্র বসু** কে-টি, সি আই ই সি এস আই, এমএ, ডি এসসি, এফ আর এস	ডক্টর অব সায়েন্স
১৯৩৬	**স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায়** কে-টি, সি আই ই ডি এস-সি, পিএইচ ডি, এফ সি এফএএসবি	ডক্টর অব সায়েন্স
১৯৩৬	**স্যার যদুনাথ সরকার** কেসি আই ই, এম এ, ইতিহাসবিদ	ডক্টর অব লিটারেচার
১৯৩৬	**স্যার মুহম্মদ ইকবাল** কেটি, এম এ, পিএইচ ডি, বার এট ল.	ডক্টর অব লিটারেচার
১৯৩৬	**স্যার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর** কেটি, ডি লিট, এন এল নোবেল বিজয়ী (সাহিত্য)	ডক্টর অব লিটারেচার
১৯৩৬	**শরৎচন্দ্র চট্টপাধ্যায়** বাংলা সাহিত্যের সুবিখ্যাত কথাসাহিত্যিক	ডক্টর অব লিটারেচার
১৯৩৭	**স্যার এ এফ রহমান** বি এ (অক্সন)	ডক্টর অব লজ
১৯৪৯	**হিজ এক্সেলেন্সি খাজা নাজিমুদ্দিন** পাকিস্তানের ভূতপূর্ব গভর্ণর জেনারেল	ডক্টর অব লজ
১৯৫১	**হিজ রয়েল হাইনেস দি রাইট অনারেবল** **আগা সুলতান স্যার মোহাম্মদ শাহ আগা খান** পি সি, কে সি, আই ই, জি মি এস আই জি সি আই ই, জি. সি ভি ও, এল-এল ডি	ডক্টর অব লজ
১৯৫২	**হিজ এক্সেলেন্সি ড. আবদুল ওয়াহাব আজম** এম এ (লন্ডন), ডি লিট (ফুয়াদ)	ডক্টর অব লজ

Dhaka University Institutional Repository

১৯৫৬	হিজ এক্সেলেন্সি মেজর জেনারেল ইস্কান্দার মির্জা পাকিস্তানের ভূতপূর্ব গভর্ণর জেনারেল	ডক্টর অব লজ
১৯৫৬	এ কে ফজলুল হক এম, এ বি এল তৎকালীন চ্যান্সেলর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	ডক্টর অব লজ
১৯৫৬	মাদাম সুং চিং লিং	ডক্টর অব লজ
১৯৬০	ফিল্ড মার্শাল মুহম্মদ আইয়ুব খান এইচ পি এইচ জে পাকিস্তানের ভূতপূর্ব পেসিডেন্ট	ডক্টর অব লজ
১৯৬০	হিজ এক্সেলেন্সি জামাল আবদেল নাসের	ডক্টর অব লজ
১৯৬৫	হিজ এক্সেলেন্সি চৌ এন লাই গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের প্রধানমন্ত্রী	ডক্টর অব লজ
১৯৭৪	প্রফেসর সত্যেন্দ্রনাথ বসু	ডক্টর অব সায়েন্স (মরণোত্তর)
১৯৭৪	ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ	ডক্টর অব লিটারেচার (মরণোত্তর)
১৯৭৪	কবি কাজী নজরুল ইসলাম	ডক্টর অব লিটারেচার
১৯৭৪	ওস্তাদ আলী আকবর খান	ডক্টর অব লিটারেচার
১৯৭৪	ডক্টর হীরেন্দ্রলাল দে	ডক্টর অব সায়েন্স
১৯৭৪	ডক্টর মুহম্মদ কুদরাত-ই-খুদা	ডক্টর অব সায়েন্স
১৯৭৪	ডক্টর কাজী মোতাহার হোসেন	ডক্টর অব সায়েন্স
১৯৭৪	প্রফেসর আবুল ফজল	ডক্টর অব লিটারেচার
১৯৯৩	প্রফেসর আবদুল সালাম নোবেল বিজয়ী (পদার্থবিজ্ঞান)	ডক্টর অব সায়েন্স

Dhaka University Institutional Repository

১৯৯৭	**ড. ফেরদেরিকো মাইয়র** মহাপরিচালক, ইউনেস্কো	ডক্টর অব সায়েন্স
১৯৯৯	**শেখ হাসিনা** সাবেক প্রধানমন্ত্রী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার	ডক্টর অব লজ
১৯৯৯	**প্রফেসর অমর্ত্য সেন** নোবেল বিজয়ী (অর্থনীতি)	ডক্টর অব সায়েন্স
২০০৫	**মাহাথির মোহাম্মদ** মালয়েশিয়ার সাবেক প্রেসিডেন্ট	ডক্টর অব লজ

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষদ ও অনুষদভূক্ত বিভাগসমূহ এবং প্রতিষ্ঠার সন [১২]

(ক) কলা অনুষদ (১৯২৯)

১. বাংলা বিভাগ (১৯২৯)
২. ইংরেজী বিভাগ (১৯২১)
৩. আরবী বিভাগ (১৯২১)
৪. উর্দু ও ফার্সী বিভাগ (১৯২১)
৫. সংস্কৃতি ও পালি বিভাগ (১৯২১)
৬. ইতিহাস বিভাগ (১৯২১)
৭. দর্শন বিভাগ (১৯২১)
৮. ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ (১৯২১/১৯৮০)
৯. ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ (১৯৪৮)
১০.তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থপনা বিভাগ (১৯৫৯)
১১.নাট্যকলা ও সঙ্গীত বিভাগ (১৯৮৯)
১২.ভাষাতত্ত্ব বিভাগ (১৯৮০/১৯৯২)
১৩.বিশ্ব ধর্মতত্ত্ব বিভাগ (১৯৯৯)

(খ) সামাজিক অনুষদ (১৯৭০)

১. অর্থনীতি বিভাগ (১৯২১)
২. রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ (১৯২১/১৯৩৮)
৩. আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ (১৯৪৭)
৪. সমাজবিজ্ঞান বিভাগ (১৯৫৭)
৫. গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ (১৯৬২)
৬. লোক প্রশাসন বিভাগ (১৯৭২)
৭. নৃবিজ্ঞান বিভাগ (১৯৯৩)
৮. পপুলেশন সায়েন্সেস বিভাগ (১৯৯৮)
৯. শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়ন বিভাগ (১৯৯৯)
১০.উইমেন্স স্টাডিজ বিভাগ (১৯৯৯)
১১.ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ বিভাগ (২০০২)

Dhaka University Institutional Repository

(গ) আইন অনুষদ (১৯২১)

১. আইন বিভাগ (১৯২১)

(ঘ) বিজ্ঞান অনুষদ (১৯২১)

১. পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ (১৯২১)
২. গণিত বিভাগ (১৯২১)
৩. রসায়ন বিভাগ (১৯২১)
৪. পরিসংখ্যান বিভাগ (১৯৩৯/১৯৫০)
৫. ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ (১৯৪৮)
৬. ভূতত্ত্ব বিভাগ (১৯৪৯)
৭. ফলিত পদার্থ বিজ্ঞান ও ইলেকট্রনিক্স বিভাগ (১৯৬৫)
৮. ফলিত রসায়ন ও রাসায়নিক প্রযুক্তি বিভাগ (১৯৭২)
৯. কম্পিউটার সাইন্স এণ্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ (১৯৯২)

(ঙ) জীববিজ্ঞান অনুষদ (১৯৭৪)

১. উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগ (১৯৩৯/১৯৫৪)
২. প্রাণিবিদ্যা বিভাগ (১৯৩৯/১৯৫৪)
৩. মৃত্তিকা, পানি ও পরিবেশ বিভাগ (১৯৪৯)
৪. প্রাণ রসায়ন বিজ্ঞান বিভাগ (১৯৫৭/২০০০)
৫. মনোবিজ্ঞান বিভাগ (১৯৬৫
৬. অনুজীব বিজ্ঞান বিভাগ (১৯৭৯)
৭. মৎস্যবিজ্ঞান বিভাগ (১৯৯৭)
৮. ক্লিনিক্যাল সাইক্লোজী বিভাগ (১৯৯৭)
৯. জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এণ্ড বায়োটেকনোলজি বিভাগ (২০০০)

(চ) বিজনেস স্টাডিজ অনুষদ ঃ ১৯৭০)

১. ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ বিভাগ (১৯৭০/২০০১)
২. একাউন্টিং এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস্ বিভাগ (১৯৭০)
৩. মার্কেটিং বিভাগ (১৯৭৪)
৪. ফিন্যান্স এন্ড ব্যাংকিং বিভাগ (১৯৭৪)
৫. ব্যাংকিং বিভাগ (২০০৪)
৬. ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেমস বিভাগ (২০০৫)

(ছ) ফার্মেসী অনুষদ (১৯৬৫)

১. ফার্মাসিউটিক্যাল কেমিস্ট্রি বিভাগ (২০০৩)
২. ওষুধ প্রযুক্তি বিভাগ (২০০৩)
৩. ক্লিনিক্যাল ফার্মেসী এণ্ড ফার্মাকোলজী বিভাগ (২০০৩)

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ইনস্টিটিউটসমূহ ও প্রতিষ্ঠার সন

১. শিক্ষা ও গবেষনা ইনস্টিটিউট (১৯৬০)

ক. ইউনিভার্সিটি ল্যাবরেটরি স্কুল ও কলেজ (ইউ.ই.আর)

২. পরিসংখ্যান গবেষনা ও শিক্ষন ইনস্টিটিউট (১৯৬৪)

৩. ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউট (১৯৬৬)

৪. পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট (১৯৬৯)

৫. সমাজকল্যান ও গবেষনা ইনস্টিটিউট (১৯৭৩)

৬. আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট (১৯৮৪)

৭. চারুকলা ইনস্টিটিউট (১৯৮৪)

৮. স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইনস্টিটিউট (১৯৯৮)

৯. তথ্য প্রযুক্তি ইনস্টিটিউট (২০০১)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন গবেষনা কেন্দ্র ও ব্যুরো এবং প্রতিষ্ঠার সন

১. অর্থনৈতিক গবেষণা ব্যুরো (১৯৭৪)

২. ব্যবসায় গবেষণা ব্যুরো (১৯৭৪)

৩. বোস সেন্টার ফর এ্যাডভান্স স্টাডি এন্ড রিসার্চ ইন ন্যাচারাল সায়েন্সস (১৯৭৪)

৪. সেন্টার ফর এ্যাডভান্স স্টাডিজ এন্ড রিসার্চ ইন বায়োঃ সায়েন্স (১৯৭৫)

৫. গোবিন্দদেব দর্শন গবেষনা কেন্দ্র (১৯৮০)

৬. নবায়নযোগ্য শক্তি গবেষনা কেন্দ্র (১৯৮৪)

৭. উচ্চতর মানববিদ্যা গবেষণা কেন্দ্র (১৯৮৪)

৮. সেমিকন্ডাক্টার টেকনোলজি রিসার্চ সেন্টার (১৯৮৫)

৯. বায়োটেকনোলজি গবেষনা কেন্দ্র (১৯৮৫)

১০. নজরুল গবেষণা কেন্দ্র (১৯৮৮)

১১. দুর্যোগ গবেষণা, প্রশিক্ষন ও ব্যবস্থপনা কেন্দ্র (১৯৮৯)

১২. ব-দ্বীপ গবেষণা কেন্দ্র (১৯৯১)

১৩. ড. সিরাজুল হক ইসলামী গবেষনা কেন্দ্র (২০০২)

১৪. আরকাইভ ও ইতিহাস গবেষনা কেন্দ্র

১৫. নাজমুল করিম স্টাডি সেন্টার

১৬. সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট এ্যান্ড পলিসি রিসার্চ

১৭. বায়োমেডিক্যাল রিসার্চ সেন্টার

Dhaka University Institutional Repository

১৮. সেন্টার ফরএডভান্স রিসার্চ এণ্ড ডেভেলপমেন্ট ইন সায়েন্স এণ্ড টেকনোলজী

১৯. বাংলাদেশ সংস্কৃতি-গবেষনা কেন্দ্র

২০. ড. সিরাজুল হক ইসলামী গবেষনা কেন্দ্র

২১. জাপান স্টাডি সেন্টার

২২. সেন্টার ফর এডুকেশন রিসার্স এণ্ড ট্রেনিং

২৩. সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট এণ্ড ইন্সটিটিউশনাল স্টাডিজ

২৪. উচ্চতর মানবিক ও সামাজিক বিজ্ঞান গবেষনা কেন্দ্র

২৫. কলা ভবন কম্পিউটার সেন্টার

২৬. ঢাকা বিশ্ববিশ্ববিদ্যালয় সাইবার

২৭. বাংলাদেশ অষ্ট্রেলিয়া সেন্টার ফর ইনভারমেন্টাল রিসার্স

২৮. আরবান রিসার্স সেন্টার

২৯. সেন্টার ফর এডভান্স রিসার্স ইন ফিজিক্যাল, কেমিক্যাল, বাইওলজিক্যাল এণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল সাইন্স

৩০. ল্যাংগুয়েজ টিচিং সেন্টার

৩১. রিসার্স সেন্টার ফর লিবারেশন ওয়ার

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন আবসিক হল ও প্রতিষ্ঠার সন

১. সলিমুল্লাহ মুসলিম হল (১৯২১)
২. শহীদুল্লাহ হল (১৯২১)
৩. জগন্নাথ হল (১৯২১)
৪. ফজলুল হক মুসলিম হল (১৯৪০)
৫. জহুরুল হক হল (১৯৫৭)
৬. রোকেয়া হল (১৯৫৬/১৯৬৩)
৭. সূর্যসেন হল (১৯৬৬)
৮. হাজী মুহম্মদ মুহসীন হল (১৯৬৭)
৯. শামসুন নাহার হল (১৯৬৭)
১০. কবি জসিম উদ্দিন হল (১৯৭৬)
১১. এ এফ রহমান হল (১৯৭৭)
১২. মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান হল (১৯৮৮)
১৩. বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমান হল (১৯৮৮)
১৪. বাংলাদেশ-কুয়েত মৈত্রী হল (১৯৮৯)
১৫. ইন্টারন্যাশনাল হল (১৯৬৬/২০০২)
১৬. বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হল (২০০১)
১৭. অমর একুশে হল (২০০১)
১৮. নবাব ফয়েজুন্নেসা চৌধুরানী ছাত্রীনিবাস (১৯৯৪)

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যনির্দেশ

চতুর্থ অধ্যায়

১. সরদার ফজলুল করিম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও পূর্ব বঙ্গীয় সমাজ, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃষ্ঠা ৩৭

২. ১ সালের ২ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের নেতৃত্বেই স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের পতাকা প্রথম প্রদর্শিত হয়।

৩. Calcutta University Commission Report. vol. IV. Part II. Page. 131-132

৪. Calcutta University Commission Report, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা, ১২২

৫. সরদার ফজলুল করিম, প্রাগুক্ত, ১৯৯৩, পৃষ্ঠা ২৩

৬. M. A. Rahim, The History of the University of Dacca. University of Dacca. 1981, P. 3

৭. Calcutta University Commission Report Page. 133

৮. নবাব নওয়াব আলী চৌধুরীর ভাষণ, চলতি বিবরণ, নিখিল ভারত মুসলিম লীগ' ১৯১২, পৃঃ৭৬: ঢাকা প্রকাশ, ৩ ভাদ্র, ১৩১৮/২০ আগস্ট, ১৯১১।

৯. Dacca University. Its role is freedom movement. A History of the Freedom Movement. Vol. IV. Page-10

১০. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিচিতি, ছাত্র নির্দেশনা ও পরামর্শদান দফতর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (২০০৩-২০০৪)।

১১. ৮৭তম বিবরণী, জনসংযোগ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

১২. ৮৭তম বিবরণী, জনসংযোগ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

ইতিহাস দু'শ্রেণীর মানুষকে স্মরণ করে থাকে। এক প্রকার হচ্ছেন যারা মানবতার কল্যাণে আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন তাঁদের সম্মানের কথা। দ্বিতীয় প্রকার হচ্ছেন যারা স্বৈরাচারের পথ অবলম্বন করে জাতিকে ঠেলে দিয়েছে ধ্বংসের দিকে তাদেরকে ঘৃণার সাথে। মহানবী (সঃ) বলেছেন, মানুষের মৃত্যুর পর তিনটি আমল ব্যতীত তার সমস্ত আমল বন্ধ হয়ে যায়, তন্মধ্যে একটি হচ্ছে এমন কিছু লিখে যাওয়া কিংবা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরী করা যা থেকে মানুষ সঠিক পথের দিশা পায়। তিনি আরও বলেছেন, যার দ্বারা মানবতা উপকৃত হয় মানুষের মাঝে তিনিই উত্তম। আলোচ্য প্রবন্ধে আমি এমনি একজন মানবতাবাদী, ইতিহাস খ্যাত, মহান মনীষী নবাব বাহাদুর সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরীর উপর কিঞ্চিত কিছু সময় আলোচনা করতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি।

তাঁর কর্মজীবন শুরু মোমেনশাহী জেলার অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট হিসেবে। কিন্তু ১৮৯৫ খ্রীঃ থেকে ১৯০৪ খ্রীঃ পর্যন্ত তাঁর কর্মজীবন ছিল সাহিত্য সাংস্কৃতিক কেন্দ্রিক। তার প্রমাণ মেলে তাঁর ঐ সময়ে প্রকাশিত 'মৌলুদ শরীফ' ও 'ঈদুল আযহা' নামক গ্রন্থ দু'টি থেকে। এছাড়া তিনি দু'টি গবেষনাধর্মী গ্রন্থ রচনা করেন সেগুলো হলো- 'Vernacular Education in Bengal' ও 'Primary Education in Rural Areas'। মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার ও জেলা বোর্ডের সদস্য হওয়ার মধ্য দিয়ে তাঁর রাজনৈতিক জীবনের হাতেখড়ি। মূলত ১৯০৫ খ্রীঃ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের মাধ্যমে তিনি প্রত্যক্ষ রাজনীতি আরম্ভ করেন। ১৯০৬ খ্রীঃ থেকে ১৯১১ খ্রীঃ পর্যন্ত পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য ছিলেন। ১৯১১ খ্রীঃ বঙ্গভঙ্গ রদ করার প্রচণ্ড বিরোধিতা করেন। ১৯১২ খ্রীঃ থেকে ১৯১৬ খ্রীঃ পর্যন্ত বঙ্গ প্রেসিডেন্সী পরিষদের সদস্য ছিলেন। ১৯১৬ খ্রীঃ থেকে ১৯২০ খ্রীঃ পর্যন্ত ভারতীয় আইন সভার সদস্য ছিলেন। ১৯২১ খ্রীঃ থেকে ১৯২৫ খ্রীঃ পর্যন্ত তিনি দু'দফায় ইংরেজ সরকারের মন্ত্রী নিযুক্ত হন। তিনিই হলেন ভারতে বৃটিশ শাসনামলে প্রথম মুসলিম মন্ত্রী। ১৯২৫ খ্রীঃ বেঙ্গল এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের সদস্য মনোনীত হন এবং মৃত্যুর আগ পর্যন্ত সে পদে বহাল ছিলেন।

বঙ্গভঙ্গ রদ হওয়ায় মুসলমানদের সান্ত্বনা দেয়ার জন্য তৎকালীন ভারতের গভর্নর চার্লস বেইলী ঢাকায় এলে নবাব সলীমুল্লাহ 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতি' ও নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী 'মুসলিম লীগের' পক্ষ থেকে দু'টি মানপত্র পাঠ করেন। উভয় মানপত্রেই ঢাকাতে একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবী অন্তর্ভূক্ত ছিল। একথা অত্যুক্তি হবে না যে, নবাব সলীমুল্লাহ ও নবাব নওয়াব আলী চৌধুরীই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম প্রস্তাবক ও একমাত্র প্রতিষ্ঠাতা। ১৯১৫ সালে নবাব সলীমুল্লাহর মৃত্যুর পর নওয়াব আলী চৌধুরী একাই ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আন্দোলন চালিয়ে যান। অবশেষে নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে ১৯২১ সালের জুলাই মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করে। নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরীই প্রথম ঘোষনা দেন ভারতের রাষ্ট্র ভাষা যাই হোক না কেন বাংলার রাষ্ট্র ভাষা বাংলাই করতে হবে। সে লক্ষ্যে তিনি ইংরেজ সরকারের নিকট একটি স্মারকলিপিও প্রদান করেন। এদিক থেকে তিনি বাংলা রাষ্ট্রভাষার প্রথম প্রস্তাবক। এ মহান নেতা আমৃত্যু সমাজ সেবামূলক কাজের সাথে জড়িত ছিলেন।

কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি স্যার আশুতোষ মুখার্জি, ড. রাসবিহারী ঘোষ, সিলেটের বিপিন পালসহ কতিপয় বুদ্ধিজীবি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। ১৯১২ সালের ২৮ মার্চ কলকাতার গড়ের মাঠে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে তারা প্রতিবাদ সভা ডাকেন। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৯১২ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি ড. রাসবিহারী ঘোষের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল ভাইসরয়ের সাথে সাক্ষাৎ করে বলেন, যেহেতু পূর্ব বাংলার অধিকাংশ অধিবাসী মুসলিম কৃষক, এই বিশ্ববিদ্যালয় তাদের কোন কাজে আসবে না। তারা প্রস্তাবিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে 'মক্কা বিশ্ববিদ্যালয়' বলে ব্যঙ্গ করেন। এই বিশ্ববিদ্যালয় যাতে প্রতিষ্ঠিত না হয়, সেজন্য ১৮ বার স্মারকলিপি পেশ করা হয়েছিল লর্ড হার্ডিঞ্জের কাছে।

অর্থাভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবন নির্মাণ কাজ বন্ধ হলে নওয়াব আলী চৌধুরী নিজ জমিদারীর একাংশ বন্ধক রেখে ৩৫,০০০/- (তৎকালীন মূল্যমানের) টাকা দান করেন। নওয়াব আলী চৌধুরী ছাত্র বৃত্তি বাবদ ১৬ হাজার টাকার তহবিল দান করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর তিনি মন্তব্য করেন, আপনাদের ও আমার সেই চিরাচরিত স্বপ্ন বাস্তবায়ন হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এর আইন প্রস্তুত হয়েছে, একথা মনে করেও আমি আত্মপ্রসাদ লাভ করছি। নবাব সলীমুল্লাহ ও নওয়াব আলী চৌধুরী ছাড়াও শেরে বাংলা একে ফজলুল হক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে উল্লেখ্যযোগ্য ভূমিকা রাখেন। নবাব সলীমুল্লাহ বাহাদুর তাঁর স্বপ্নে দেখা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দেখে যেতে পারেন নি। তাঁর শিক্ষা-অবদানকে স্মরণীয় করার উদ্দেশ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর ১৯৩৯ সালের আগস্ট মাসে এর প্রথম নির্মিত হলের নামকরণ করা হয় 'সলীমুল্লাহ মুসলিম হল'। অথচ অন্যান্য প্রতিষ্ঠাতাদের নাম এর ইতিহাস থেকে মুছে ফেলার অপপ্রয়াস অব্যাহত রয়েছে। শিক্ষার্থীদের প্রকৃত ইতিহাস না জানানোর ফলে নতুন বংশধররা জাতিসত্তার মূলধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে। নবাব সলীমুল্লাহ ও একে ফজলুল হকের নামে বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলের নাম করণ করা হয়েছে কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় যে কয়জন অক্লান্ত পরিশ্রম করেন তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রাখেন নওয়াব আলী চৌধুরী কিন্তু তার নামে এখন পর্যন্ত ৮৪

Dhaka University Institutional Repository

বছর পরও কোন হলের নামকরণ পর্যন্ত করা হয়নি। পত্র-পত্রিকায় লেখা-লেখি ও অনেক আবেদনের পর অল্প কিছুদিন পূর্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার বিল্ডিং সংলগ্ন স্থানে নওয়াব আলী চৌধুরীর নামে সিনেট ভবন নির্মানের কাজ শুরু করা হয়েছে। তাঁর নামে সিনেট ভবন নির্মাণ করার জন্য বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে আমার পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরীর এ সকল অবদানের জন্য তাঁকে জাতীয় নেতাদের পিছনের সারিতে রাখার সুযোগ নেই। রাজনৈতিক হীনমন্যতার কারণে আজও তাঁকে জাতীয়ভাবে তুলে ধরা হয়নি। এটা এদেশ ও জাতির জন্য চরম লজ্জাজনক। আজকে খ্যাত, অখ্যাত অনেক কথিত নেতার নামে অনেক কিছুই হচ্ছে কিন্তু নওয়াব আলী চৌধুরীর নামে একটি চেয়ারও তৈরী হয়নি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা নওয়াব আলী চৌধুরীর নামে একটি হল কিংবা অনুষদের নামকরণ করে তাঁর অবদানের কিছুটা হলেও স্বীকৃতি দেয়া যেতে পারতো। তাঁর কর্মময় জীবনকে অনুসরণ করে দেশ ও জাতির সেবায় আমারা আত্মনিয়োগ করতে অনুপ্রাণিত হতাম।

এ মহান জাতীয় নেতা ১৯২৯ খ্রীঃ ২৭ এপ্রিল কলিকাতায় 'ইডেন ক্যাসেলে' নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করনে। তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্যে বড়লাটের আদেশে ঐ দিন বাংলার সকল অফিস বন্ধ থাকে এবং সরকারী অফিসসমূহে পতাকা অর্ধোনমিত করা হয়। তাঁর কলিকাতার 'ইডেন ক্যাসেলে' নামক বাড়ি হতে মিছিল করে ট্রেন যোগে টাঙ্গাইলের ধনবাড়ীর জমিদার বাড়ীতে এনে শাহী কবরস্থানে দাফন করা হয়। তাঁর ওসিয়ত মত তাঁর কবরস্থানের পাশে মৃত্যুর পর থেকে অদ্যাবধি দু'জন হাফেজ কুরআন তেলাওয়াত করছেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁর সকল ভাল কাজ কবুল করুন। তাঁকে জান্নাতের সবচেয়ে উঁচু স্থানে আসিন করুন। আমিন। ছুম্মা আমিন।।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

(যে সকল গ্রন্থ থেকে সাহায্য নেওয়া হয়েছে)

১. মুনতাসির মামুন : উনিশ শতকে পূর্ব বঙ্গের সমাজ।

২. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ ড., নওয়াব আলী চৌধুরীর জীবন ও কর্ম, ঢাকা (ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, ১৯৮৭)।

৩. ওয়াকিল আহমদ, উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তাচেতনার ধারা , ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৩।

৪. মজীবুর রহমান খান, পাকিস্তান আন্দোলন ও মুসলিম সাহিত্য, ঢাকা বাংলা একাডেমী, ১৯৬৮।

৫. আব্দুস্ সাত্তার, মাওলানা, তারীখ-ই-মাদ্রসা-ই-আলিয়াহ্, ঢাকা ১৯৫৯।

৬. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রত্রিকা, পঞ্চদশ সংখ্যা, আষাঢ়, ১৩৮৯/জুন, ১৯৮২।

৭. আব্দুল হক ফরিদী, মাদ্রাসা শিক্ষাঃ বাংলাদেশ।

৮. মোহাম্মদ আজিজুল হক, বাংলাদেশে মুসলিম শিক্ষার ইতিহাস এবং সমস্যা (মুস্তাফা নূরুল ইসলাম অনুদিত)।

৯. M. A. Rahim. The History of the University of Dacca. University of Dacca. 1981।

১০. Sikandar Ali Ibrahimy. Reports on Islamic Education and Madrashah Education.

১১. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ ড., আধুনিক শিক্ষা বিস্তারে বাংলার কয়েকজন মুসলিম দিশারী, কামিয়াব প্রকাশন, ঢাকা, এপ্রিল, ২০০০।

১২. সরদার ফজলুল করিম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও পূর্ব বঙ্গীয় সমাজ, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯৩।

১৩. আবুল মনসুর আহমদ, আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর, ঢাকা, নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৭৫।

১৪. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী কর্তৃক প্রকাশিত স্মরণিকা, প্রেরণার বাতিঘর, ডিসেম্বর ২০০২।

১৫. বাংলাপিডিয়া, মাল্টিমিডিয়া সিডি, এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বাংলাদেশ, প্রথম মুদ্রণ, ফেব্রুয়ারী, ২০০৪।

১৬. বাংলা বিশ্বকোষ (৪), ঢাকা, নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৭৬।

১৭. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিচিতি, ছাত্র নির্দেশনা ও পরামর্শদান দফতর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (২০০৩-২০০৪)।

১৮. ৮৭তম বিবরণী, জনসংযোগ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

ঐতিহ্যবাহী স্থাপত্য শৈলী এলবাম

কলকাতা গভর্নমেন্ট হাউস প্রাঙ্গণে তোলা ছবিঃ

চেয়ারে (বাম থেকে)ঃ ১। নাম অজ্ঞাত ২। স্যার দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী, ভাইস চ্যান্সেলর, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। ৩। নওয়াব বাহাদুর নওয়াব আলী চৌধুরী ৪। নাম অজ্ঞাত ৫। নাম অজ্ঞাত ৭। জাসটিস নওয়াব স্যার সৈয়দ শামসুল হুদা, কে. সি. আই-.ই.সদস্য এগজিকিউটিভ কাউন্সিল। ৮। স্যার উইলিয়াম এফ. ডিউক সদস্য, এগজিকিউটিভ কাউন্সিল। ৯। লর্ড কারমাইক্যাল, গর্ভনর অব বেঙ্গল, (১৯১২-১৯১৭) ১০। স্যার পি.সি.লায়ন, সদস্য, এগজিকিউটিভ কাউন্সিল ১১। মহারাজা বর্ধমান ১২। নাম অজ্ঞাত ১৩। নাম অজ্ঞাত ১৪। লর্ড এস্. পি. সিনহা ১৫। স্যার সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী ১৬। নাম অজ্ঞাত ১৭। নাম অজ্ঞাত

দাঁড়িয়ে (১ম সারি-বাম থেকে) ঃ ১। নাম অজ্ঞাত ২। নাম অজ্ঞাত ৩। নাম অজ্ঞাত ৪। নাম অজ্ঞাত ৫। নাম অজ্ঞাত ৬। মিঃ পি. এন. মুখার্জী, আই.জি রেজিস্ট্রেশন ৭। নওয়াব স্যার সৈয়দ হুস্সাম হায়দার চৌধুরী ৮। নাম অজ্ঞাত ৯। স্যার যাহিদ সুহরাওয়ার্দী। ১০ থেকে ১৯। নাম অজ্ঞাত

দাঁড়িয়ে (২য় সারি)ঃ নাম অজ্ঞাত।

Dhaka University Institutional Repository

নবাব নওয়াব আলী চৌধুরীর কিছু স্মৃতি বিজড়িত ছবির এলবাম

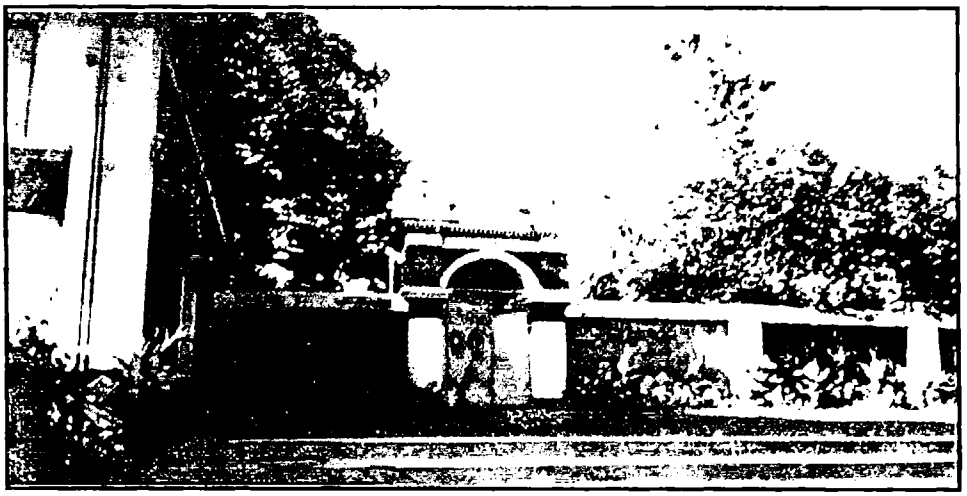

নবাব বাড়ীর প্রধান ফটক

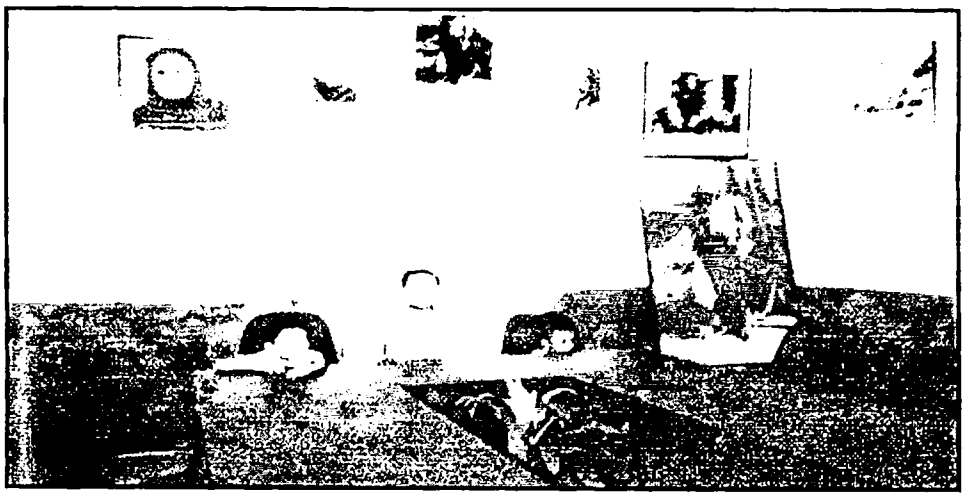

নবাবের বাড়ীতে অবস্থিত হল রুমে গবেষক এবং তার দুই শিশু পুত্র

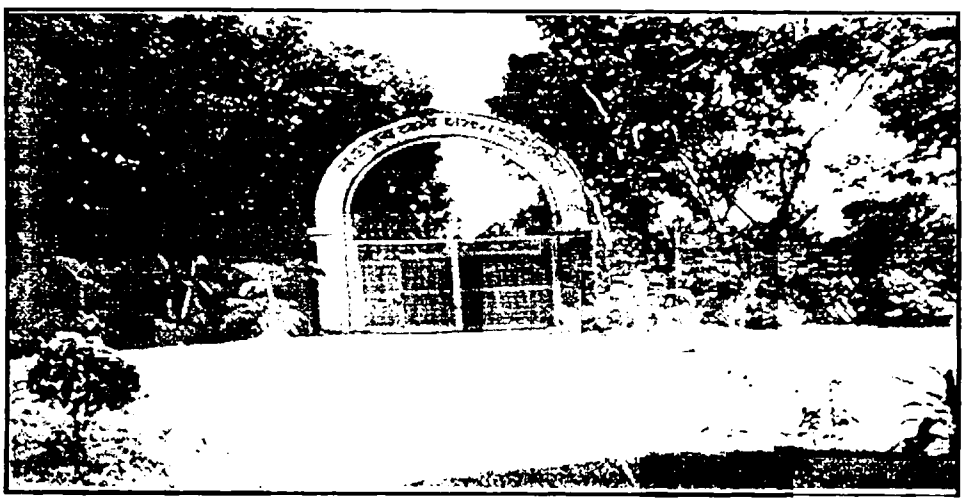

নওয়াব আলী হাসান আলী রিসর্টস এর প্রধান ফটক

Dhaka University Institutional Repository

নবাব নওয়াব আলী চৌধুরীর কিছু স্মৃতি বিজড়িত ছবির এলবাম

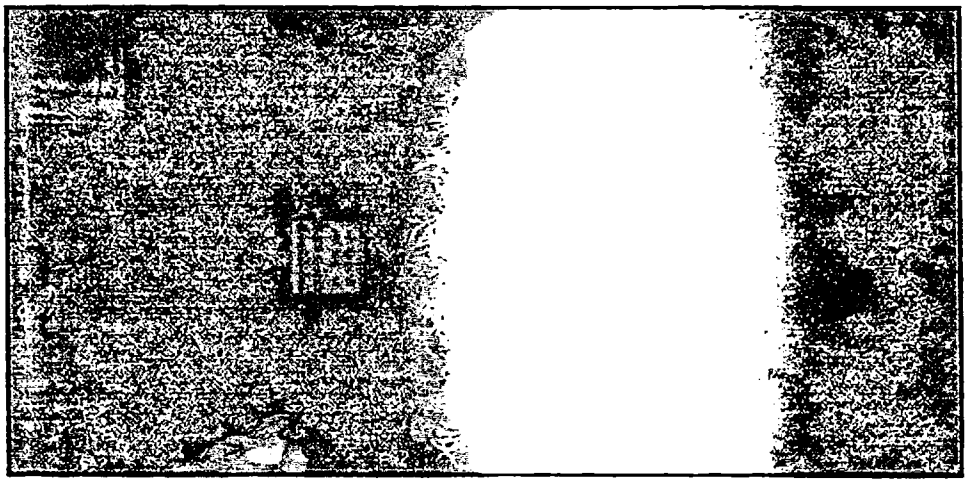

নবাবের কবরস্থানের ছবি। এই কবরের শীয়রে বসে তার
অছিয়মত ৩ জন হাফেজ সর্বক্ষন কুরআন তেলাওয়াত করছেন।

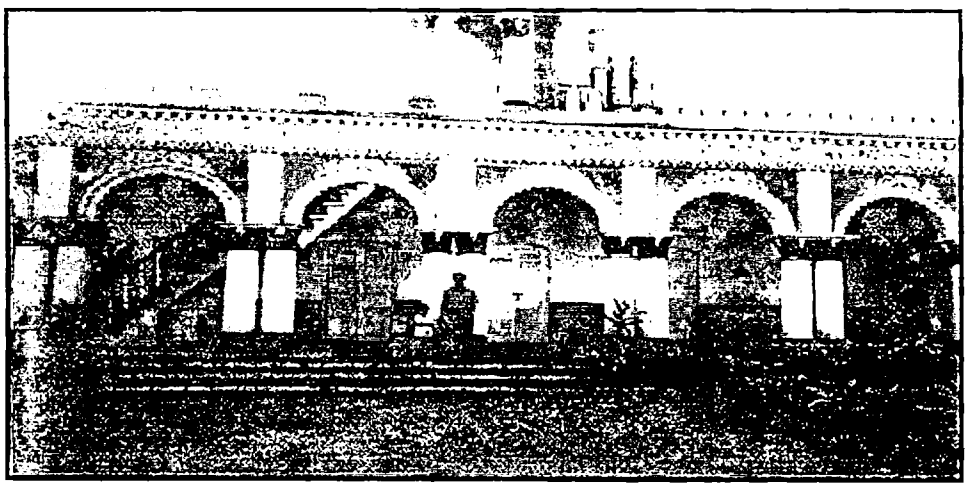

দরবার হল

নবাববাড়ীর মসজিদ

Dhaka University Institutional Repository

নবাব নওয়াব আলী চৌধুরীর কিছু স্মৃতি বিজড়িত ছবির এলবাম

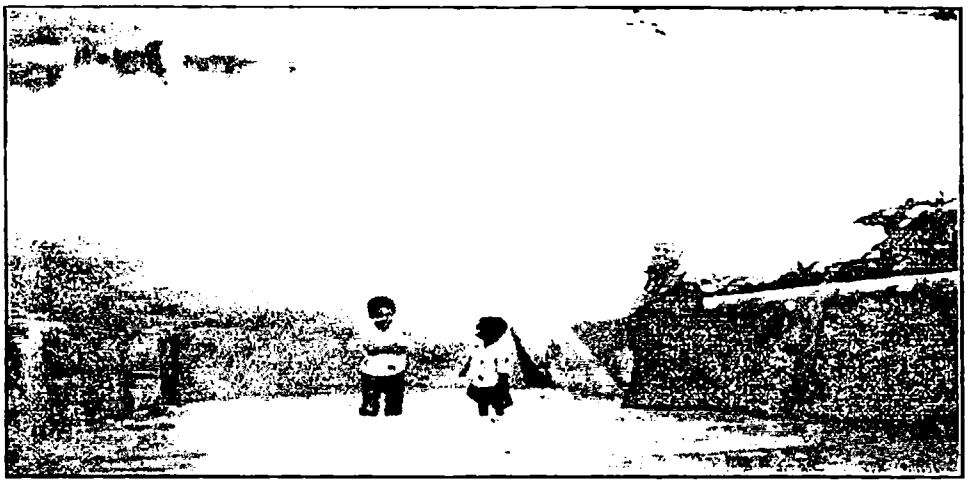

নবাব বাড়ী সংলগ্ন দীঘিপাড়

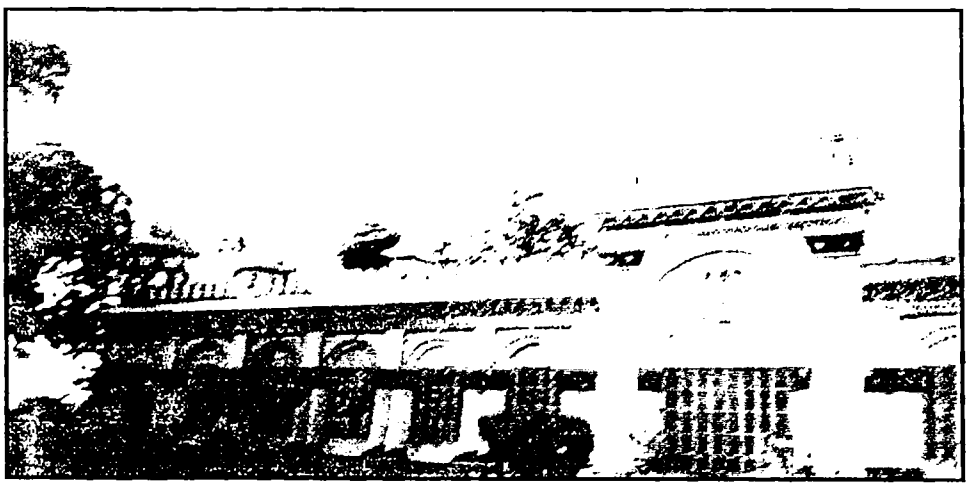

ধনবাড়ী অবস্থিত নবাব বাড়ীর একাংশ

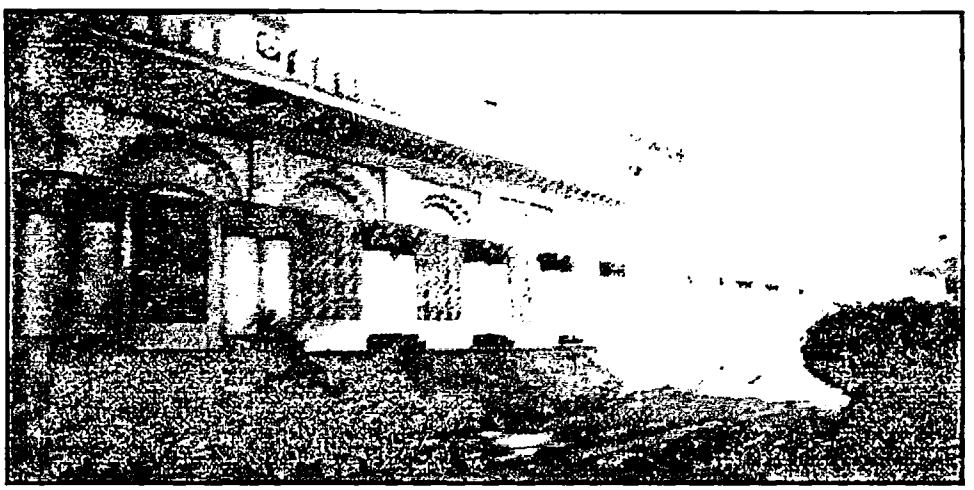

ধনবাড়ী অবস্থিত নবাব বাড়ীর একাংশ

Dhaka University Institutional Repository

নবাব নওয়াব আলী চৌধুরীর কিছু স্মৃতি বিজড়িত ছবির এলবাম

নবাব বাড়ির পুকুর ঘাটে বিশেষ মুহূর্তে তোলা গবেষকের শিশুপুত্র সহ ছবি

নবাব নওয়াব আলী চৌধুরীর পুত্র
নবাব হাসান আলী চৌধুরীর কবরস্থান

Dhaka University Institutional Repository

নবাব নওয়াব আলী চৌধুরীর কিছু স্মৃতি বিজড়িত ছবির এলবাম

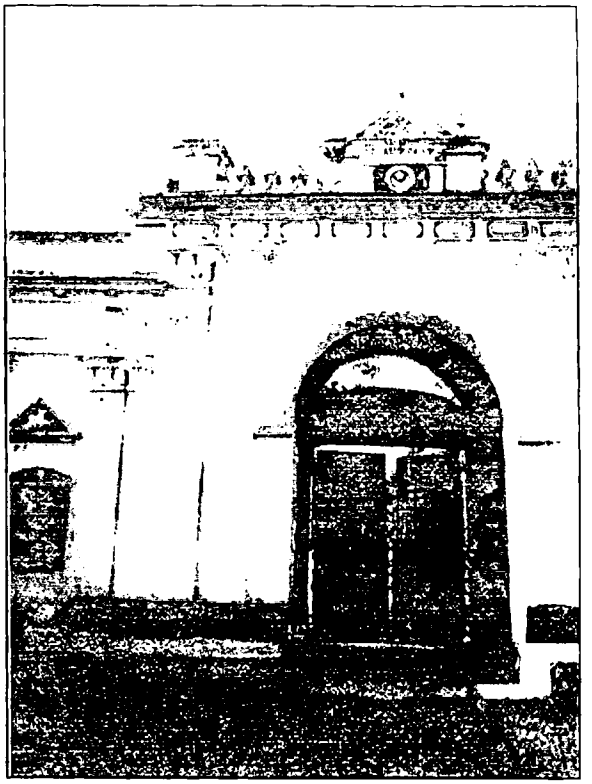

টাঙ্গাইলের ধনবাড়ীতে অবস্থিত
নওয়াব আলী চৌধুরীর মাজার শরিফের প্রধান ফটক

টাঙ্গাইলের ধনবাড়ীতে অবস্থিত
নওয়াব আলী চৌধুরীর মাজার শরিফ

Dhaka University Institutional Repository

নবাব নওয়াব আলী চৌধুরীর কিছু স্মৃতি বিজড়িত ছবির এলবাম

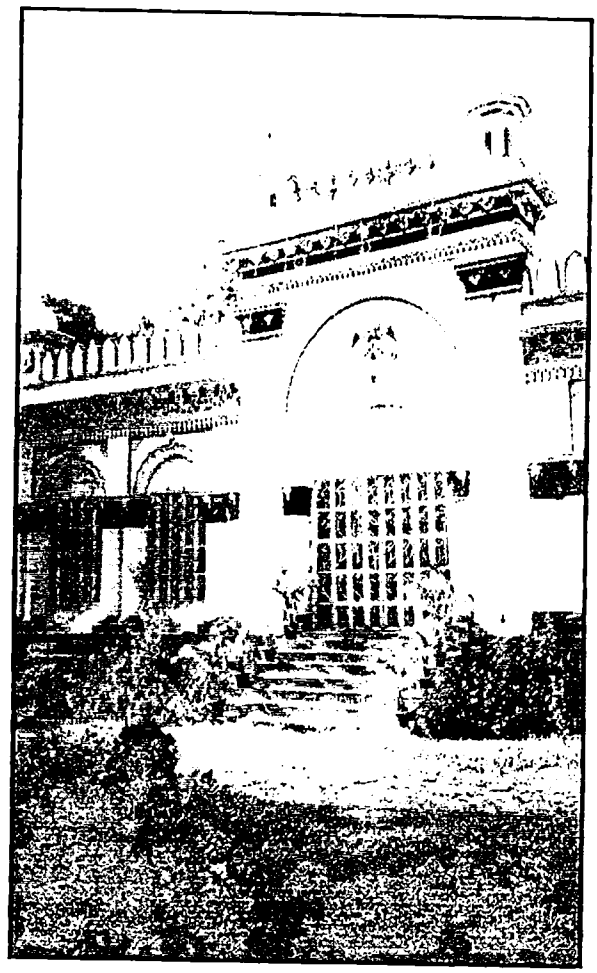

নবাব বাড়ী

বেগম সখিনা খাতুন চৌধুরীানীর মাজার শরিফ

Dhaka University Institutional Repository

ধনবাড়িতে নবাববাড়ীর কিছু স্মৃতি বিজড়িত স্থাপত্য এলবাম-

ধনবাড়িতে নবাববাড়ীর পুরাতন ভবনের প্রধান ফটক

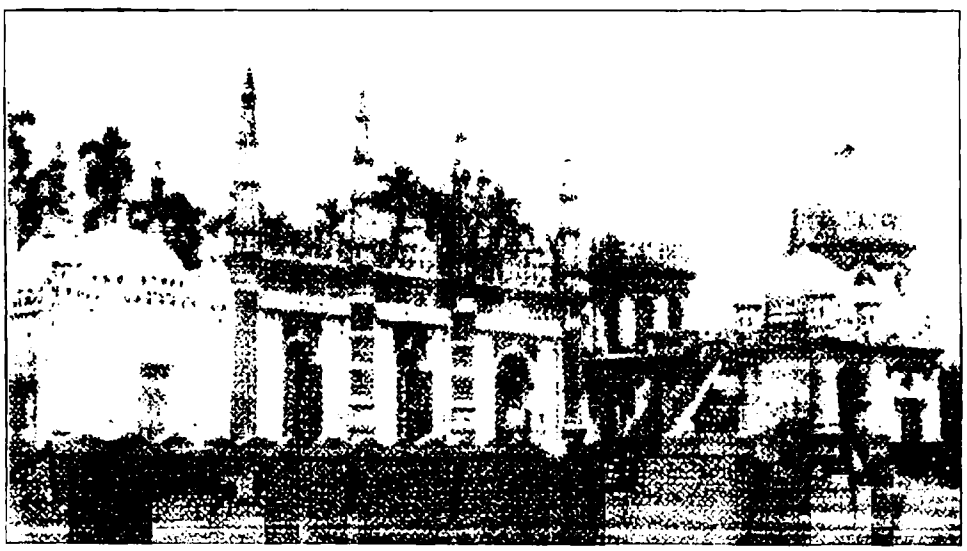

ধনবাড়িতে নবাববাড়ী সংলগ্ন ৭০০ বছরের পুরাতন মসজিদ

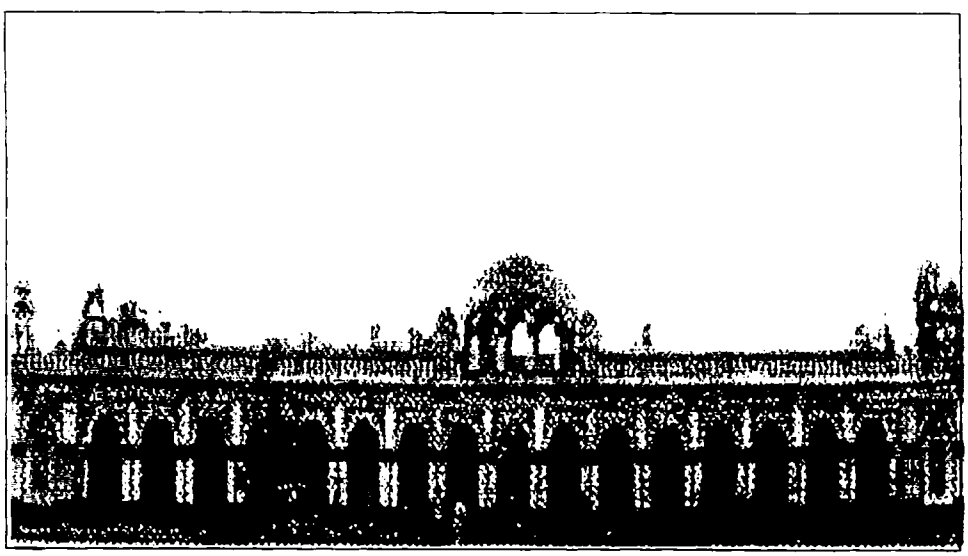

১০০ বছর পূর্বের স্থাপত্য ধনবাড়িতে নবাববাড়ীর প্যালেস

Dhaka University Institutional Repository

ধনবাড়িতে নবাববাড়ীর কিছু স্মৃতি বিজড়িত স্থাপত্য এলবাম-

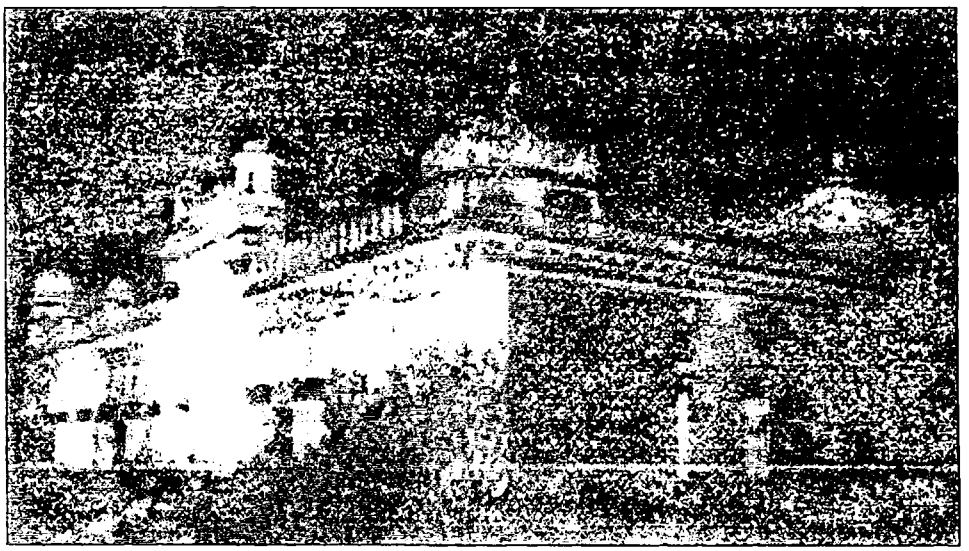

ধনবাড়িতে নবাববাড়ীর নবাব মঞ্জিল

ধনবাড়িতে নবাববাড়ীর নবাব মঞ্জিল সংলগ্ন বাগান

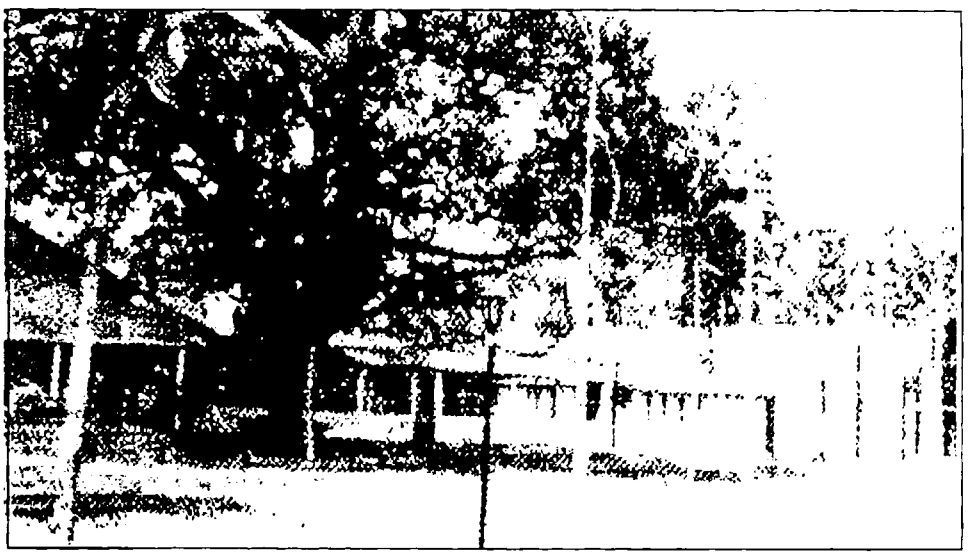

১০০ বছর পূর্বের স্থাপত্য ধনবাড়িতে নবাববাড়ীর ভিলা

Dhaka University Institutional Repository

ধনবাড়িতে নবাববাড়ীর কিছু স্মৃতি বিজড়িত স্থাপত্য এলবাম-

ধনবাড়িতে নবাববাড়ীর নবাব প্যালেসের বারান্দা

ধনবাড়িতে নবাববাড়ীর নবাবের মাজার

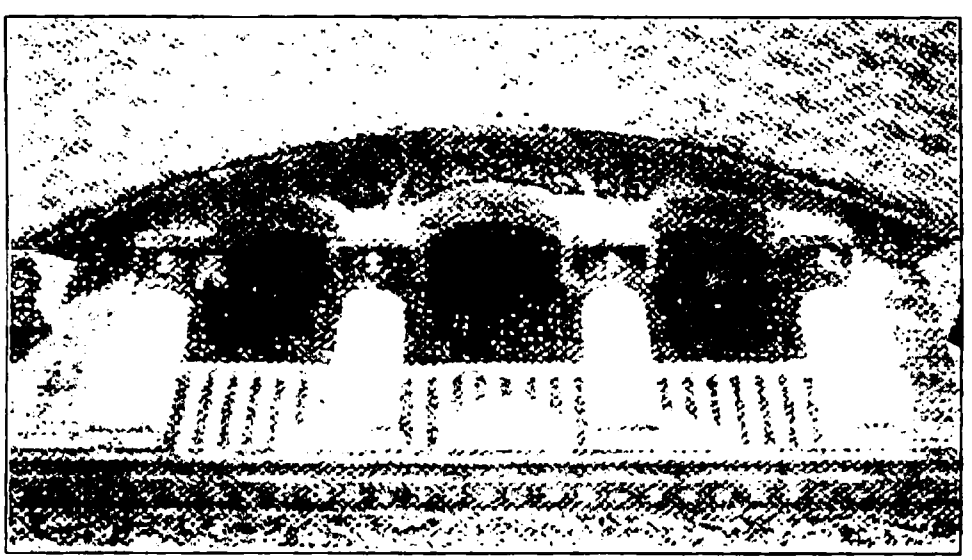

৭০০ বছর পূর্বের স্থাপত্য ধনবাড়িতে নবাববাড়ী মসজিদের মিনার

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকার ঐতিহ্যবাহী স্থাপত্য শৈলী এলবাম

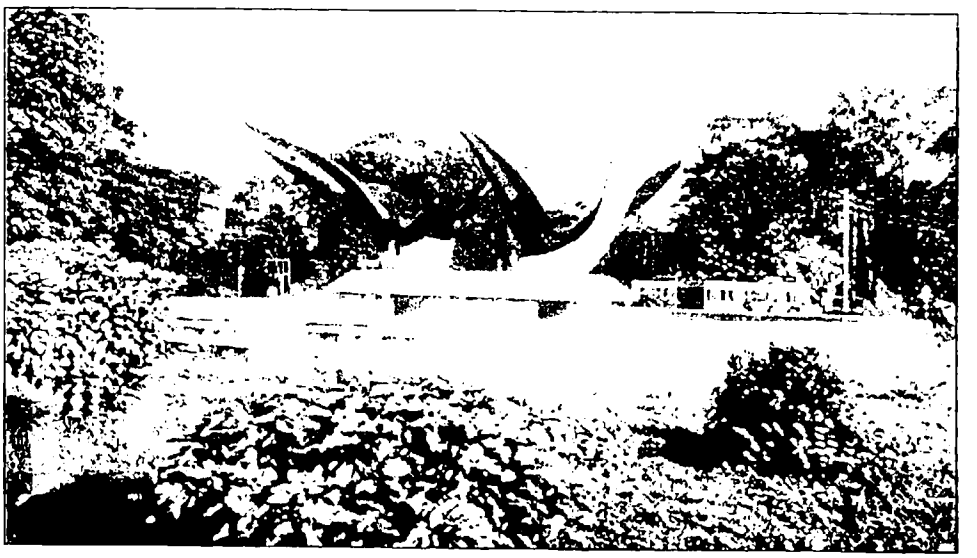

কার্জন হল সংলগ্ন দোয়েল চত্বর

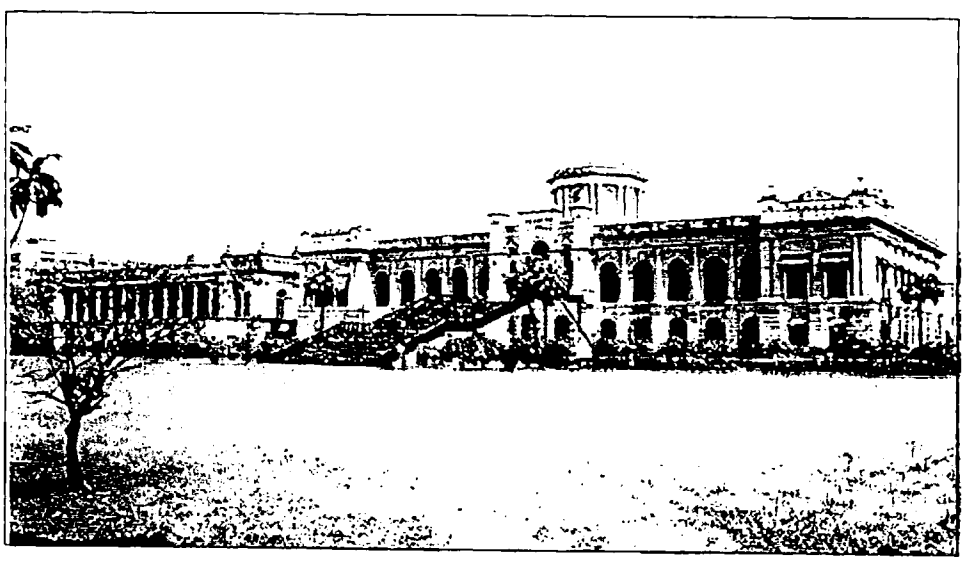

আহসান মঞ্জিলের একাংশ

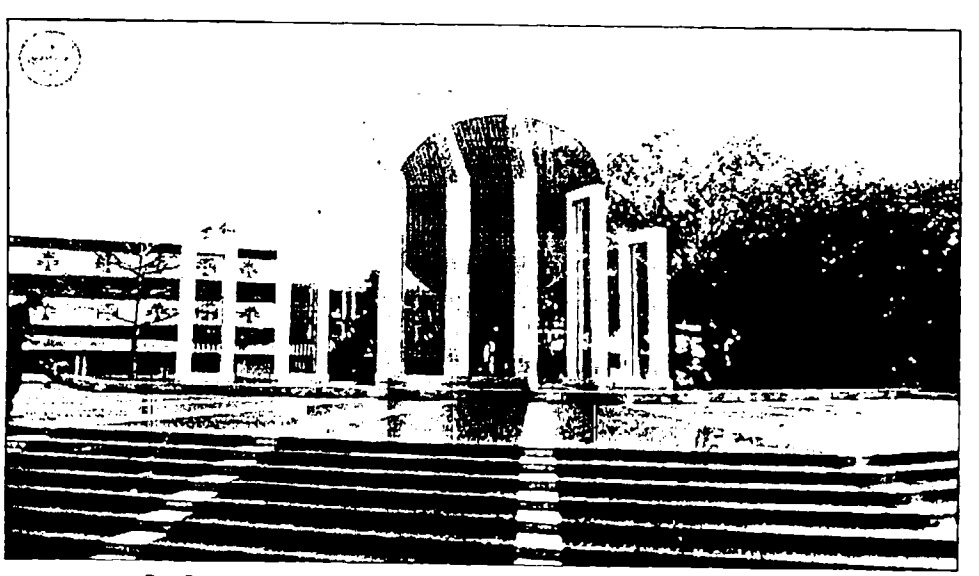

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় অবস্থিত ভাষা সৈনিকদের স্মৃতি বিজড়িত শহীদ মিনার

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপত্য এলবাম-

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদ সংলগ্ন জাতীয় কবি নজরুল ইসলামের মাজার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহ্যবাহী স্থাপত্য কার্জন হল

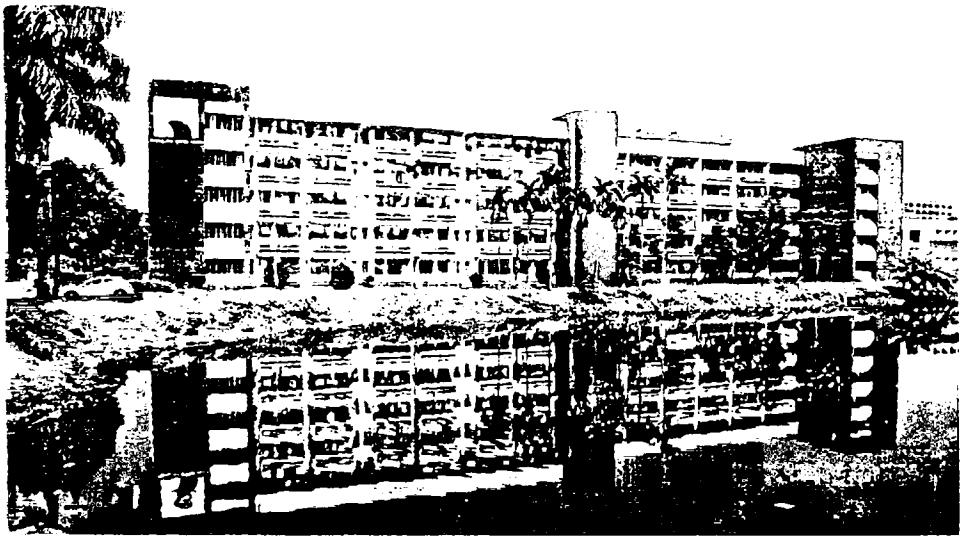

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শেখ মজিবর রহমান হল

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপত্য এলবাম-

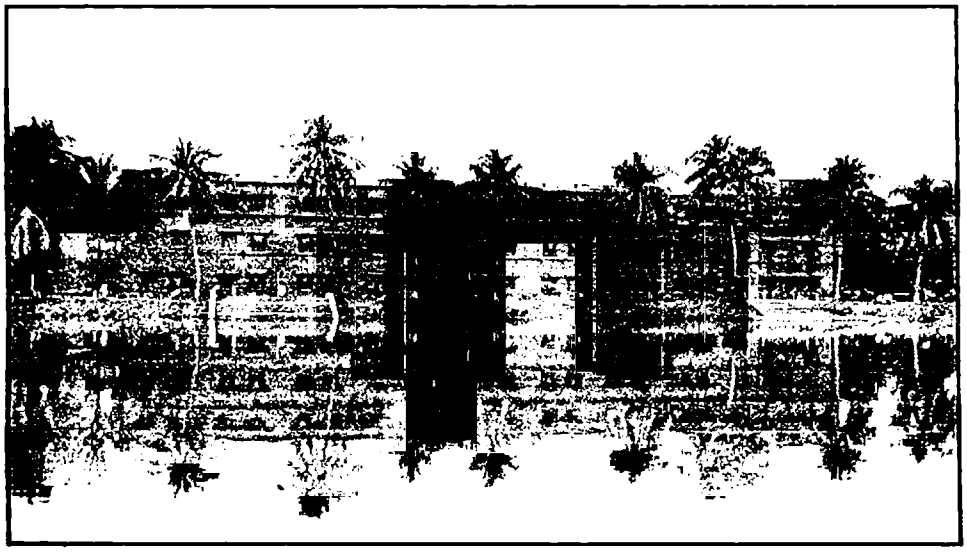

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক হল সংলগ্ন পুকুর

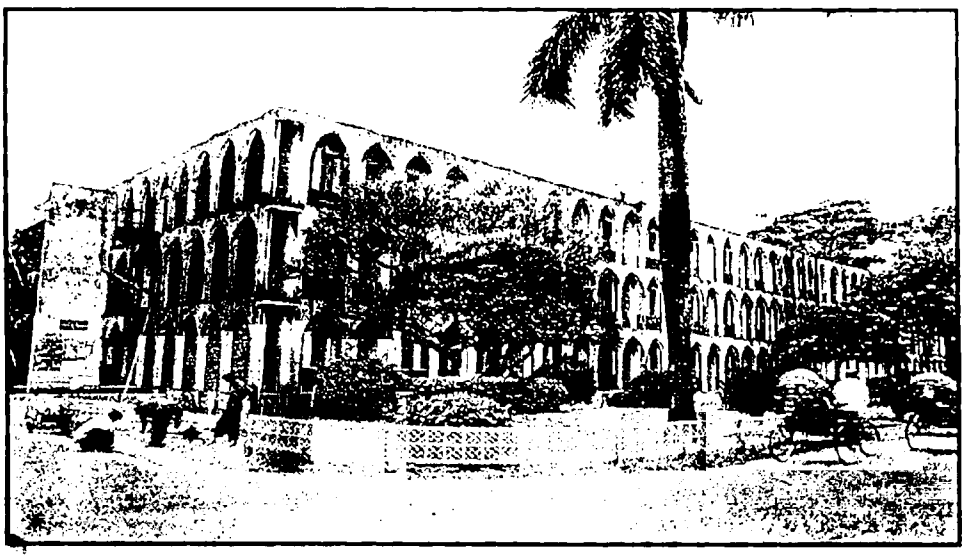

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহ্যবাহী স্থাপত্য কার্জন হল সংলগ্ন বিজ্ঞান ভবন

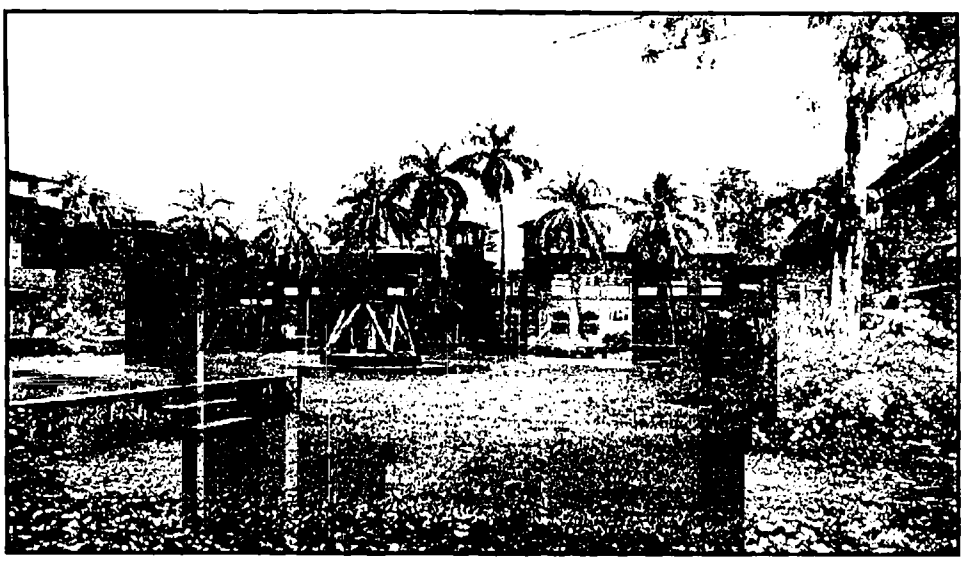

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ হল

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপত্য এলবাম-

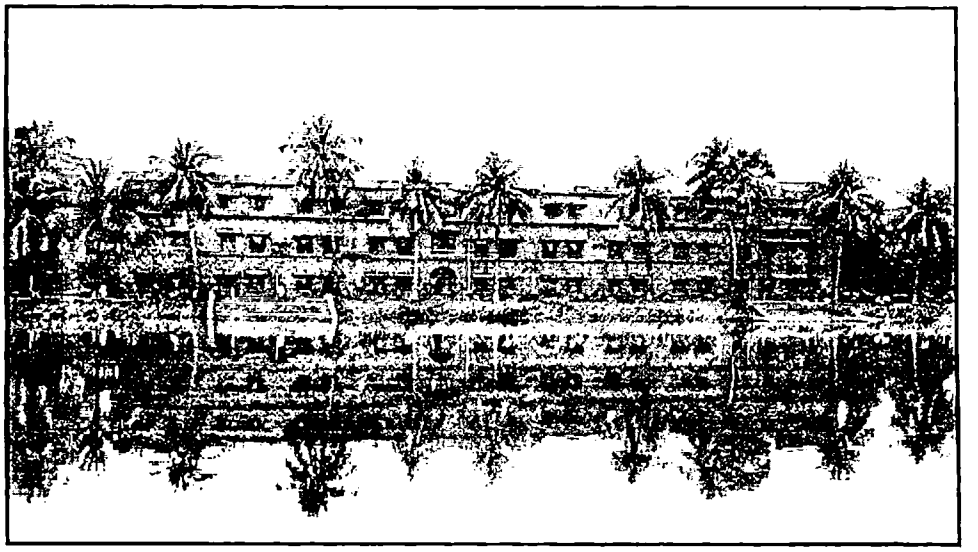

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক হল সংলগ্ন পুকুর

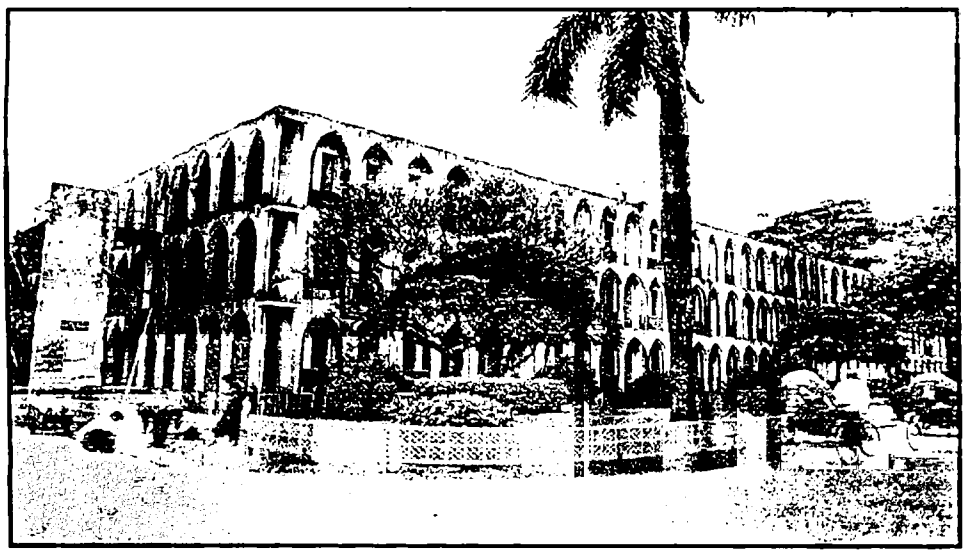

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহ্যবাহী স্থাপত্য কার্জন হল সংলগ্ন বিজ্ঞান ভবন

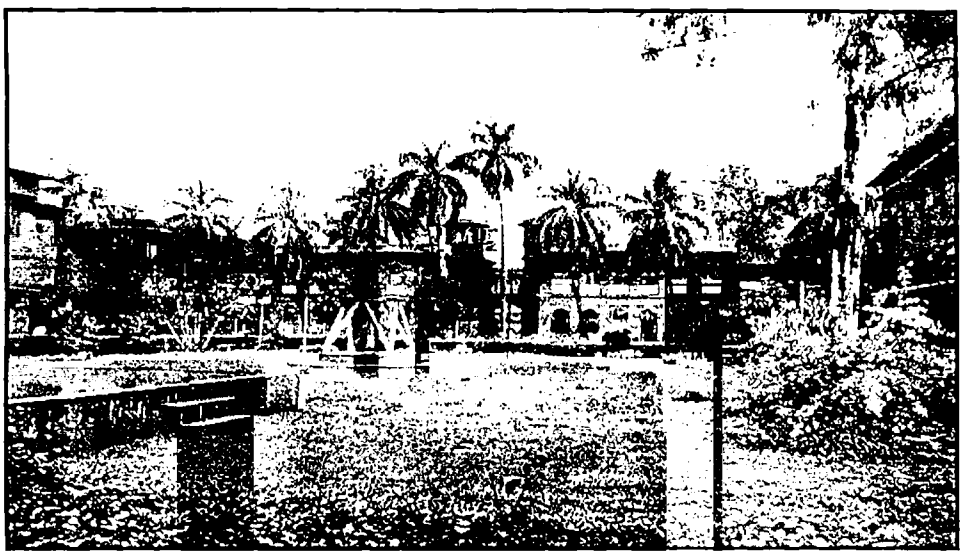

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ হল

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপত্য এলবাম-

Dhaka University Institutional Repository

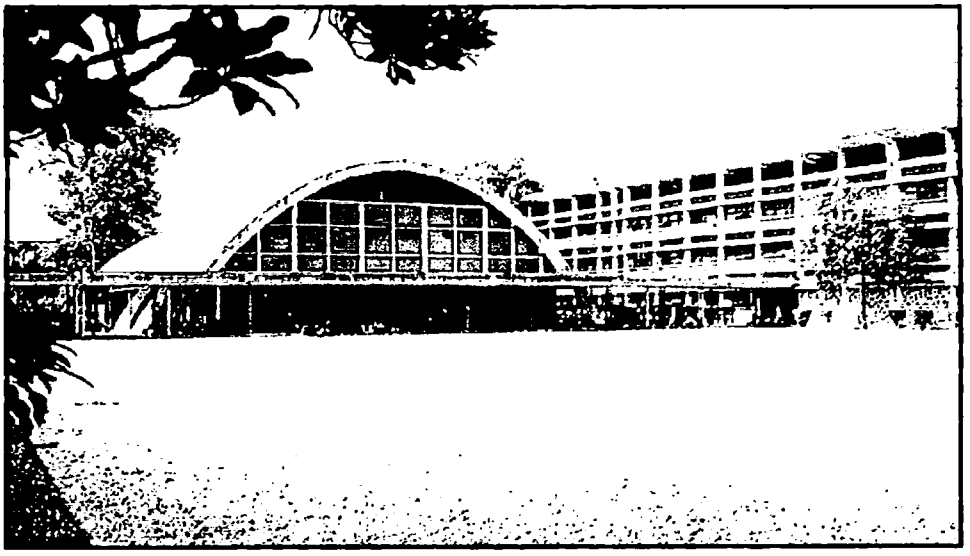

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহ্যবাহী স্থাপত্য টি এস সি অডিটোরিয়াম

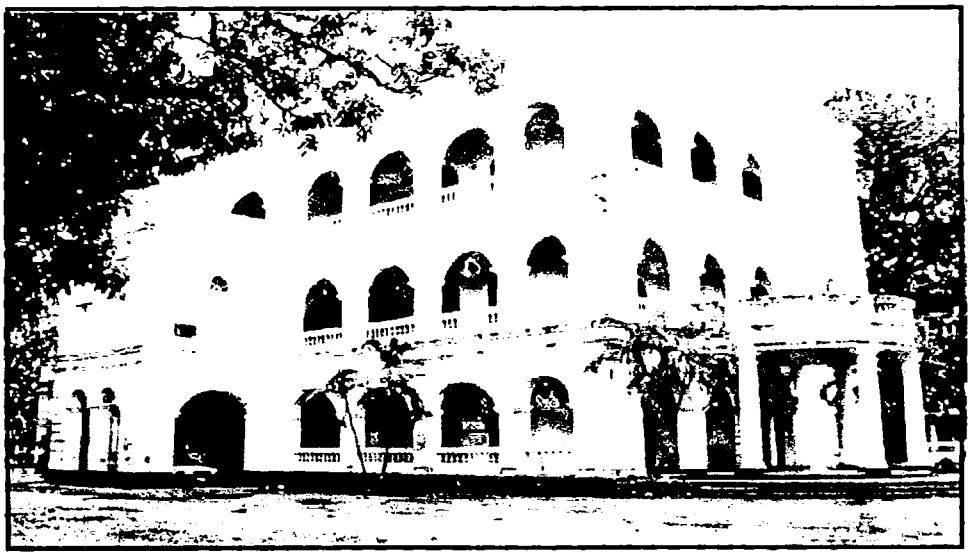

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় অবস্থিত ঐতিহ্যবাহী স্থাপত্য বাংলা একাডেমী

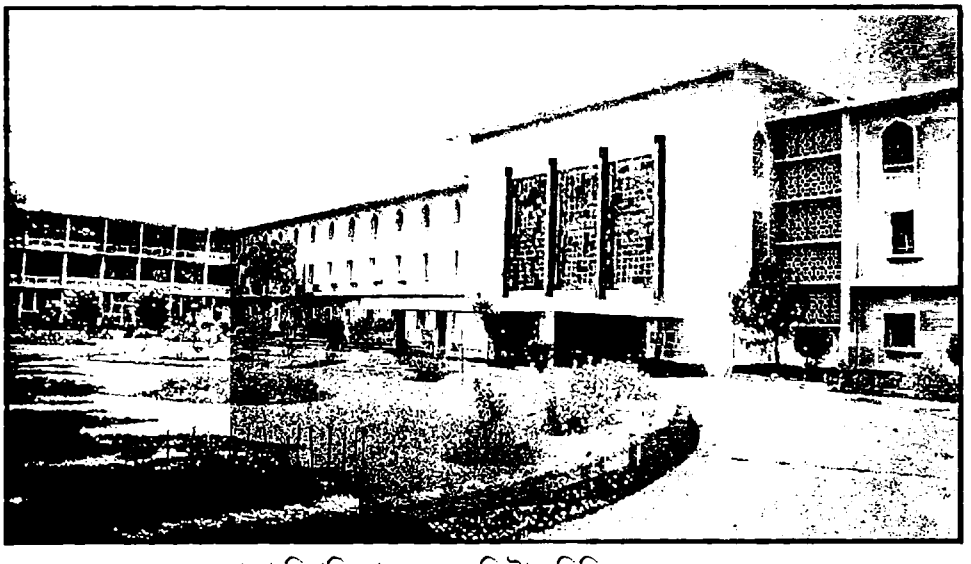

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার বিল্ডিং

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপত্য এলবাম-

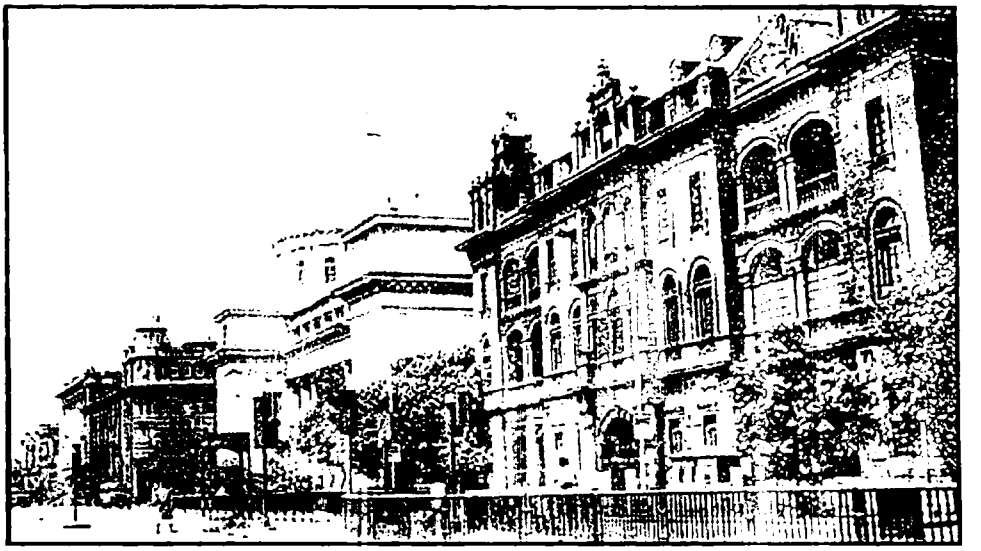

ঐতিহ্যবাহী স্থাপত্য

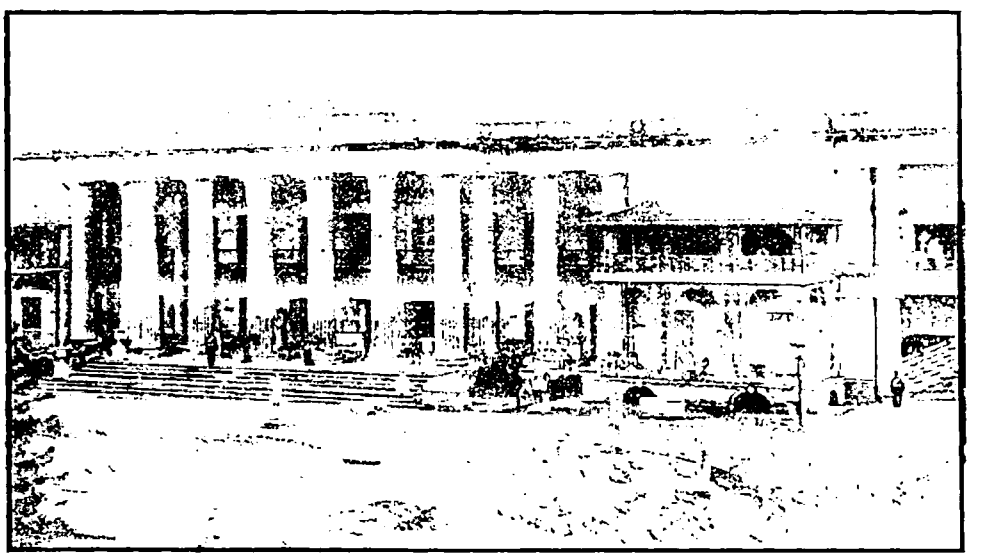

ঐতিহ্যবাহী স্থাপত্য

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার বিল্ডিং-এর একাংশ

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপত্য এলবাম-

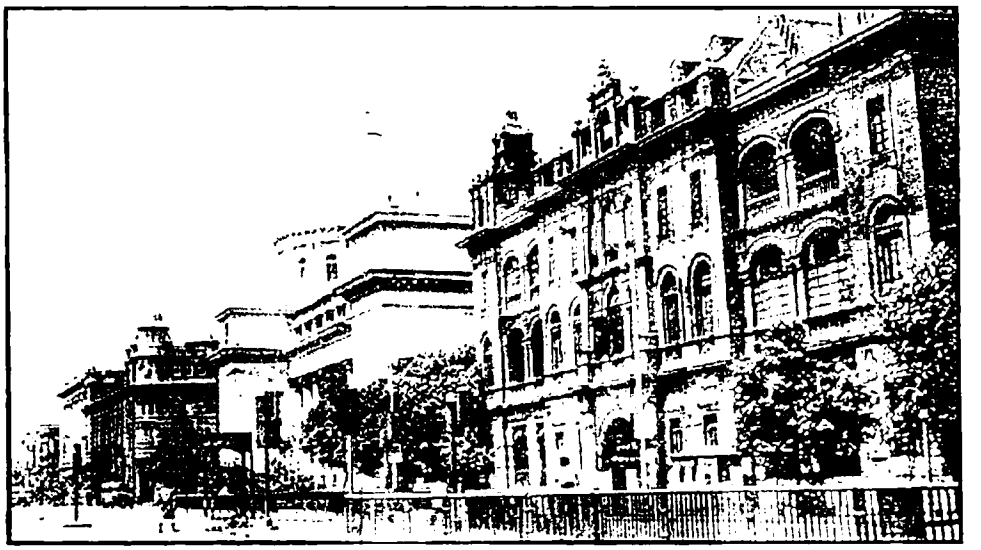

ঐতিহ্যবাহী স্থাপত্য

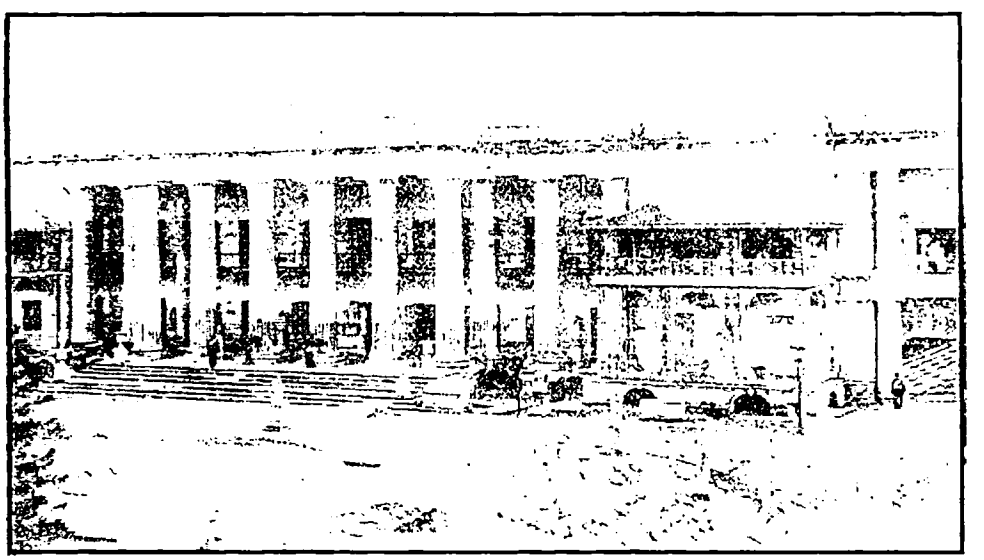

ঐতিহ্যবাহী স্থাপত্য

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার বিল্ডিং-এর একাংশ

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপত্য এলবাম-

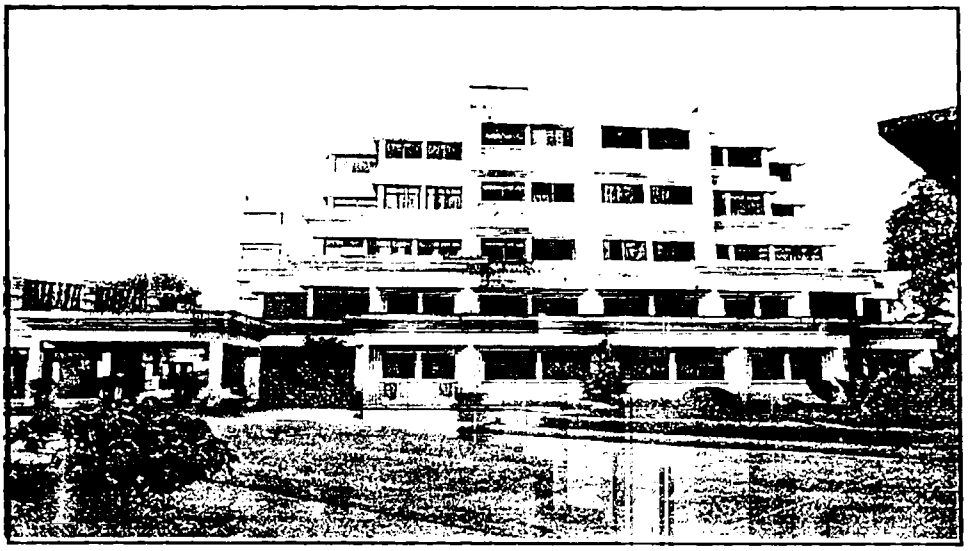

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাইন্স ফ্যাকাল্টি বিল্ডিং-এর একাংশ

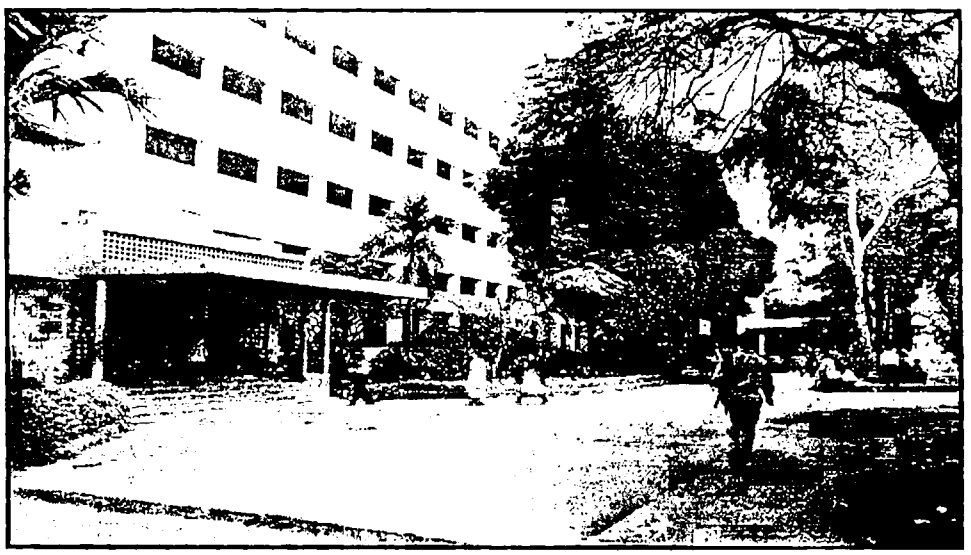

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ভবনের একাংশ

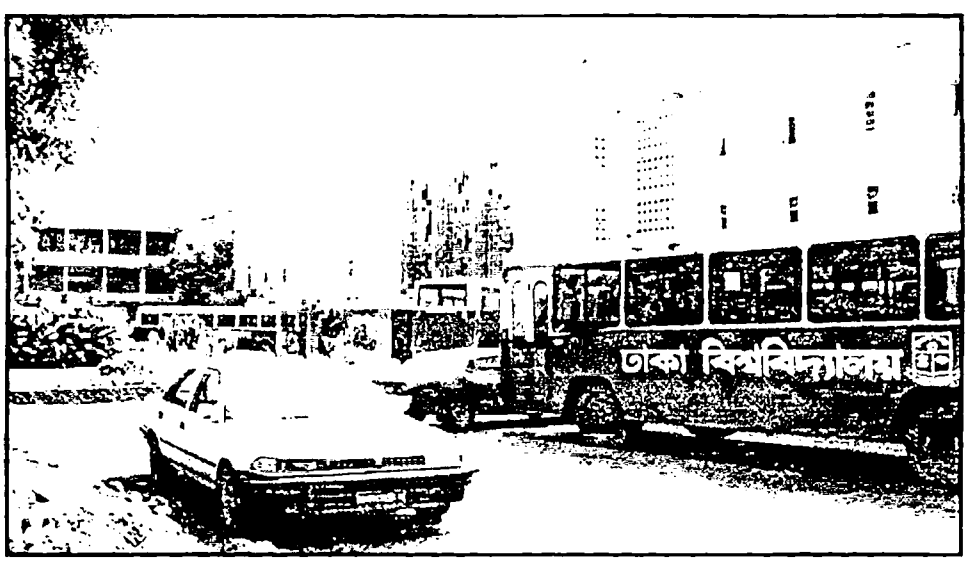

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবন

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপত্য এলবাম-

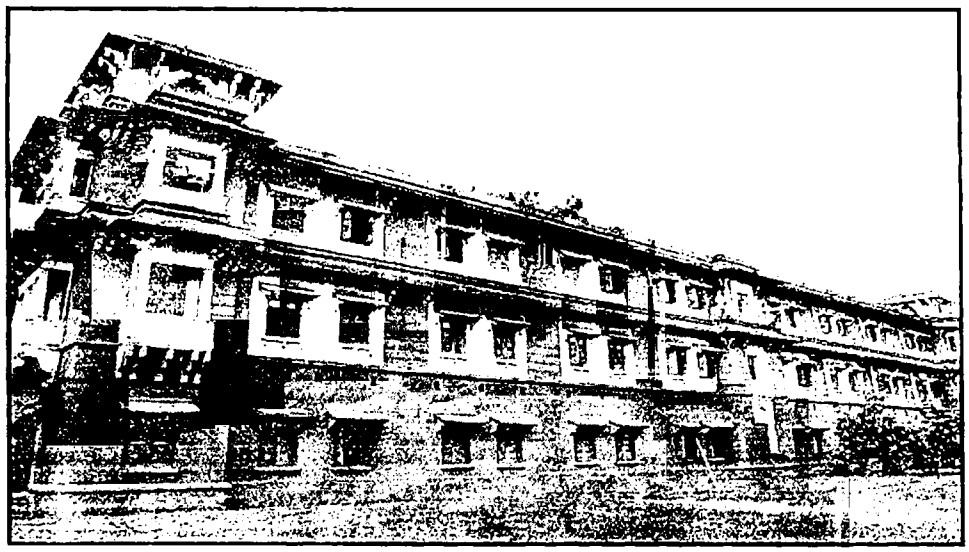

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলের-এর একাংশ

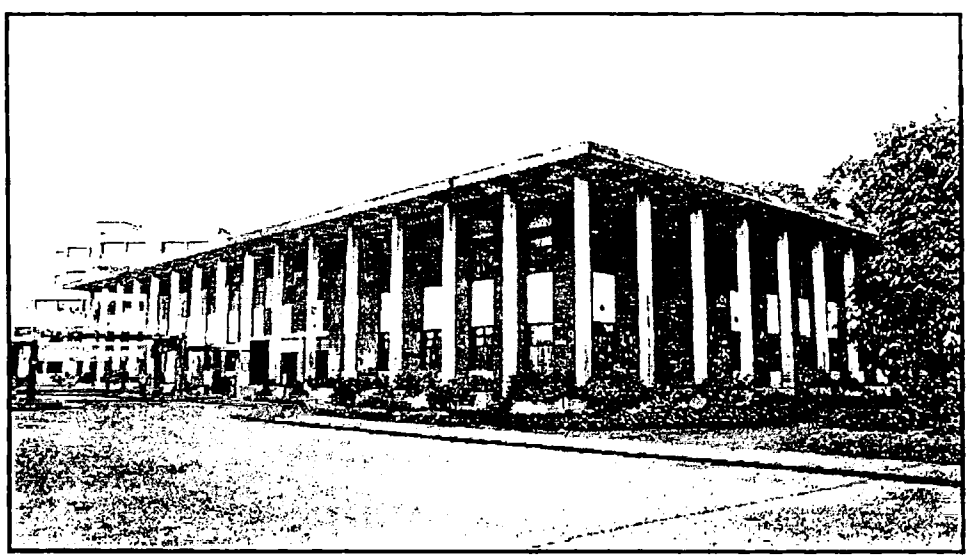

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মোকাররম ভবনের একাংশ

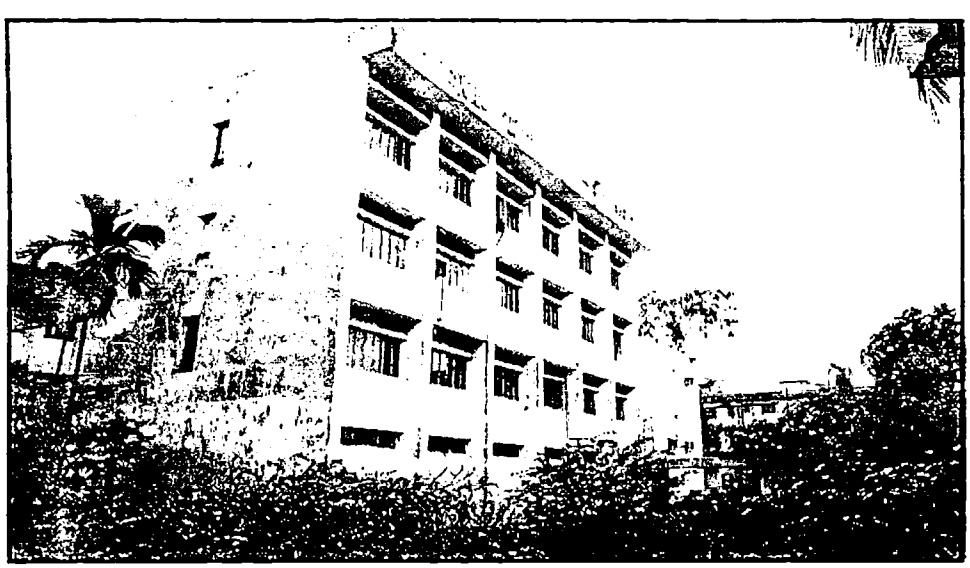

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুষ্টি বিজ্ঞান ইন্সটিটিউট

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপত্য এলবাম-

University Institutional Repository

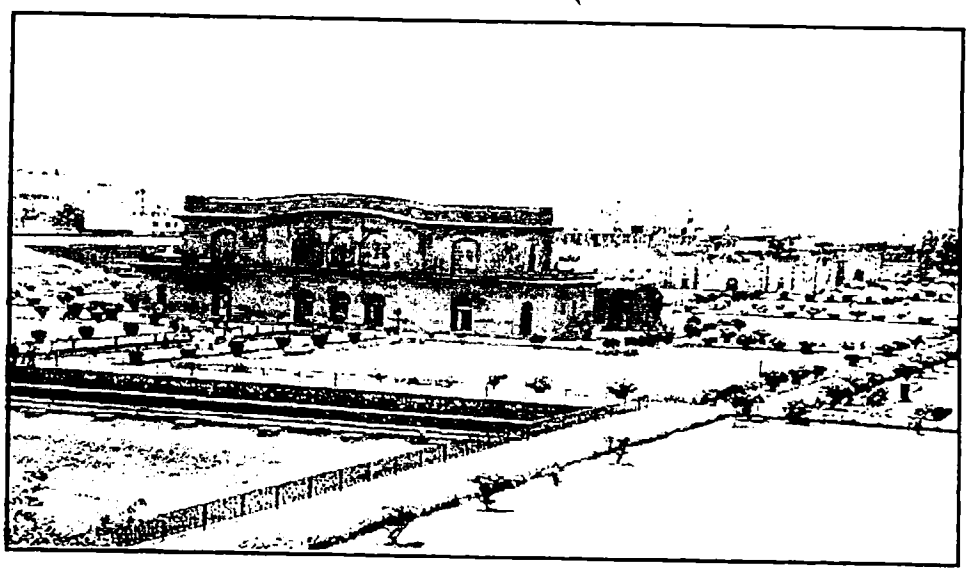

লাল বাগের কেল্লা

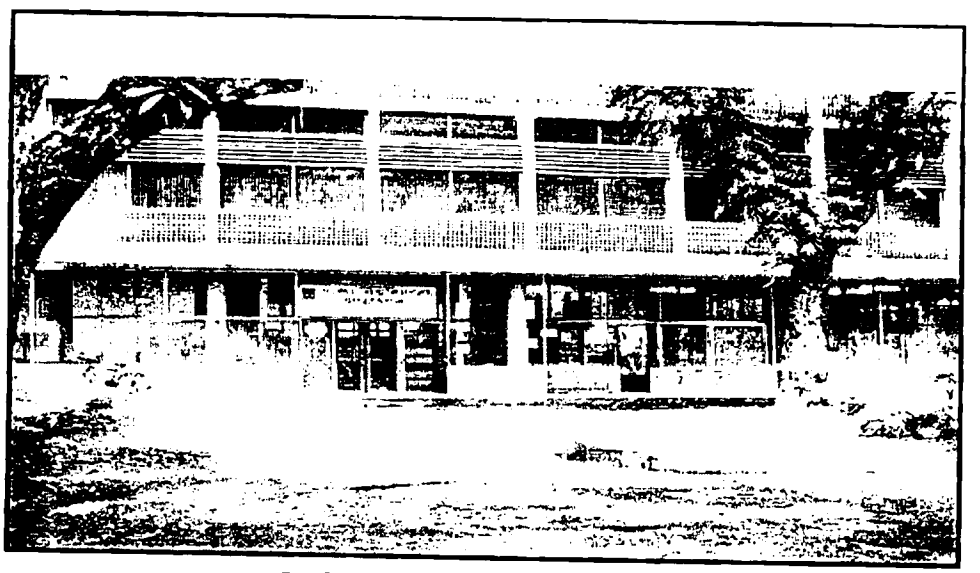

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রিয় লাইব্রেরীর একাংশ

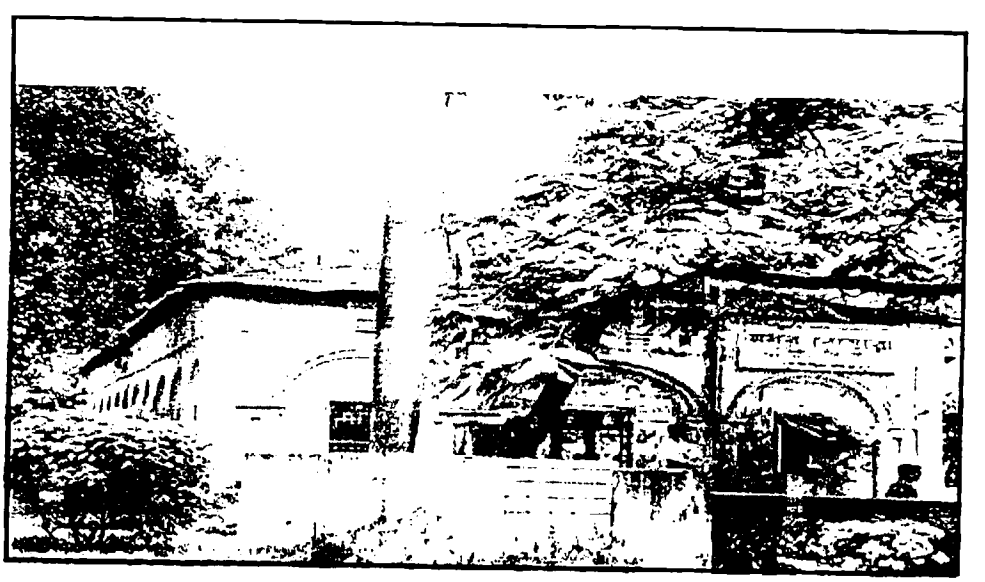

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর কেন্টিন এর একাংশ

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপত্য এলবাম-

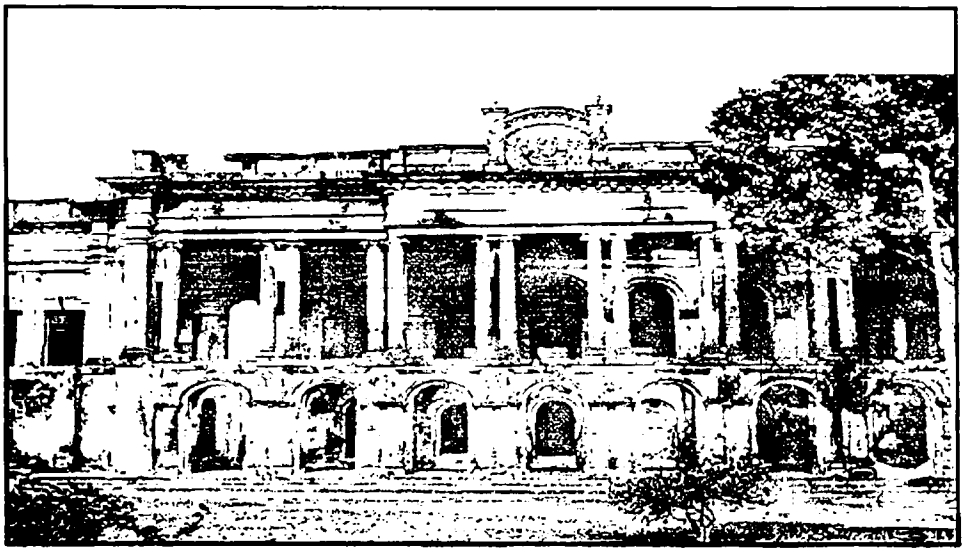

ঐতিহাসিক স্থাপত্য

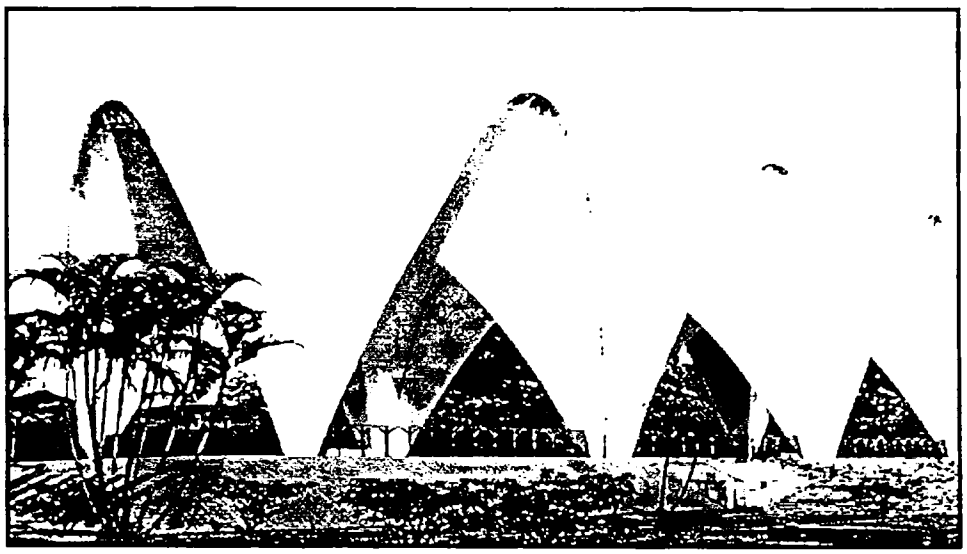

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জাতীয় তিন নেতার মাজার এর একাংশ

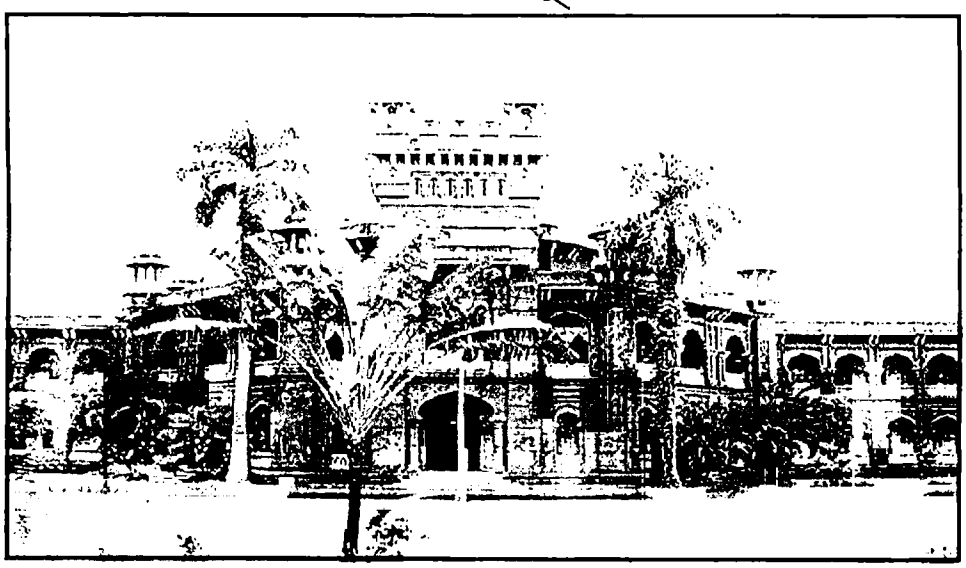

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলের এর একাংশ

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপত্য এলবাম-

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় অবস্থিত ঐতিহ্যবাহী চারুকলা ইন্সটিটিউট স্থাপত্য

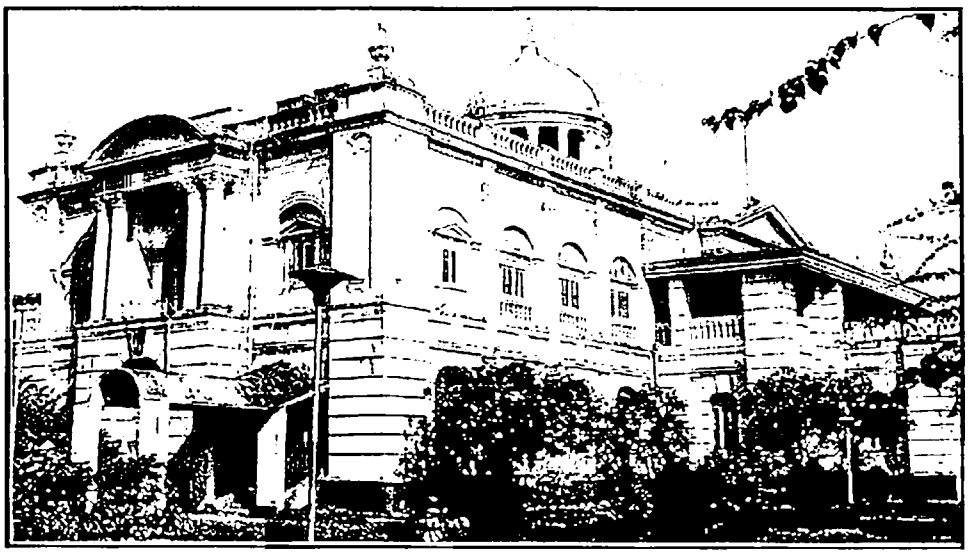

ঐতিহ্যবাহী স্থাপত্য

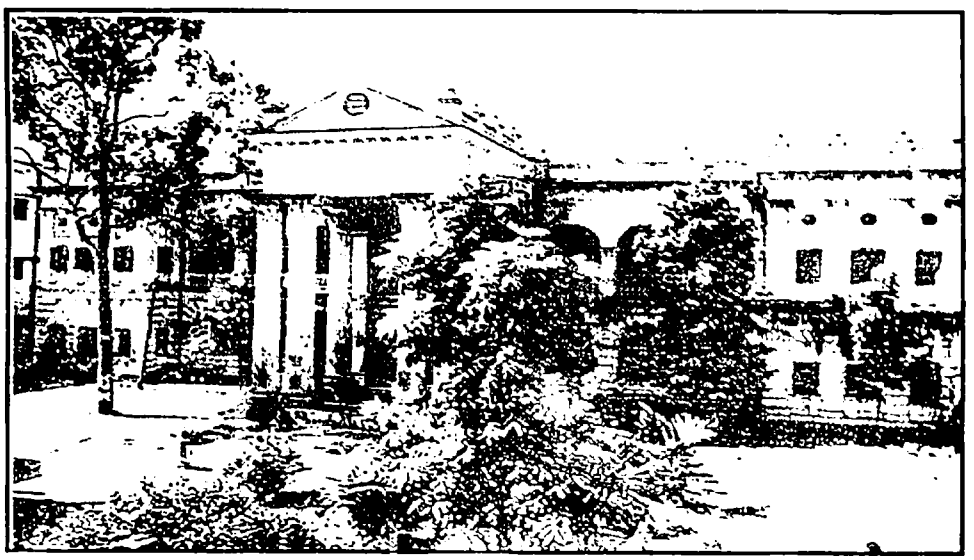

ঐতিহ্যবাহী স্থাপত্য

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকার স্থাপত্য শৈলী এলবাম

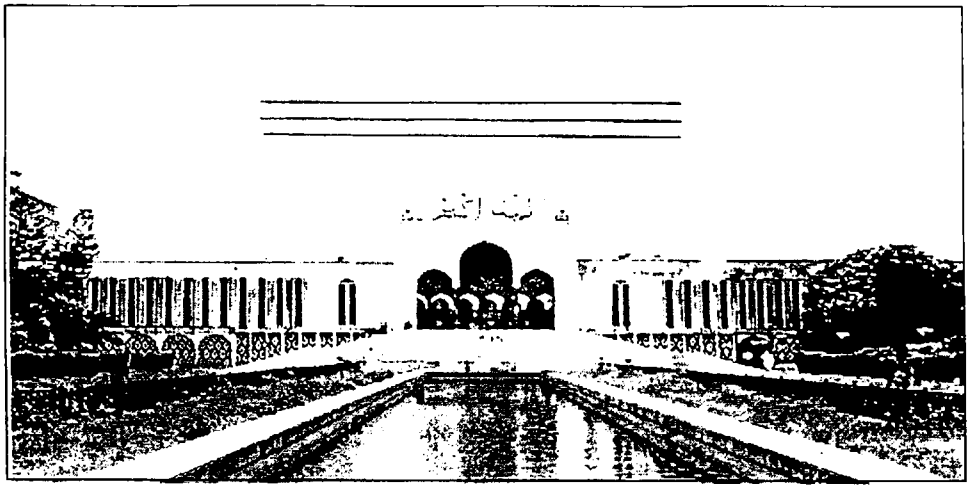

বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদ

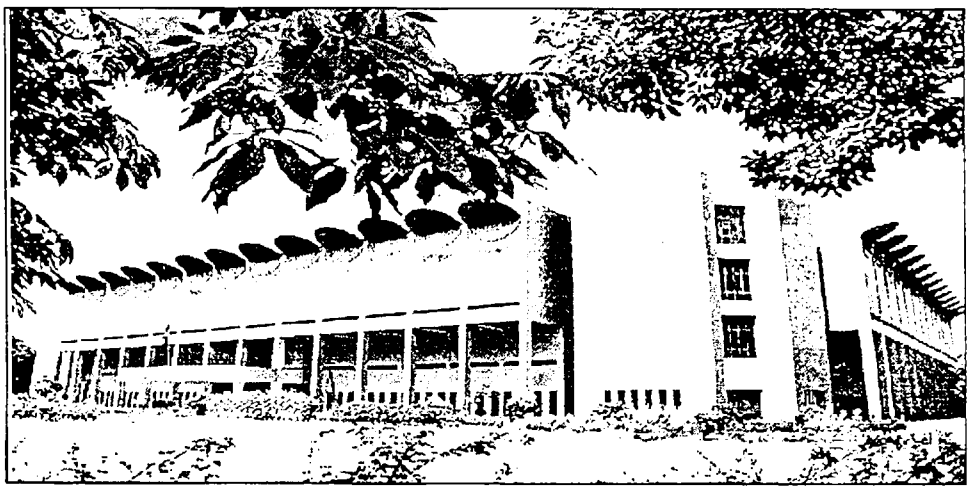

জাতীয় জাদুঘর

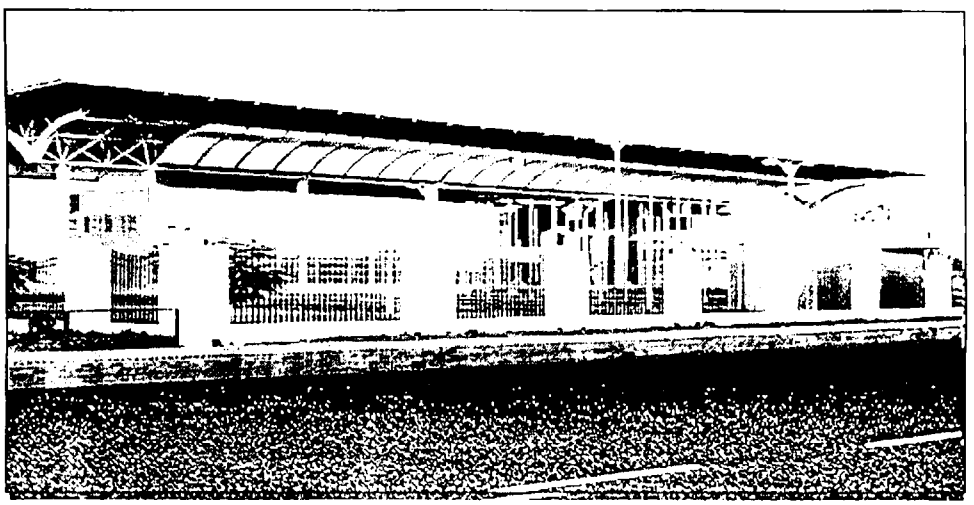

বাংলাদেশ চীন-মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্র

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকার স্থাপত্য শৈলী এলবাম

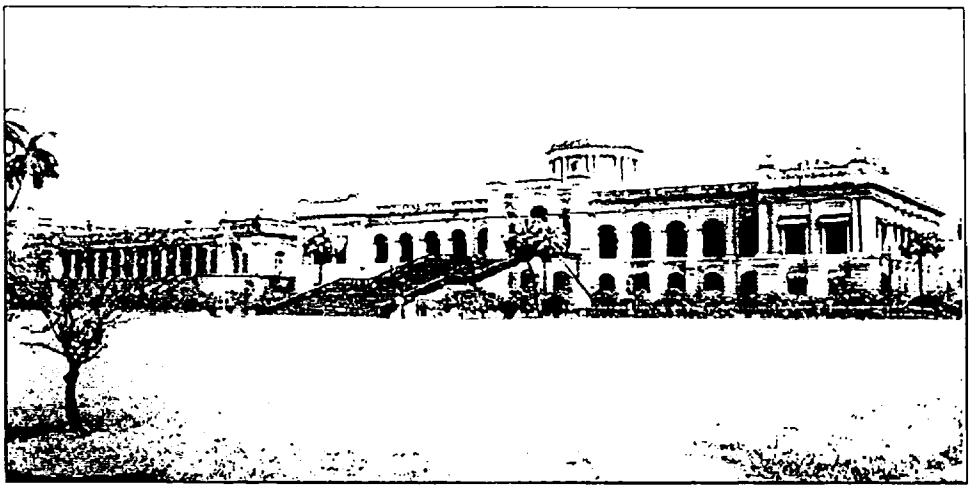

আহসান মঞ্জিল

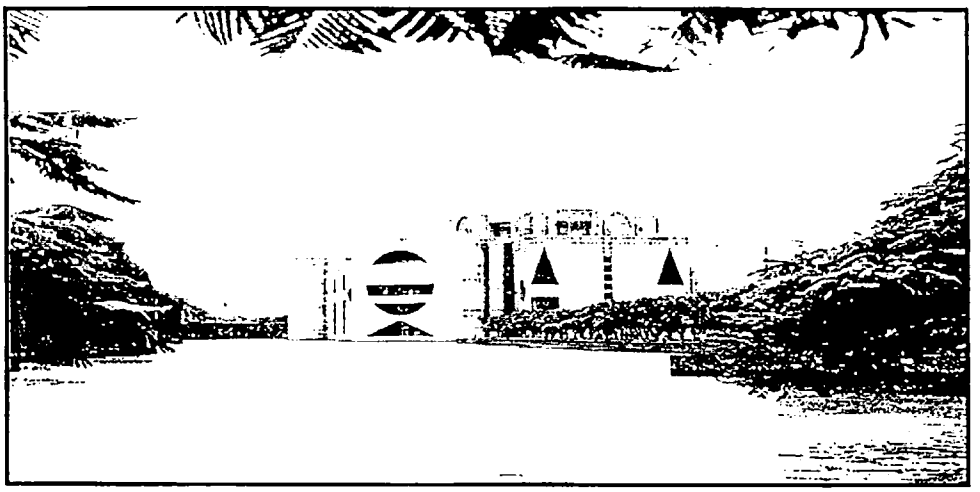

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

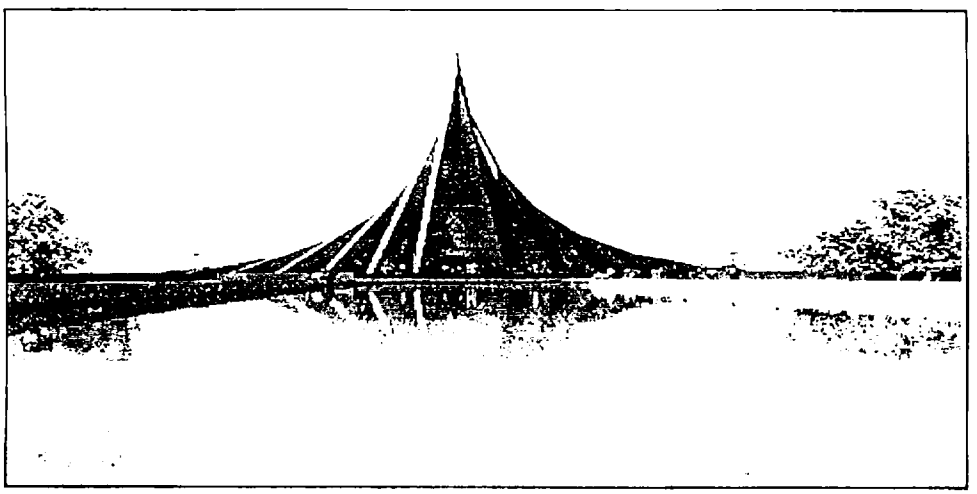

জাতীয় স্মৃতিসৌধ

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকার ঐতিহ্যবাহী স্থাপত্য শৈলী এলবাম

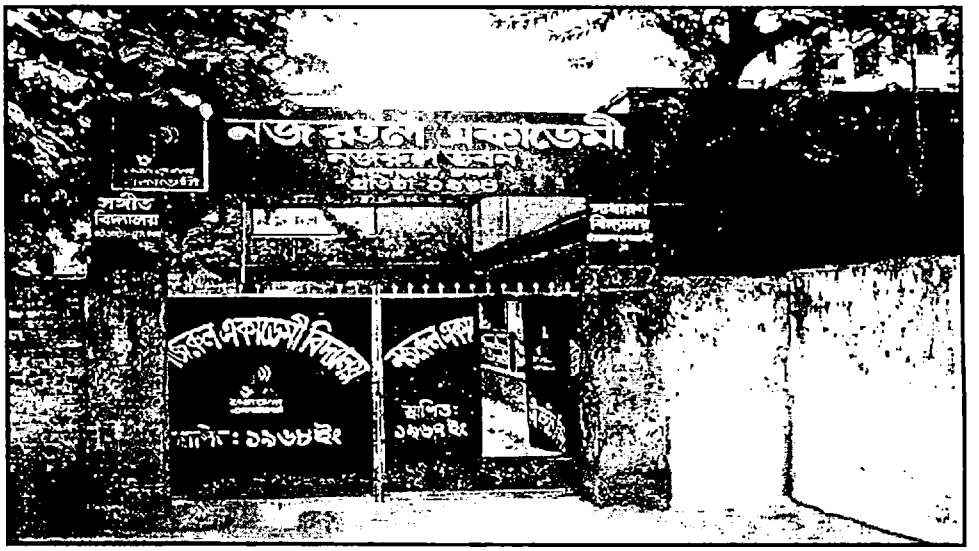

নজরুল একাডেমীর প্রধান ফটক

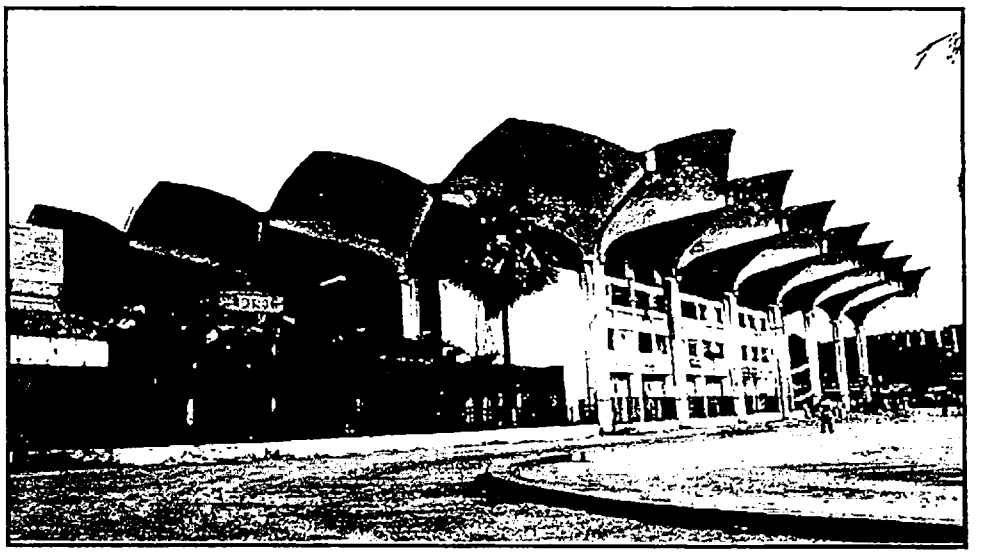

ঐতিহ্যবাহী কমলাপুর রেল স্টেশন

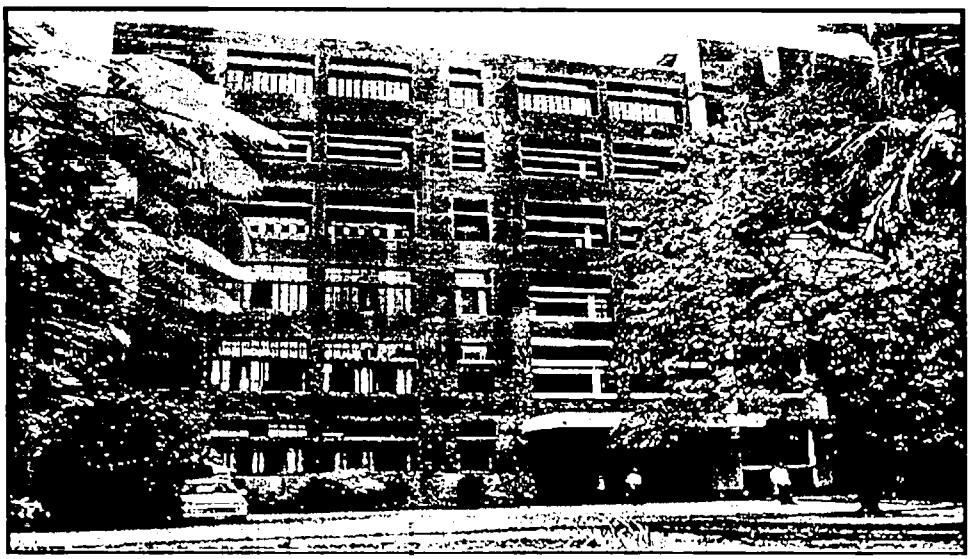

ঐতিহ্যবাহী স্থাপত্য

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকার ঐতিহ্যবাহী স্থাপত্য শৈলী এলবাম

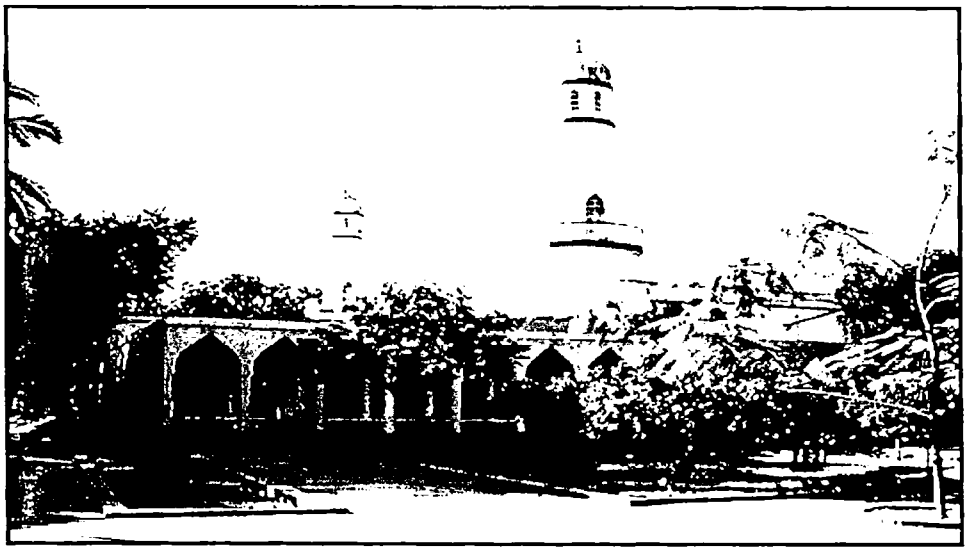

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদ

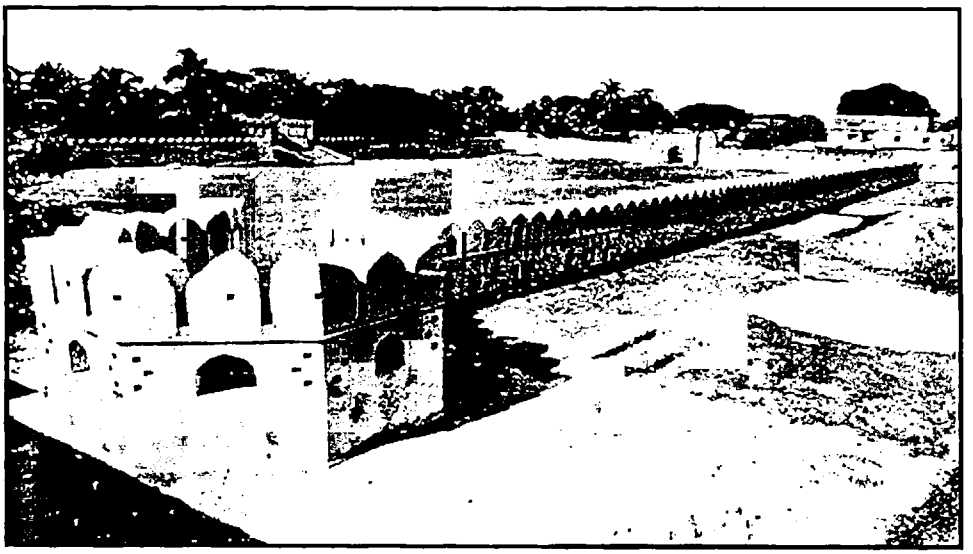

ঐতিহাসিক ধানমন্ডি ঈদগাঁ

চামেলী হাউজ, বর্তমানে সিরডাপ মিলনায়তন

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকার ঐতিহ্যবাহী স্থাপত্য শৈলী এলবাম

মুহাম্মদপুরস্থ গ্রাফিকস আর্টস কলেজ

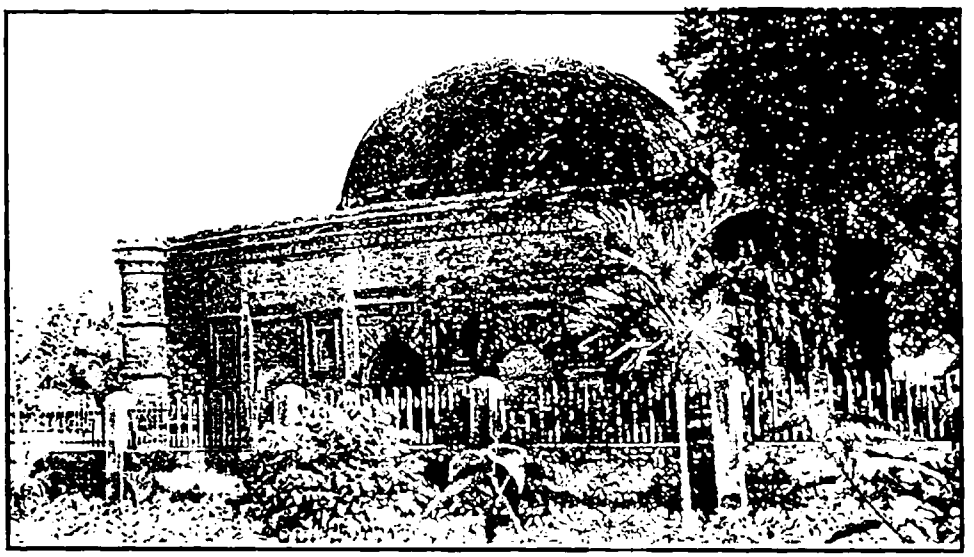

ঐতিহাসিক স্থাপত্য

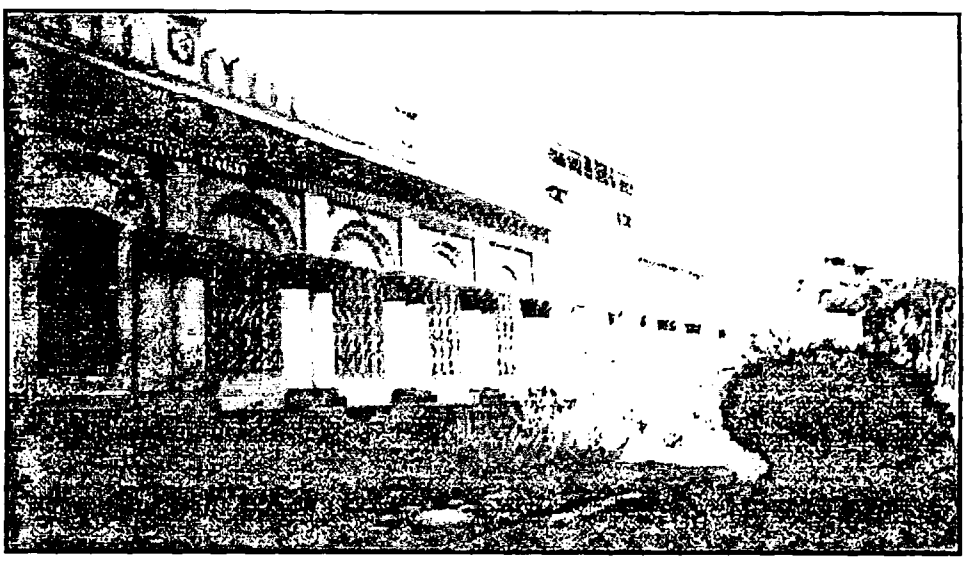

ঐতিহাসিক নবাববাড়ী

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকার ঐতিহ্যবাহী স্থাপত্য শৈলী এলবাম

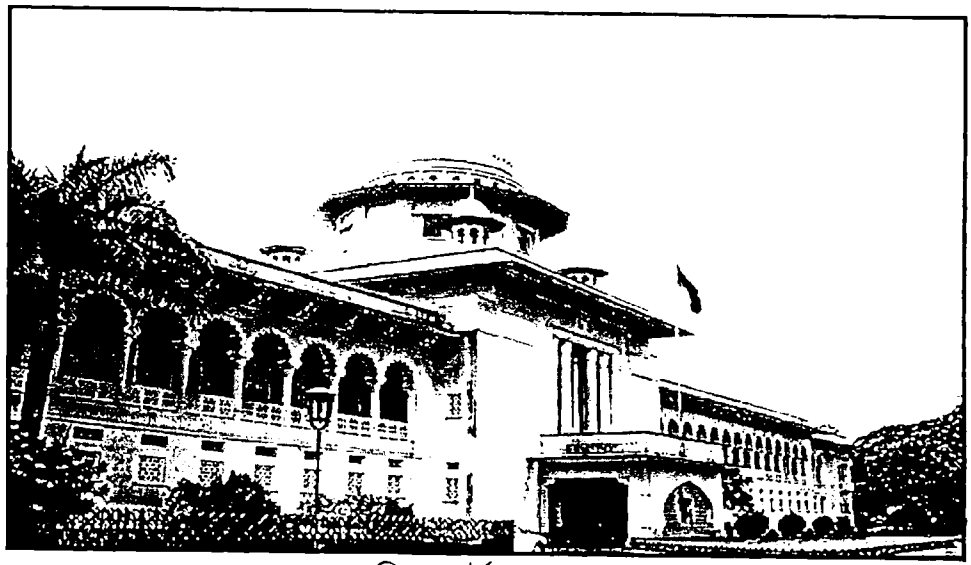

সুপ্রিমকোর্ট ভবন

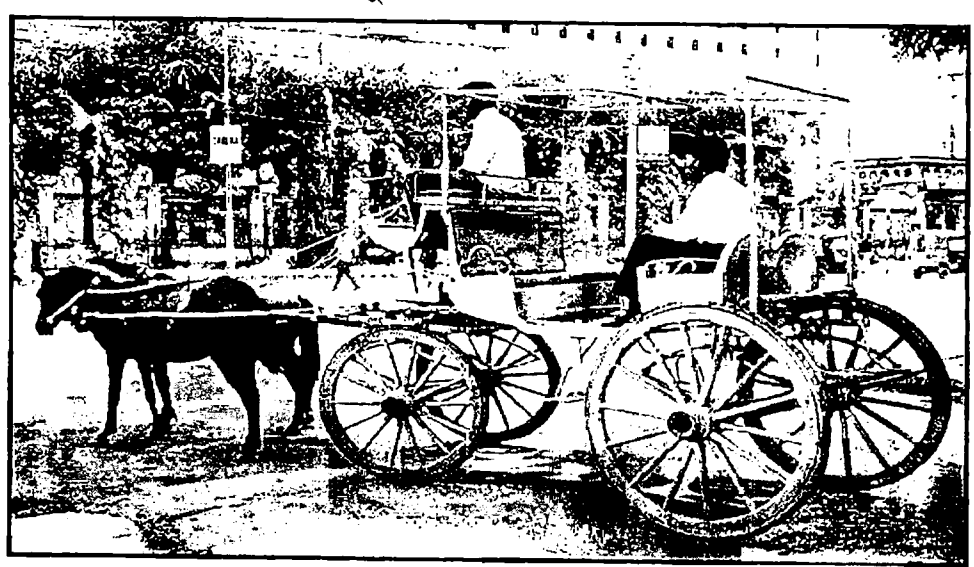

ঢাকার ঐতিহ্যবাহী ঘোড়ার গাড়ী

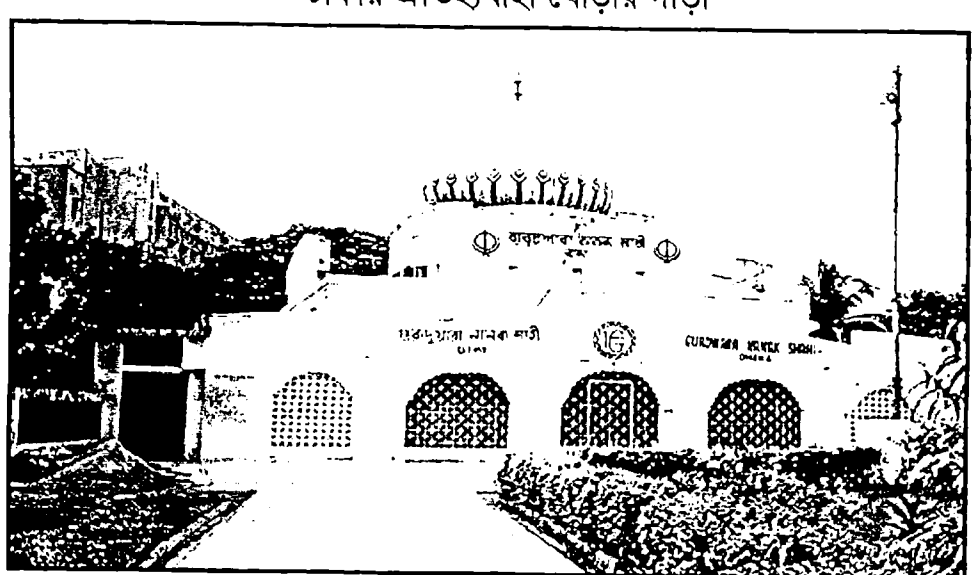

শিখ ধর্মাবলম্বীদের উপাসনালয়, গুরুদুয়ারা নানকশাহী

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকার ঐতিহ্যবাহী স্থাপত্য শৈলী এলবাম

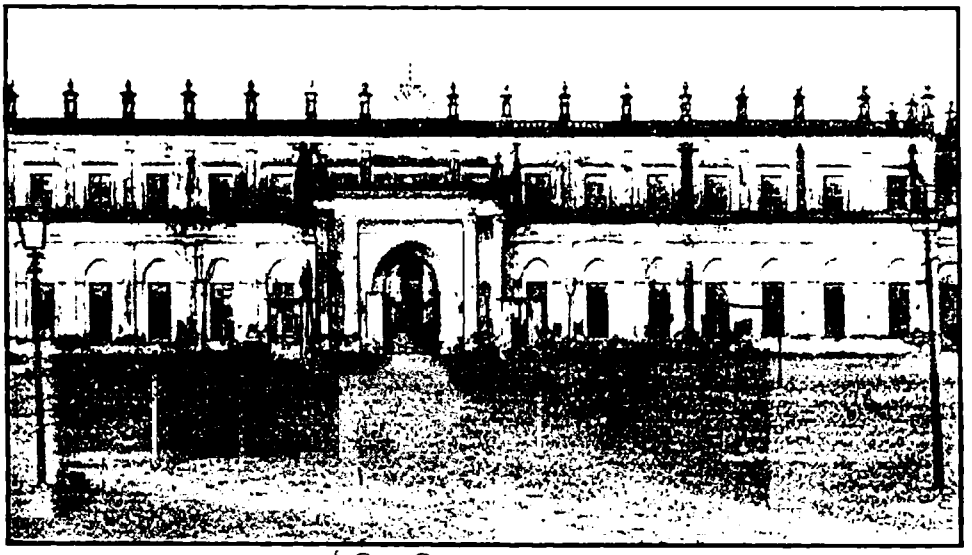

ঐতিহাসিক স্থাপত্য

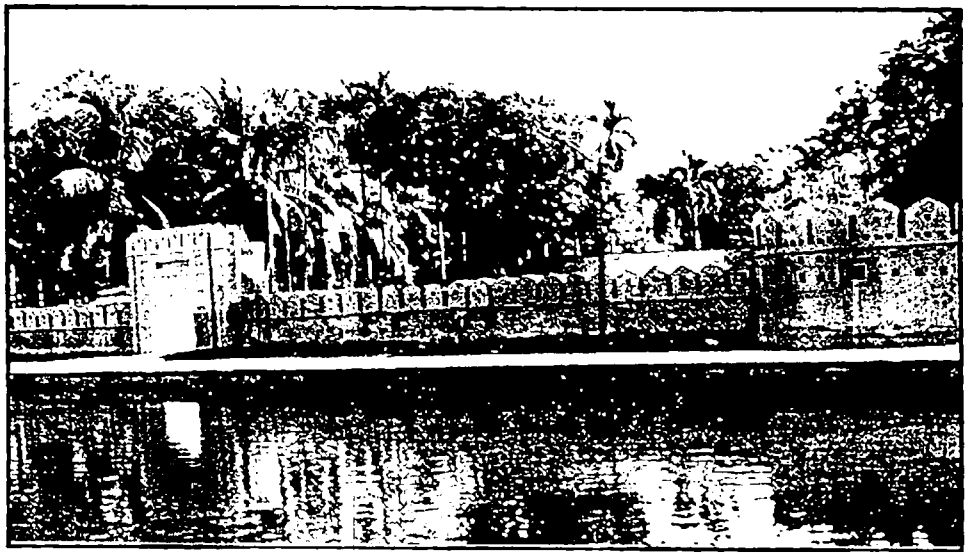

ঐতিহাসিক ধানমন্ডি ঈদগাঁহের একাংশ

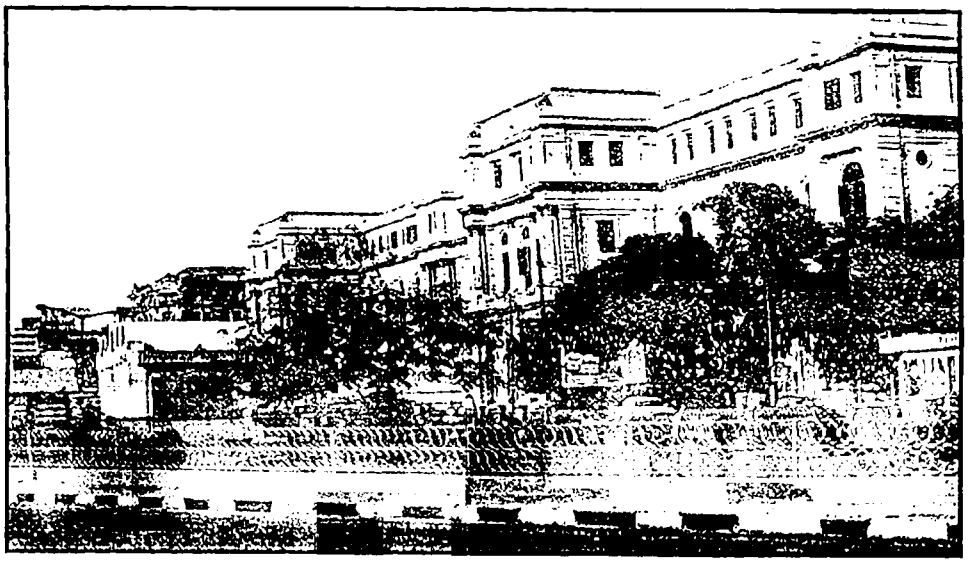

ঐতিহাসিক স্থাপত্য

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকার ঐতিহ্যবাহী স্থাপত্য শৈলী এলবাম

বর্ধমান হাউজ

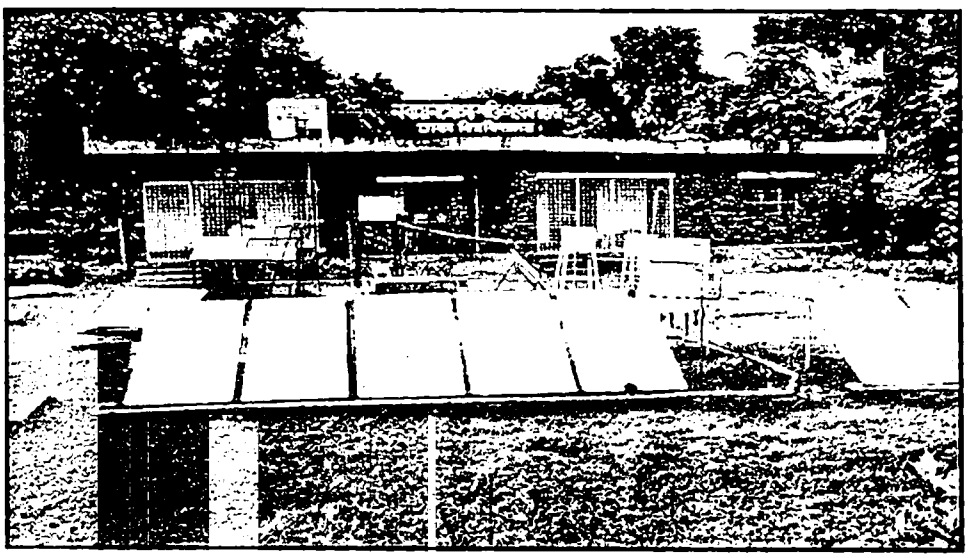

সৌর শক্তি গবেষণা কেন্দ্র

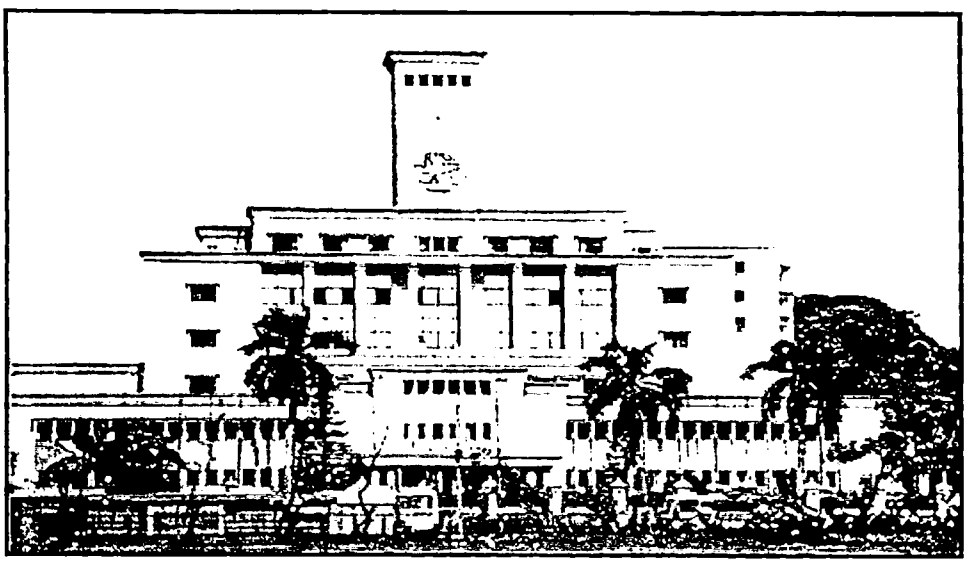

রাজউক ভবন

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকার ঐতিহ্যবাহী স্থাপত্য শৈলী এলবাম

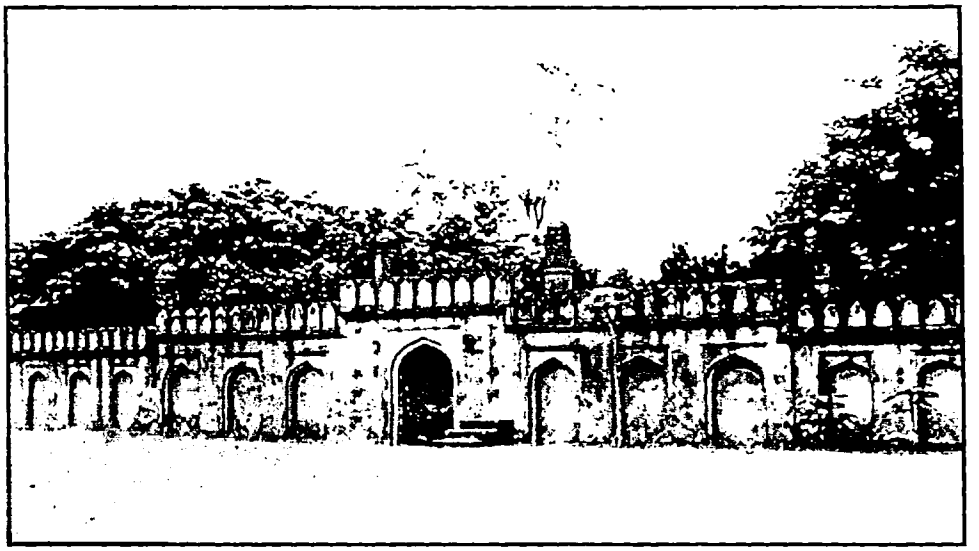

ধানমন্ডি ঈদগাঁর প্রধান ফটক

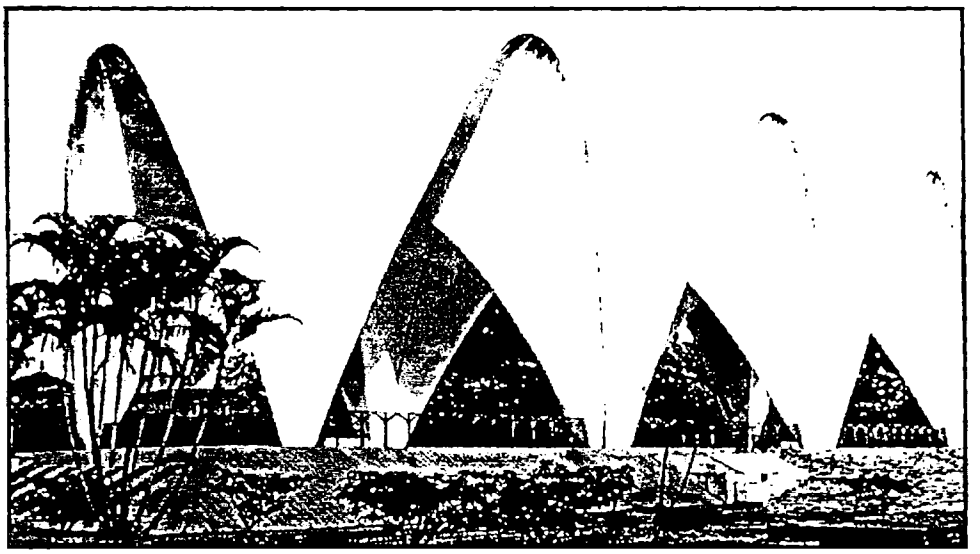

ঐতিহাসিক তিন নেতার মাজার

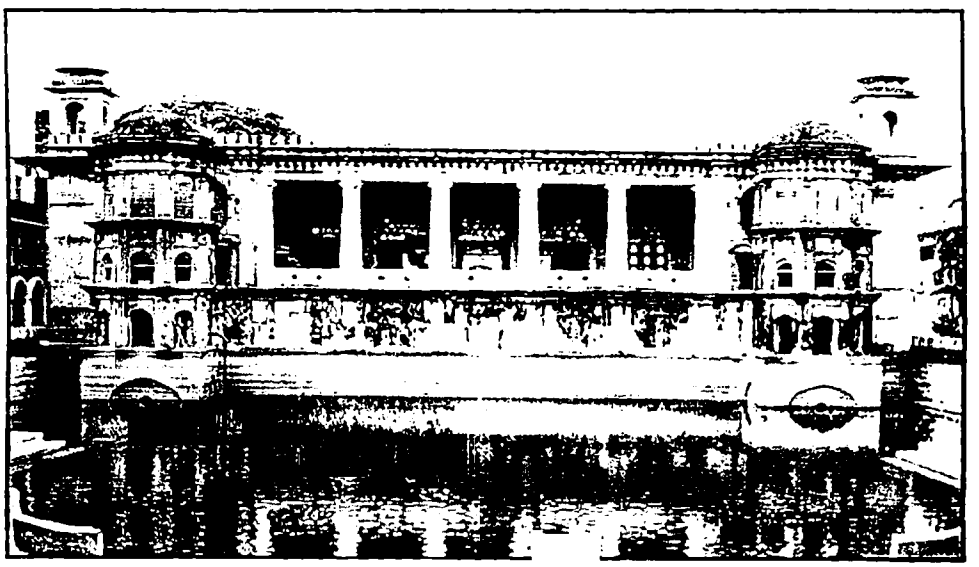

হোসনী দালানের একাংশ

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকার ঐতিহ্যবাহী স্থাপত্য শৈলী এলবাম

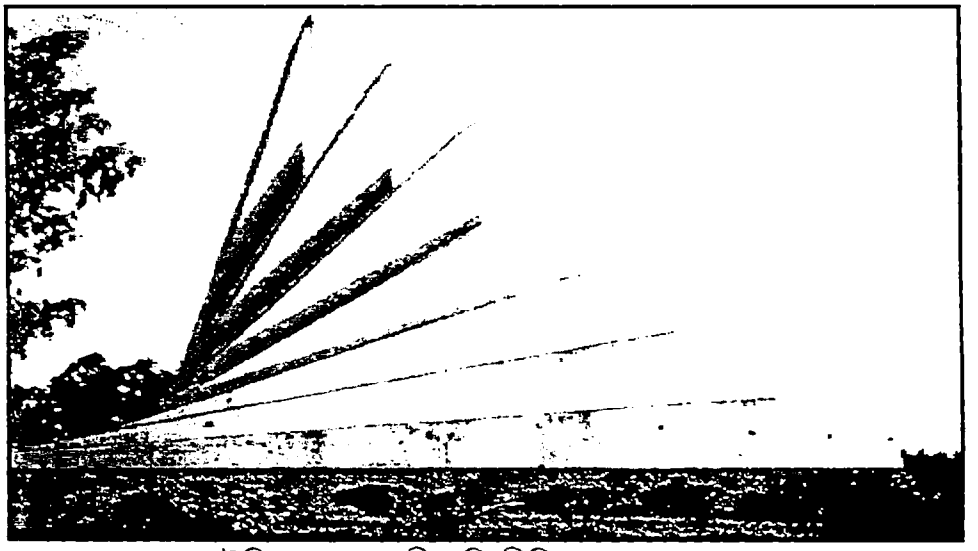

ইতিহাসের স্বাক্ষী বুদ্ধিজীবি কবরস্থান

রেডিও বাংলাদেশ

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর।

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকার ঐতিহ্যবাহী স্থাপত্য শৈলী এলবাম

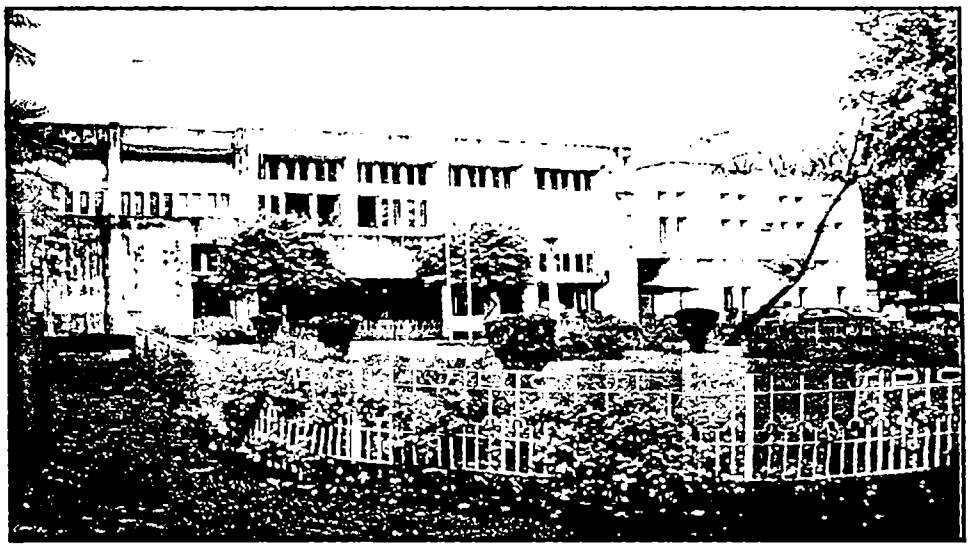

ঐতিহাসিক স্থাপত্য

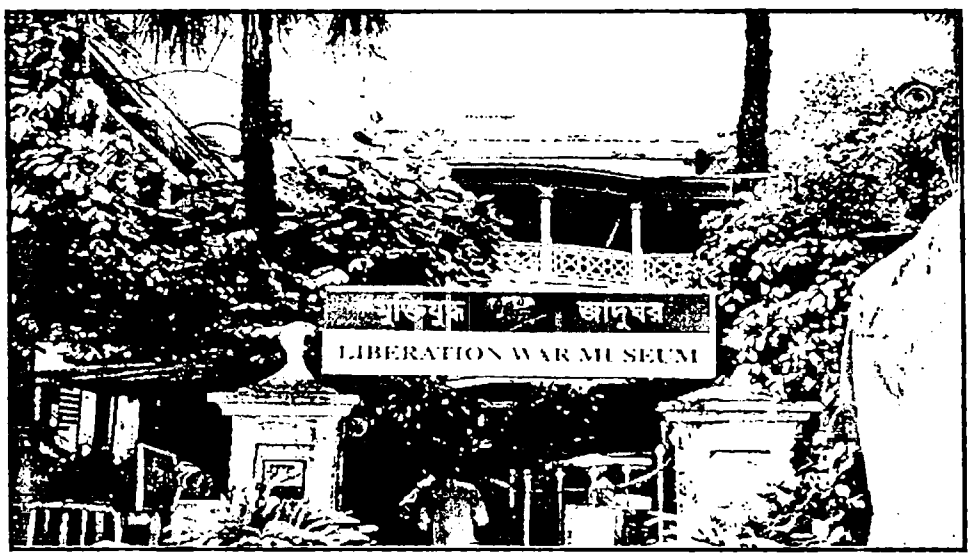

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপত্য এলবাম-

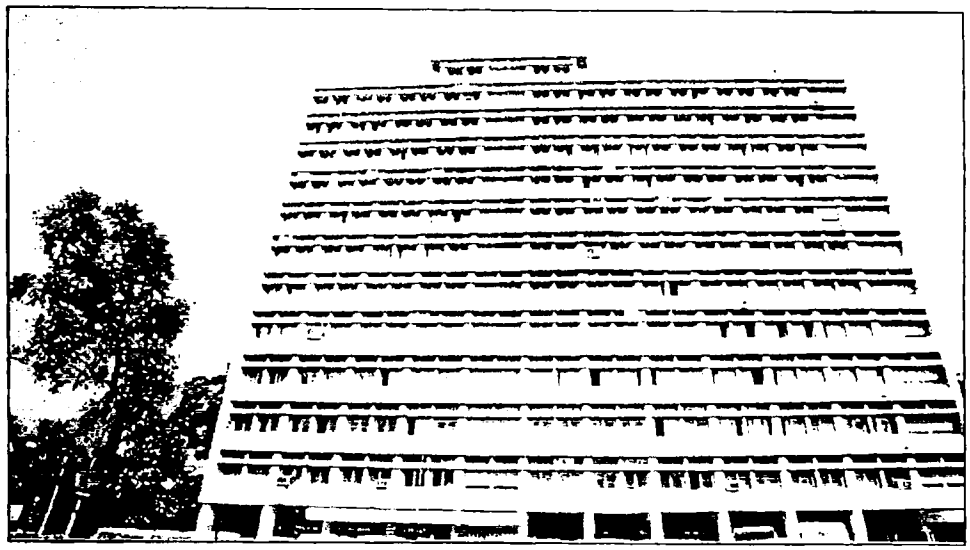

ঐতিহাসিক স্থাপত্য

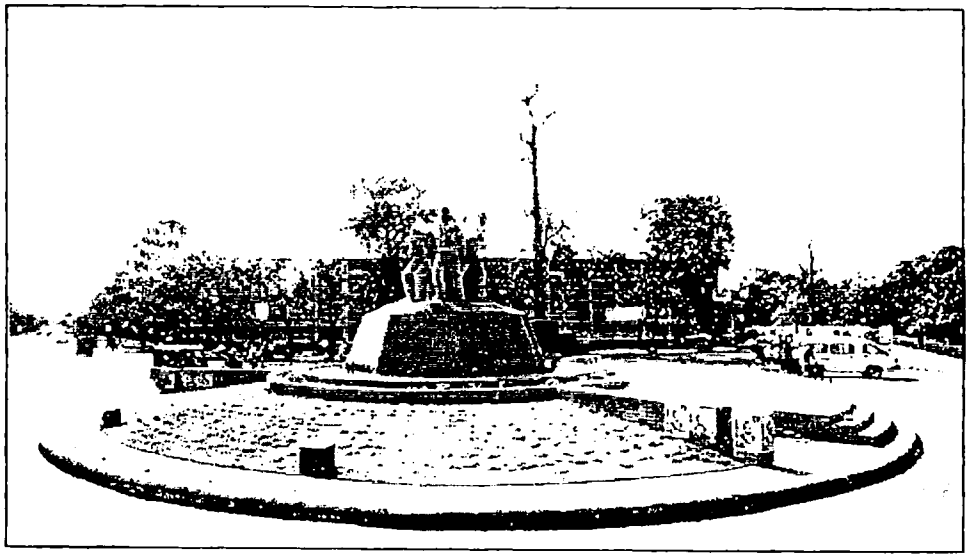

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসির সমনে স্বাধীনতা ভাস্কর্য

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় অবস্থিত ভাষা সৈনিকদের স্মৃতি বিজড়িত শহীদ মিনার

Dhaka University Institutional Repository

নবাব স্যার সলীমুল্লাহ

Dhaka University Institutional Repository

টাঙ্গাইলের ধনবাড়িতে নবাববাড়ীতে নবাবের ছবির পাশে দন্ডায়মান গবেষক

Dhaka University Institutional Repository

শের-এ বাংলা একে ফজলুল হক